~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান চৌধুরী

বাঙালির কলের গান

বই

~ www.amarboi.com ~

বাঙালির কলের গান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

সুররসিক
চিত্রকর কাইয়ুম চৌধুরী
শ্রদ্ধাভাজনেষু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নি বে দ ন

নতুন প্রযুক্তির কাছে হার মেনে গ্রামোফোন বা কলের গান বেশ কয়েক দশক আগেই বাঙালির জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু রেখে গেছে সংগীত-সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ — ঐতিহ্যের এক প্রাণময় ধারা। পিতামহের কল্যাণে আমাদের বাড়িতে গ্রামোফোনের প্রবেশ ঘটেছিল গত শতকের বিশের দশকেই — আমার জন্মেরও বহু আগে। শোনা যায়, ১৯২১ সালে আমার পিতা জলপানি পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করায় এই গান-শোনার যন্ত্রটি উপহার পান। সেই চোঙ-অলা গ্রামোফোন যন্ত্রটি একেবারে ছেলেবেলায় আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে রাখতো। ভেবে কূলকিনারা পেতাম না, অতটুকু যন্ত্রের মধ্যে মানুষ কী করে লুকিয়ে থেকে গান গায়! বড়োরা রেকর্ড চাপিয়ে দিলে আমরা গোল হয়ে বসে গান শুনতাম। পঞ্চাশ বছরেরও কিছু আগের কথা, তখন বয়স হয়তো পাঁচ-সাত বছর — তাই কী গান বাজতো আর তার শিল্পীই বা কে সেসব খবর জানতাম না — আর জানার প্রয়োজনও বোধ করিনি। একটি গানের কথা খুব মনে আছে — 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না'। এই গান যে রবীন্দ্রনাথের লেখা আর শিল্পী যে পঙ্কজকুমার মল্লিক, সে অনেক পরে জানতে পারি। আরেকটি গান শুনে খুব মজা পেতাম — 'ও টোনার বাপ, পাকা রসের ক্ষির পাকাইছি খাইয়া গ্যালা না'। 'বাজান চল্ যাই চল্ মাঠে লাঙ্গল বাইতে' — এই গানটি শুনলে মন খুব খারাপ হয়ে যেতো — কেমন যেন একটা কষ্টের ভাব জাগতো। কবি জসীমউদ্‌দীনের লেখা এই গানটি যে আব্বাসউদ্দীন আহমদ গেয়েছিলেন তা লায়েক হয়ে আবিষ্কার করি। চোঙ-অলা গ্রামোফোনটি অনেককাল চালু ছিল। তারপর স্প্রিং কেটে গেলে ব্রিফকেস-আকারের বহনযোগ্য গ্রামোফোন বাড়িতে আসে। কুষ্টিয়া শহরের স্টেশন রোডের পাকিস্তান রেডিও সার্ভিসের অবাঙালি মালিক শামসুদ্দীন সাহেব এই গ্রামোফোন-যন্ত্রটি বাড়ি বয়ে দিয়ে যান কিস্তিতে দাম শোধ করার শর্তে। সেই যন্ত্রটি এখনো সচল, সমস্যা হয় শুধু পিন পেতে।

শারদীয় পূজা উপলক্ষে নতুন রেকর্ড বেরোনোর রেওয়াজ বেশ আগে থেকেই চালু ছিল। আমাদের সময়ে শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় — এঁদের পুজোর গানের রেকর্ড বারবার বাজিয়ে শোনা হতো। শ্যামলের 'চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী হবে' এবং 'ভ্রমরা, ফুলের বনে মধু নিতে অনেক কাঁটার জ্বালা' তখন লোকের মুখে মুখে ফিরতো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সতীনাথের 'পাষাণের বুকে লিখ না আমার নাম', মান্না দের 'কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল', তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাজল নদীর জলে' — ছেলেবেলায় শোনা এইসব গানের কথা খুব মনে পড়ে। আলপনা মুখোপাধ্যায়ের 'ময়নার মা ময়নামতী ময়না তোমার কই', সনৎ সিংহের 'বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস্ বাপুরে' কিংবা অমল মুখোপাধ্যায়ের 'চুপ চুপ লক্ষ্মীটি, শুনবে যদি গল্পটি' — শিশুতোষ এই গানগুলোও আমাদের মনে খুব দোলা দিতো। আরো কিছু পরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা ভরাট গলার গান আমাদের ভালো লাগার জগৎকে অধিকার করলো। এসব কথা আরো বলতে গেলে তো সাতকাহন হয়ে যাবে।

কলের গানের স্মৃতি সেই ছোটকাল থেকেই মনের মধ্যে গেঁথে আছে। একসময় ঝোঁক চাপলো এর সূচনা থেকে শেষের কাহিনি জানার। আশির দশক থেকে শুরু হলো এ-বিষয়ে আমার সুলুক-সন্ধানের পালা। ঢাকায় এক আবদুস্ সাত্তার আর আংশিক আসাদুল হক ছাড়া আর তেমন কারো সরাসরি সহায়তা পাইনি। এই কাজের যোগ্য জায়গা যে কলকাতা তা বুঝতে খুব বেশি দেরি হয়নি। অবশ্য এর সংগত কারণও আছে। কলের গানের কদর এখনো কলকাতার স্মৃতিকাতর সংগীত-সমঝদার ও রেকর্ড-সংগ্রাহকদের মধ্যে আছে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, এরকম রেকর্ড-সংগ্রাহকের সংখ্যা সেখানে দু-একশ তো হবেই, কলকাতার বাইরের হিসাবও এর সঙ্গে যোগ করতে হয়। কলকাতায় সবচেয়ে বড়ো বাংলা গানের রেকর্ডের সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন সূরাজলাল মুখোপাধ্যায় (হারুবাবু) — দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান রেকর্ডের সে-এক মহাভাণ্ডার। প্রয়াত সূরাজলালের সংগ্রহকে আরো সমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে তুলেছেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি ও জামাতা অমিত গুহ 'সূরাজ-শ্রুতি সদন' নামে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে। আমার লেখার উপকরণ-সংগ্রহের মূল কাজটি এখানে বসেই করেছি বন্ধু অমিতের সৌজন্যে। কী করে ভুলবো রন্তিদেব মৈত্রের কথা, যিনি ইন্দুবালার বহু বছরের ডায়েরি শুধু পড়তেই দেননি — আমার ব্যবহারের জন্যে তার প্রতিলিপি পৌঁছে দিয়েছেন আমার ঘরে। বন্ধু দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংগ্রহের পুরোনো সব বইপুস্তক কল্পতরু হয়ে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বাঁধন সেনগুপ্তও অনেক সহায়তা করেছেন কিছু দুর্লভ তথ্য ও পুরোনো লেখার জোগান দিয়ে। তুলসী লাহিড়ীর জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে এবং তাঁকে লেখা কমলা ঝরিয়ার একটি চিঠি ও কিছু কাগজপত্র আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বন্ধু শুভ জোয়ারদার কমলা সম্পর্কে লেখার আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। যূথিকা রায়ের কাছে পৌঁছানো সহজ ও সম্ভব হয়েছে শুধু সুজন তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যেই। সংস্কৃতিমনস্ক প্রদীপ্ত রায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তবু জনক প্রণব রায় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও ছবি যথাসময়ে পৌঁছে দিতে ভোলেননি। চলচ্চিত্রকার শ্যামল ঘোষ ইন্দুবালা-আঙ্গুরবালা-কমলা ঝরিয়া — বাংলা গানের স্মরণীয় এই তিন কন্যাকে নিয়ে 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন — খবরের কাগজে এই ছবিটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের যে বিবরণ ও সমালোচনা ছাপা হয়, তার কর্তিকার ফাইল ব্যবহার করতে দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। আমার কাজে প্রয়োজন হতে পারে এমন দুষ্প্রাপ্য বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা সুবর্ণরেখার ইন্দ্রনাথ মজুমদার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ধর্মতলায় কমলালয়ের উলটোদিকে পুরোনো রেকর্ডের কারবারি অবাঙালি মোহাম্মদ ইলিয়াসকে ধাওয়া করে একবার তাঁর খিদিরপুরের এঁদো গলির 'গরিবখানা'য় গিয়ে বেশকিছু দুর্লভ রেকর্ড-কভার উপহার হিসেবে আদায় করি। শিয়ালদহ স্টেশনের খুবই কাছে চোরবাজারে একসময় পুরোনো রেকর্ডের রমরমা ব্যবসা ছিল — এখন একটি মাত্র দোকান কোনোমতে টিকে আছে — সেখানেই পেয়ে যাই রেকর্ড-সংগীতের মূল্যবান বেশকিছু ক্যাটালগ ও সেইসঙ্গে রেকর্ড কোম্পানির নানা কাগজপত্র।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কলকাতায় আমি বড়ো অসহায় — আমার সংগ্রহকাজে এই হৃদয়বান সংগীতপ্রেমী তরুণের সহায়তার কথা বারবার উচ্চারণ করতে হয়। আরেকজন, রমেন সাহা — লোকসংগীতের শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর গানের গুরু, এই রমেনও আমার জন্যে অকাতরে সময় ও শ্রম দিয়েছেন।

দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি বিশেষ ঋণী : মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি ও হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি। মেগাফোনের কমলকুমার ঘোষের অনেক সহযোগিতা পেয়েছি — দান করেছেন মেগাফোনের পুরোনো ক্যাটালগ, রেকর্ড বেরিয়েছিল এমন কিছু দুর্লভ নাট্য-পাণ্ডুলিপি ও আপিসের আদ্যিকালের বাতিল সব কাগজপত্র। আর না দিলেও দেখিয়েছেন নজরুলের নিজের হাতে লেখা গানের কয়েকটি খাতা ও চুক্তিপত্রের কপি। অত্যন্ত সৌজন্য ও সহায়তা পেয়েছি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি থেকেও। বিশেষ করে হিন্দুস্থান ও ইনরেকোর কর্ণধার সোহনলাল সাহা এই প্রতিষ্ঠানের অনেক অজানা কাহিনি শুনিয়েছেন। হিন্দুস্থানের প্রাক্তন প্রধান আধিকারিক দীপক দাশগুপ্ত পুরোনো কাগজপত্র আন্তরিকতার সঙ্গে দেখিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে বেশকিছু তথ্য যাচাইয়ের সুযোগও মিলেছে তাঁর কাছ থেকে। সৌজন্য ও সহযোগিতার সেই ধারা রক্ষা করে চলেছেন বর্তমান আধিকারিক সঞ্জীব কুমার মুখার্জি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের বরেণ্য চিত্রকর কাইয়ুম চৌধুরী যে গানের খানদানি সমঝদার, সেই খবর একদিন তাঁর বাড়িতে বসে কথায় কথায় বেরিয়ে আসে। এই বিশিষ্ট সংগীত-বোদ্ধার গানের সংগ্রহ যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং এ-বিষয়ে তাঁর তথ্যজ্ঞানও উল্লেখ করার মতো। গান সম্পর্কে আমারও কিছু দুর্বলতা আছে এবং এ-নিয়ে সামান্য লেখালেখিরও চেষ্টা করি জেনে খুশি হন। সংগীত-ব্যক্তিত্বদের নিয়ে লেখার পাশাপাশি যাঁরা জীবিত তাঁদের সাক্ষাৎকার নিতেও পরামর্শ দেন। এর ফলেই মেগাফোনের কমলকুমার ঘোষ ও যূথিকা রায়ের বেশ বড়োসড়ো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

আমাদের সংগীত-সংস্কৃতিচর্চায় যিনি আন্তরিকভাবে নিবেদিত — সংগীতগুণী ও সাহিত্যসেবী হিসেবেও খ্যাতিমান, সেই আবদুশ শাকুর নানা সময়ে আমার তথ্য-তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় সেই বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়েছে।

কে. মল্লিক সম্পর্কে আমাকে আগ্রহী করে তোলেন কবি গোলাম কুদ্দুস। তিনিই আমাকে উপহার দেন এই শিল্পীর আত্মস্মৃতির অতি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। আর এই বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা পাই বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের, সেই সময়ে তিনি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিষ্ঠান লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সচিব প্রদীপ ঘোষ আব্বাসউদ্দীনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর ওপরে একটি বই লেখার ভার দেন। আমার আব্বাসউদ্দীনচর্চার সূচনা সেখান থেকেই। এই বিষয়ে আমার সহায় হন আব্বাসউদ্দীনের কৃতী পুত্র সংগীতশিল্পী ও লেখক মুস্তাফা জামান আব্বাসী এবং প্রেরণা জোগান বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী দিব্যজ্যোতি মজুমদার।

শচীন দেববর্মন সম্পর্কে প্রবন্ধটি লিখতে হয় গীতিসত্র প্রতিষ্ঠানের জন্যে, শিল্পী সঞ্জয় রায়ের অনুরোধে। এটি শচীনকর্তার আত্মস্মৃতি 'সরগমের নিখাদ'-এর ভূমিকা-রচনা ও সংকলন-সম্পাদনার কাজেও লাগে। বইটি প্রথমা প্রকাশন থেকে বের হয়, মূলত *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমানের আগ্রহ ও আনুকূল্যে।

অনেক জনপ্রিয় আধুনিক গানের গীতিকার ভাস্কর বসু — আমাদের অরুণদা, মানে অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, এই কাজে শুধু উৎসাহিতই করেননি, নানা তথ্যের সন্ধান ও সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনাও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার অনেক ঋণ জমে আছে।

প্রতিভাসের বীজেশ সাহার কথাও স্মরণ করতে হয়। তাঁর *শহর* নামের মাসিক পত্রিকায় এই বইয়ের বেশ কয়েকটি লেখা *কালি ও কলম* এবং *শিল্প ও শিল্পী* পত্রিকার সৌজন্যে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেন।

কলের গান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের আরো অনেক সংগীতানুরাগী-সুহৃদের পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি — তাঁদের নাম উল্লেখ না করলে সৌজন্যের ঘাটতি হয়, যেমন : অনুপম হায়াত (ঢাকা), অপরেশ কুমার ব্যানার্জি (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), আলী ইমাম (ঢাকা), করুণাপ্রসাদ দে (কলকাতা), কাজল অধিকারী (কলকাতা), ড. স্বপন বসু (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা), ড. বারিদবরণ ঘোষ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), ড. করুণাময় গোস্বামী (ঢাকা), ড. তপন বাগচী (বাংলা একাডেমী, ঢাকা), ড. মাসুদ রহমান (আমলা সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া), ডা. বাসুদেব মণ্ডল (কৃষ্ণনগর), দিগ্বিজয় চৌধুরী (কলকাতা), প্রশান্ত দাঁ (কলকাতা), বাবু রহমান (ঢাকা), মোঃ হুসাইন টিটু (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), মোহিত রায় (কৃষ্ণনগর), যতীন্দ্রনাথ রায় (বহিরগাছি, নদীয়া), লালিম হক (কুষ্টিয়া), শহীদুল ইসলাম (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), শেখ জাকির হোসেন (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), শুভ ভট্টাচার্য (আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা), সলিল চক্রবর্তী (কলকাতা), সোমনাথ সেন (সেনোলা রেকর্ড কোম্পানি), স্বপন সোম (কলকাতা)।

বাঙালির কলের গান — এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো লেখাই *কালি ও কলম* এবং *শিল্প ও শিল্পী* পত্রিকায় ছাপা হয় এই দুই পত্রিকার সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম আবুল হাসনাতের সৌজন্যে। তিনি যথেষ্ট যত্ন নিয়ে বেশ বড়ো কলেবরের এই প্রবন্ধগুলো ছবি ও অন্যান্য তথ্যদলিলের সহযোগে প্রকাশ করেন। সরাসরি এ-কথা বলতেই হয়, এই দুই পত্রিকা ছাড়া এতো গুরুত্ব দিয়ে ও শোভনভাবে লেখাগুলো এদেশে ছাপার আর কোনো জায়গা ছিল না। সম্পাদক আবুল হাসনাত নিজেও একজন সংগীত-সমঝদার, তাই হয়তো এই ধরনের লেখা তাঁর মনোযোগ পেয়েছিল।

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলো নানা সময়ে লেখা। তাই আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও লেখাগুলোর মধ্যে একধরনের সমন্বয়-সম্পর্ক রয়েছে। একটি একক পরিকল্পনার ভাবনা থেকেই প্রবন্ধগুলো লেখা — এতে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতিতে কলের গানের সম্পর্ক ও প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে। গ্রামোফোন-সংস্কৃতির বিকাশে বাঙালির প্রাতিষ্ঠানিক উদ্‌যোগ ও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবদান এবং সেইসঙ্গে যুগন্ধর কয়েকজন গায়ক-সুরকার-গীতিকার সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যাবে এই বইয়ে। প্রবন্ধগুলোর বিষয়গত সাদৃশ্যের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনরুক্তির ত্রুটি থাকতে পারে, সহৃদয় পাঠক তা আপন গুণে মানিয়ে নেবেন বলে ভরসা রাখি। যাঁদের সম্পর্কে লিখেছি, এর বাইরেও খ্যাতিমান শিল্পীর অভাব নেই। পর্যায়ক্রমে তাঁদের সম্পর্কেও লিখব। তবে বই-প্রকাশের ব্যস্ততার কারণে যথেষ্ট তথ্য হাতে থাকলেও শিল্পী গওহরজান, জগন্ময় মিত্র, সুরকার হিমাংশু দত্ত, গীতিকার মোহিনী চৌধুরী বা সেনোলা রেকর্ড কোম্পানি সম্পর্কে লেখা অন্তর্ভুক্ত হতে পারলো না বলে দুঃখ প্রকাশ করছি। পরবর্তী সংস্করণে এই অপূর্ণতা দূর করার সুযোগ মিলবে বলে আশা করি — এই বইয়ে ছবি সংযোজন সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এই বইয়ে ব্যবহৃত ছবি ও স্কেচ নানা বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত — সেই সংখ্যা এতো বেশি যে উল্লেখ করতে গেলে তা অনেকখানি জায়গা নেবে। এ জন্যে মার্জনা চাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স থেকে *বাঙালির কলের গান* বইটি বের হলো — আমার পক্ষে এ-বড়ো আনন্দের বিষয়। এই বইয়ের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌সের প্রকাশক আবুল খায়ের ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরী। তাঁদের কাছেও আমার ঋণ। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত যাঁরা — তাঁদের, বিশেষ করে আবুল হাসনাত, চিত্রকর কাইয়ুম চৌধুরী এবং সেইসঙ্গে যাঁদের সহায়তা-সৌজন্যে-আনুকূল্যে এই বইয়ের জন্ম, সবাইকে আমার বিনত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

গ্রামোফোনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা বাঙালির ঐশ্বর্যময় সংগীতভুবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাঠক যদি আনন্দ ও গৌরববোধ করেন, কিছু তৃপ্তি পান, স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠেন, সামান্য হলেও কৌতূহল ও সন্ধিৎসা জাগে — তবেই আমার এই শ্রমের সার্থকতা।

আবুল আহসান চৌধুরী
বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
(০০-৮৮)-০১৭১১-৯৫৪৭১৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

বাঙালির কলের গান : কাল-কালান্তর ১৫
মেগাফোন কোম্পানি : কমলকুমার ঘোষের ভাষ্য ৫৬
হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি : ঐতিহ্যের বহমান ধারা ৯৩
কে. মল্লিক : বাংলা গানের বিস্মৃত যুবরাজ ১১০
আব্বাসউদ্দীন : লৌকিক সুরের চারণ ১৩১
শচীন দেববর্মন : গোধূলির ছায়াপথে এক নিঃসঙ্গ পথিক ১৫১
কমলা ঝরিয়া : স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোছায়ায় ১৬৮
ভোরের যূথিকার সঙ্গে আলাপ ১৯২
কমল দাশগুপ্ত : হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে ২৬৪
প্রণব রায় : মনে রেখো মোর গান ২৮৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাঙালির কলের গান

কাল-কালান্তর

'গ্রামোফোন', বাঙালির কাছে যার ডাকনাম 'কলের গান' — সেই চাকতি-ঘোরানো যন্ত্রের গানের যুগের অবসান হয়েছে বেশ কয়েক দশক আগেই। কলের গান আজ স্মৃতি ও শ্রুতির অন্তর্গত। অথচ গত শতকের গোড়া থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্তও কলের গানের অস্তিত্ব ছিল। একসময় বাঙালির বিনোদনের খুব প্রিয় উপকরণ ছিল গ্রামোফোন। বাঙালির জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল গ্রামোফোন-সংস্কৃতি। কেবল শহরে নয়, গ্রামে-গঞ্জেও পৌঁছে গিয়েছিল গ্রামোফোনের সুরের ধারা। অভিজাত ধনীর গৃহ তো বটেই, সম্পন্ন মধ্যবিত্তের ঘরেও প্রবেশ করেছিল এই যন্ত্র, এমনকি গ্রামের মানুষও বঞ্চিত হয়নি এর সুরের স্বাদ থেকে। গ্রামে-গঞ্জে পয়সা বা ফসলের বিনিময়ে গ্রামোফোনের গান শোনানোর জন্যে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসাদারেরও আবির্ভাব হয়েছিল। মেলা বা আড়ং ছিল কলের গান শুনিয়ে কড়ি আদায়ের আরেক শাঁসালো জায়গা। অনেক সময় গ্রামোফোন কোম্পানির উদ্‌যোগেও নানা জায়গায় কলের গানের প্রচার-সফরের ব্যবস্থা থাকতো।

বিদেশিদের সৌজন্যে গ্রামোফোনের চল শুরু হলেও বাঙালিরাও পিছিয়ে থাকেননি — তাঁরাও গ্রামোফোনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন — পর্যায়ক্রমে গ্রামোফোন-যন্ত্র ও রেকর্ড বিক্রি, গ্রামোফোন-যন্ত্র সংযোজন ও তৈরি এবং গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির ভেতর দিয়ে। এর পেছনে যে শুধু ব্যবসার হাতছানিই ছিল তা নয়, একধরনের স্বদেশি-চেতনাও যুক্ত হয়েছিল। অল্পদিনেই বাঙালির হাতে এই ব্যবসার প্রসার ঘটে। তাঁরা সাহেব-কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেন। একের পর এক গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির বাঙালি-কোম্পানি গড়ে ওঠে। জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠের গান ও যন্ত্রের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংগতের পাশাপাশি এই রেকর্ড-তৈরিকে কেন্দ্র করে নতুন শিল্পী ও কলাকুশলীরও আবির্ভাব ঘটে। বাংলা গানের ভুবন হয়ে ওঠে তরঙ্গমুখর। সে ছিল বাংলা গানের এক স্বর্ণযুগ। কলের গানের সেই যুগের কাহিনি যেন উপন্যাসের বিন্যাসেই রচিত। কিন্তু সেই চমক ও শিহরণ-জাগানো ইতিহাস প্রায় অকথিত-অলিখিতই থেকে গেছে। এককালের উজ্জ্বল ক্যানভাসের সেই ছবি আজ বিবর্ণ ও অস্পষ্ট।

দুই

মার্কিন মুলুকের বিজ্ঞানী টমাস আল্‌ভা এডিসন ১৮৭৭-এ আবিষ্কার করেছিলেন এক আশ্চর্য যন্ত্র। 'ফোনোগ্রাফ' নামের এই যন্ত্রে কথা ধারণ করে তা বাজিয়ে শোনানো যেত। কিন্তু এখন ২০০৮ সালে এসে জানা যাচ্ছে, এডিসনেরও কুড়ি বছর আগে (১৮৫৭) এক ফরাসি পুস্তক-ব্যবসায়ী এডওয়ার্ড লিয়ঁ স্কট শব্দধারণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। 'ফোনাটোগ্রাফ' নামের এই যন্ত্রেই 'পৃথিবীর প্রথম রেকর্ড করা মানবকণ্ঠ'র সন্ধান মেলে। এই তথ্যটি আমরা ব্যবহার করছি ইন্দ্রানী মজুমদারের সৌজন্যে (দৈনিক *আজকাল* : ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১১)। যাই হোক, আবার এডিসনের কথায় ফিরে আসি। এই যন্ত্র যে এডিসনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো উদ্ভাবন, তা কিন্তু তিনি মনে করতেন না। 'ফোনোগ্রাফ' আবিষ্কারের পরের বছরই এডিসন তাঁর দিনপঞ্জিতে 'ফোনোগ্রাফ'কে খেলনার মতো সাময়িক আনন্দের সামগ্রী বিবেচনা করে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে এর যে আদৌ কোনো ভবিষ্যৎ আছে তা স্বীকার করতে চাননি। কয়েক বছর পর এই যন্ত্রের কিছু ত্রুটি সারিয়ে একে আরো কার্যকর করে তোলেন বেল ও টেইনটার। আরো কিছু পরে ১৮৮৮-এ জার্মান-বিজ্ঞানী এমিল বার্লিনার আগের Cylindrical Wax Record-এর বদলে Disc Record তৈরি করে এডিসনের আবিষ্কারে নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর সৌজন্যেই 'ফোনোগ্রাফ' যন্ত্রের নাম হয় 'গ্রামোফোন'। বিস্মিত হতে হয় এ-কথা শুনলে, এই 'কলের গান' যন্ত্রটি আবিষ্কারের মাত্র দুই বছরের মধ্যেই বঙ্গদেশে পৌঁছে যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ১৮৭৯ সালে স্যামুয়েল হ্যারাডেন 'একটি নিম্নমানের ফোনোগ্রাম যন্ত্র' কলকাতায় নিয়ে আসেন। এই মার্কিন ভদ্রলোক কলকাতার টাউন হলে মহমেডান লিটারেরি সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে ফোনোগ্রাম যন্ত্রটির দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন' (দৈনিক *আজকাল* : ৩০ অক্টোবর ২০১১)। এই মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান সংগঠন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ। ১৮৮৮ সালে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ একটি ফোনোগ্রাফ সংগ্রহ করেন। অবশ্য আরেকটি সূত্রে জানা যায়, ১৮৭৮-এর শেষে অর্থাৎ আবিষ্কারের প্রায় বছরখানেকের মধ্যেই নাকি 'ফোনোগ্রাফ' যন্ত্রের সঙ্গে কলকাতার মানুষের পরিচয় ঘটে। যাই হোক, ফাদার লাফোঁর কিছু পরেই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু সেই সময়ের কর্মস্থল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে এই ধরনের একটি ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র স্থাপন (১৮৯১) এবং সেই যন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের গানও রেকর্ড করেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা সফরকালে সেখান থেকে ১৮৯৪ সালের শেষ দিকে খেতরির মহারাজাকে একটি ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র উপহার পাঠানোর কথা এক চিঠিতে জানান। ১৮৯৬ সালের মধ্যেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও যে ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র প্রবেশ করেছে তার প্রমাণ মেলে 'খামখেয়ালি সভা'র প্রথম অনুষ্ঠানপত্রে। এর পরের কাহিনি আরো এগিয়ে যাওয়ার — ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনার।

তিন

বাঙালি মুসলমানের ঘরে ফোনোগ্রাফ বা গ্রামোফোনের প্রথম প্রবেশ কখন ঘটে, সেই তথ্য অজ্ঞাত। গানবাজনার ব্যাপারে শাস্ত্রীয় বাধা, সামাজিক রক্ষণশীলতা ও আর্থিক অসঙ্গতির কারণে হয়তো তা কিছুটা বিলম্বিতই হয়েছিল। তবে বাংলায় ছোটো-বড়ো মুসলিম জমিদারের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। নিশ্চয়ই তাঁদের কারো কারো ঘরে উনিশ শতকেই কলের গান পৌঁছে গিয়েছিল। কেননা গানবাজনা বা আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে তাঁরা যে হিন্দু জমিদারদের চেয়ে খুব পিছিয়ে ছিলেন তা নয়। অনুমান ছাপিয়ে অন্তত একটি স্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে 'বিষাদসিন্ধু'র লেখক মীর মশাররফ হোসেনের ভাষ্যে। পত্নীর মৃত্যুতে শোককাতর মশাররফ *বিবি কুলসুম* (১৯১০) বইয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কুলসুমের কলের গানের প্রতি অনুরাগের কথা জানিয়েছেন। গ্রামোফোন-রেকর্ডে গান শুনতে তিনি ভালোবাসতেন। এ-প্রসঙ্গে মশাররফ উল্লেখ করেছেন, এক অবসর-মুহূর্তে বিবি কুলসুম তাঁকে বলছেন :

'যুবরাজকে বলো গ্রামফোন বাজাইতে। এখন আর পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না। গ্রামফোনে গান শুনাও। — কুলসুম বিবি নিম্নলিখিত কয়েকটি গান আগ্রহ করিয়া শুনিতেন। যথা —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'গোঠ হইতে আইল নন্দদুলাল'
'এ কি সেই যমুনা প্রবাহিনী'
চণ্ডীদাসের দোঁহা, পদাবলী।
সাধ না মিটিল আশা না পুরিল।

'হেসে নেও দুদিন বৈ ত নয়, — আর বড়ালের — ধিনতা ধিনা পাকা নোনা।' সকলে হাসিয়া কুটি কুটি হইত, তিনি হাসিতেন না, অনেক গান শুনিয়া তাহার চক্ষে জল পড়িত।' — এ-থেকে অনুমান করা চলে, মশাররফের 'সুখী গৃহকোণে' গ্রামোফোন শোভা পেয়েছিল হয়তো বিশ শতকের শুরুতেই।

ভাওয়াইয়া গানের অনন্য রূপকার আব্বাসউদ্দীন আহমদের ছেলেবেলাতেই গ্রামোফোনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তখন গ্রামের মুসলমান চাষি-গেরস্থর ঘরে ঘরে কলের গান বাজিয়ে শোনানোর ভ্রাম্যমাণ কলের গান-অলার দেখা মিলতো। আব্বাসউদ্দীন প্রথম কলের গান শোনেন 'উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা' দেওয়ার পর। আব্বাসের জন্ম ১৯০১-এ, ছয়-সাত বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়ে পাঁচ ক্লাস পড়ে পরীক্ষা দেন ১৯১২ অথবা ১৩-তে। তাহলে ওই ১৯১২-১৩ সালের দিকেই গ্রামোফোনে প্রথম গান শোনার সুযোগ মেলে। ততদিনে গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড, নিকোল রেকর্ড, অডিয়ন রেকর্ড, বেকা রেকর্ড — এইসব কোম্পানি গ্রামোফোন-সামগ্রীর ব্যবসায়ে জাঁকিয়ে বসেছে বাংলায়। স্বদেশি রেকর্ড কোম্পানিও এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকেনি। আব্বাসউদ্দীন তাঁর *আমার শিল্পী জীবনের কথায়* (১৯৬০) 'প্রথম গ্রামোফোনে গান শোনা'র বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে :

'উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে বসে আছি। কোনো কাজ নেই, খাওয়া-দাওয়া আর বিকাল তিনটা বাজতেই ফুটবল নিয়ে মাঠে গিয়ে সেই তিনটার রোদ্দুর থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত শ্রান্তিবিহীন বল খেলা। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, 'আব্বাস, তোমাদের বাড়ীতে কলের গান হচ্ছে...' শুনেই ভোঁ দৌড়। তাজ্জব কাণ্ড — চোঙ্গাওয়ালা এক কলের গান থেকে সত্যিই গান বেরুচ্ছে। অবাক হয়ে গেলাম। কী করে একটা বাক্সের ভেতর থেকে গান হয় এ কৌতূহল আর দমন করতে না পেরে লোকটাকে বললাম, 'খুলে দেখাও তো ভেতরে কে গান গাইছে?' লোকটা কিন্তু বাড়ী বাড়ী দুই-চারখানা রেকর্ড শুনিয়ে দু'সের এক সের চাউল বা পয়সা যে যা দেয়, তাই নেয়। বললে, 'পাঁচ ছ'সের চাউল নিয়ে এসো খোকা, আমি দেখাচ্ছি ভেতরে কে গান গাইছে।' মহা উল্লাসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাড়ীর ভিতরে ছুটলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না রান্নাঘরে। ডেকে হয়রান ... মা কোথায়, বোনরা কোথায়! ও খোদা, তারা যে সবাই আমাদের দক্ষিণের ঘরের ভেতর জানলা জুড়ে বসে গান শুনছিল খেয়াল করিনি। মাকে বললাম, 'মা পাঁচ-ছ'টালা (চাউল মাপার পাত্র, এক টালায় দেড় সের) চাউল দাও, কলের গানের ভেতরে লোক আছে, সেটাকে খুলে দেখাবে লোকটা।' ... চাউল দিলাম, কিন্তু যন্ত্র খুলে দেখাল, না আছে লোক, না আছে কেউ। বললে লোকটা, 'নারে বাবা, ভেতরে লোক নাই, এই যে কুকুর মার্কা শ্লেট মানে রেকর্ডখানা দেখতে পাচ্ছ, এই ছোট্ট সুঁই মানে পিনটা লাগিয়ে দিলেই দেখ কী সুন্দর গান হয়।' আজও মনে পড়ে সে গান ...

'বুড়ী তুই গাঁজার জোগাড় কর
ওলো তোর জামাই এলো দিগম্বর।'

সে গান প্রসিদ্ধ কৌতুক অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর।

ওই প্রথম কলের গান শোনার সুযোগ আব্বাসউদ্দীনের মনে যে স্বপ্নবীজ বুনে দিয়েছিল — যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল অভিভূত-বিমুগ্ধ-প্রাণিত বালকের অন্তরে, তা এইরকম :

'ঐ কলের গানের গান শুনে সেই শৈশব থেকেই প্রাণে-মনে দোলা লেগেছিল, আমি কি কোনোদিন ঐভাবে কলের গানে গান দিতে পারব না? আমাদের বাড়ীতে প্রকাণ্ড ইঁদারা, সেই ইঁদারায় পানি তুলতে তুলতে হঠাৎ যেন কার ডাকে সাড়া দিয়ে উঠেছি, ইঁদারার ভেতরে একটা সুন্দর প্রতিধ্বনি হল। মনে হল এ প্রতিধ্বনিটা ঠিক কলের গানেই শুনেছি। ... একখানা গান ধরলাম, গানের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। মনে কী উল্লাস, মাকে ডাকছি, ভাইদের ডাকছি, শোন শোন শুনে যাও কলের গান।'

কলের গানের মোহজালে আবিষ্ট এক গ্রাম্যবালক যে উত্তরকালের সাড়া-জাগানো শিল্পী হয়ে উঠলেন, তার মূলে ছিল গ্রামোফোনেরই ভূমিকা। ধীরে ধীরে মুসলিম জনমানসেও গ্রামোফোন জায়গা করে নিল। 'শয়তানের বাক্স' গোনাহ্‌র বেড়া ডিঙিয়ে অবশেষে বাঙালি মুসলমানের শুধু অন্দরমহল নয়, অন্তরমহলেও প্রবেশের অধিকার পেলো।

বাঙালি মুসলমান সমাজে কলের গানের কদর যে বাড়ছিল নানা সূত্রে সে-খবর পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন মুক্ত মন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। ১৯২৬-এ ঢাকায় গড়ে ওঠা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য-সমাজে'র তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। মোতাহার হোসেন কেবল সংগীতের সমঝদারই ছিলেন না, রীতিমতো নাড়া বেঁধে ওস্তাদ হাকিম মোহাম্মদ হোসেনের কাছে টপ্পা, ঠুমরি ও খেয়ালের তালিমের পাশাপাশি সেতারও শেখেন। নজরুলের কাছ থেকে বেশকিছু গানও তিনি তুলে নিয়েছিলেন। গান নিয়ে কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধও তিনি লেখেন। রক্ষণশীল সমাজের আপত্তি ও ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মেয়েদেরও গান শিখিয়েছিলেন। স্ত্রী সাজেদা খাতুনকে ১৯৩১-এর ১ এপ্রিল লেখা এক চিঠিতে তিনি গ্রামোফোন কেনার কথা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'আজ ১৪৲ পাঠাচ্ছি। ১০৲ টাকা গ্রামোফোন বাবদ। ২১০ টাকার গ্রামোফোনই নিয়ো। যদি Gramophone না হয়, তবে 61288 নং পলিসীর দরুন ধার ইনশিওর অফিসে শোধ দেয়া হয়। আমি বলি, যখন সুবিধায় পাওয়া যাচ্ছে, তখন Gramophone নেওয়াই ভাল।' এ-থেকে বেশ বোঝা যায়, তিরিশের দশকে শিক্ষিত, সম্পন্ন ও রুচিবান বাঙালি মুসলমানের ঘরে বিনোদনের সামগ্রী হিসেবে গ্রামোফোন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

কলের গানের ব্যবসায়েও সেই একেবারে প্রায় গোড়ার দিকেই বাঙালি মুসলমান ঝুঁকেছিল। টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদারনন্দন বিশিষ্ট রাজনীতিক আবদুল হালিম গজনবী (পরে স্যার) গ্রামোফোন ও রেকর্ড-ব্যবসায়ে প্রথম বাঙালি মুসলমান। শুধু প্রথম নয়, একক ও নিঃসঙ্গও বলা যায় এক্ষেত্রে। প্রখ্যাত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বল্লভদাস লক্ষ্মীদাস অ্যান্ড কোম্পানি বেকা রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ১৯০৬-এর মার্চে দ্য টকিং মেশিন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেকর্ড কোম্পানি নামে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর শাখা আপিস স্থাপিত হয় আবদুল হালিম গজনবীর কলকাতার বউবাজারের সাত নম্বর বাড়ির ঠিকানায়। ওই কোম্পানির তিনি হন কলকাতার মূল এজেন্ট এবং পাশাপাশি বেকা রেকর্ডের পূর্ববঙ্গ ও আসামের পরিবেশনার নিয়ন্ত্রণভারও তাঁর ওপর বর্তায়। গ্রামোফোন রেকর্ড-নির্মাতা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে হেমেন্দ্রমোহন বসু ও শ্যামাচরণ দাসের মতো আবদুল হালিম গজনবীও স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। মাইকেল কিনিয়ারের সূত্রে জানা যায় : 'Another highly regraded businessman was Abdul Hamid Ghuznavi, the Muslim Swadeshi leader who had established the United Bengal Co., in 1905, and who became the Beka Record G.m.b.H., agent in Bengal for the

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

repertoire of BEKA RECORDS in association with Valabhdas Runchordas of Bombay, who was also a strong supporter of the nationalist cause and who virtually controlled the talking machine trade in Western India.' গজনবীই ছিলেন এই ব্যবসায়ে একমাত্র উল্লেখ করার মতো বাঙালি মুসলমান। কলকাতা, বোম্বে, লাহোর, এমনকি নেপালেও অবাঙালি মুসলমান গ্রামোফোন-সামগ্রীর ব্যবসা ও নিজস্ব কোম্পানির লেবেলে রেকর্ড-প্রকাশের ব্যাপারে উদ্‌যোগী হলেও দেশভাগের আগ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের আগ্রহ জাগেনি এ-বিষয়ে।

চার

ফোনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন-যন্ত্র আবিষ্কার ইউরোপ-আমেরিকায় আলোড়ন তোলে। দ্রুত এর প্রসার ঘটতে থাকে। আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে গ্রামোফোন কোম্পানি গড়ে ওঠে। ক্রমে গ্রামোফোন-ব্যবসার উপনিবেশ গড়ে তুলতে প্রাচ্যদেশের প্রতি নজর পড়ে গ্রামোফোন-বেনিয়াদের। ১৮৯৮ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত 'গ্রামোফোন কোম্পানি'র প্রতিনিধি হিসেবে জন ওয়াটসন হড্ ১৯০১-এর মাঝামাঝি সময়ে ভারতে এসে কলকাতা-মাদ্রাজ-বোম্বে-দিল্লি নানা শহরে ঘুরে এদেশে গ্রামোফোনের এক বিশাল বাজারের সন্ধান পান। হডের সুপারিশমতো এই বছরেই কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানি অফিস খুলে বেশ জাঁকিয়ে বসে। হড্ তাঁর লন্ডনের কর্তাদের ভারতে 'recording expert' পাঠানোর অনুরোধও জানিয়েছিলেন এদেশি শিল্পীদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত রেকর্ড করার জন্যে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি 'technical recorder' ও 'artist adviser' হিসেবে ফ্রেডরিক্ উইলিয়ম গেইস্‌বার্গ ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে ভারতে পাঠান। গেইস্‌বার্গ আর তাঁর সঙ্গীরা ১৯০২-এর ২৮ অক্টোবর কলকাতায় পৌঁছান। এরপর তাঁদের কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে বাংলা এবং সেইসঙ্গে ভারতের গ্রামোফোন-সংস্কৃতির এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়।

পাঁচ

গেইস্‌বার্গ কলকাতায় রেকর্ডিংয়ের কাজে আসার কিছু আগেই, ১৮৯৯-এর গোড়ার দিকে, লন্ডনে ভারতীয় শিল্পীদের কিছু গান রেকর্ড করেন। এই বছরের মে মাসে এই 'হিন্দুস্থানি রেকর্ডে'র একটি তালিকা-পুস্তিকা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হয়। গেইস্‌বার্গ-ধারণকৃত ৪৪টি রেকর্ডের মধ্যে হিন্দি, আরবি, ফারসি, উর্দু, গুর্‌মুখি ভাষার গান ও আবৃত্তি থাকলেও বাংলা গান সেখানে অনুপস্থিত। গানগুলোর কয়েকটি ছিল রামায়ণ, হোলি ও রাস-বিষয়ক — ছিল হাফিজ ও মির্জা গালিবের কবিতা, গুরু নানকের দোঁহা এবং কোরআন শরিফ থেকে তেলাওয়াত। লন্ডনে ধারণকৃত এই প্রথম ভারতীয় রেকর্ড কেমন সমাদর পেয়েছিল সে খবর পাওয়া যায় না। তবে তা যে গেইস্‌বার্গকে ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল সে-কথা অনুমান করা চলে।

ছয়

কলকাতায় পৌঁছেই গেইস্‌বার্গ রেকর্ডিংয়ের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দেন। এ-বিষয়ে তিনি 'গ্রামোফোন কোম্পানি'র কলকাতার প্রতিনিধি জন ওয়াটসন হডের পরামর্শ ও সহায়তা পান। অবশ্য 'গ্রামোফোন কোম্পানি'র অন্য যাঁরা এজেন্ট বা প্রতিনিধি ছিলেন ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা ও অনাগ্রহ গেইস্‌বার্গকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছিল। তাঁর রোজনামচায় এ-কথা বেশ ক্ষোভের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে : 'I soon discovered that the English whom we contacted and who were acting as our agents and factor, might be living on another planet for all the interest they took in Indian music. They dwelt in an Anglo-Saxon compound of their own creation, isolated from India.' নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই ধরনের মন্তব্য করতে পেরেছিলেন। অল্পদিনেই গেইস্‌বার্গ কলকাতার থিয়েটারপাড়া আর বেশ্যা-বাইজির আসরে-বাসরে ঘুরে বেশ কিছু কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পী আবিষ্কারে সফল হন। এ-কাজে থিয়েটারের নামকরা নট ও নির্দেশক অমরেন্দ্রনাথ দত্তের উদার সহযোগিতা ও আনুকূল্য তিনি পেয়েছিলেন।

কলকাতায় এদেশীয় শিল্পীদের নিয়ে গেইস্‌বার্গের রেকর্ডিংয়ের যাত্রা শুরু হয় ১৯০২-এর ৮ নভেম্বর। অবশ্য এর কয়েকদিন আগে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে W.S. Burk-এর একটি ইংরেজি গান রেকর্ড করেছিলেন। তবে ওই ৮ নভেম্বরই প্রথম বাঙালি শিল্পীর বাংলা গান রেকর্ড করা হয়। 'কাঁহা জীবনধন' — এই কীর্তনটি গেয়েছিলেন ক্ল্যাসিক থিয়েটারের চতুর্দশী নর্তকী মিস্ শশীমুখী। ওই একই তারিখে ক্ল্যাসিক থিয়েটারেরই আরেক নাচিয়ে মিস্ ফণীবালার গানও রেকর্ড করা হয়। শশীমুখী বা ফণীবালা বাংলা গানের জগতে কোনো নামি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গাইয়ে ছিলেন না, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম লেখা হয়ে গেলো এইভাবে। ১০ নভেম্বরেও ক্ল্যাসিক থিয়েটারের সহায়তায় আরো কিছু শিল্পীর গানের রেকর্ড করার সুযোগ হয়। তবে গেইস্‌বার্গের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার নিঃসন্দেহে কিন্নরকণ্ঠী গওহরজান। চোখ-ধাঁধানো রূপের ছটা আর রেওয়াজি মধুময় কণ্ঠ — এই দুই মিলিয়ে গওহরজান সেকালের সংগীতরসিক ও সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষের প্রাণ-মন হরণ করেছিলেন। বাংলা মুলুক পেরিয়ে সারা ভারতের সংগীতমহলেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। বাবা ছিলেন আর্মেনিয়ান আর মা বাঙালি — মা-বাবার বনিবনা হয়নি তাই ভাঙা-সংসারের কন্যা ছিলেন গওহরজান। মা মালকাজান ছিলেন নামকরা বাই, তাঁর হাত ধরেই গানের জগতে তাঁর প্রবেশ। ১১ নভেম্বর গেইস্‌বার্গ গওহরজানের কণ্ঠের গান ধারণ করেন রেকর্ডে। গওহরজান হিন্দুস্থানি ভাষায় দাদরা তালে প্রথম যে গানটি রেকর্ড করেছিলেন তা উল্লেখ করা হয়েছিল 'Mahomedan Song' বলে। গেইস্‌বার্গ-ধারণকৃত তাঁর প্রথম বাংলা গান হলো — 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে'। এই একই দিনে শৈল বাইও রেকর্ডে গান দেন। পরের দিন ১২ নভেম্বর আবারো গওহরজানের গান রেকর্ডে ধারণ করা হয়। ১৪ নভেম্বর বাংলার রঙ্গমঞ্চ দাপিয়ে বেড়ানো হরিমতী ও সুশীলা রেকর্ডের শিল্পী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। এর পরপরই কয়েকদিনের ব্যবধানে ক্ল্যাসিক থিয়েটার ও করিন্‌থিয়ান থিয়েটারের বৃন্দবাদ্য রেকর্ডে গৃহীত হয়। থিয়েটারের জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যেও অনেকের গান রেকর্ড হয়, — যেমন — বিনোদিনী (অভিনেত্রী নন), কিরণ, রাণী এবং আরো কেউ কেউ। দেখা যায়, গেইস্‌বার্গের এই প্রথম রেকর্ডিং-পর্বে মেয়ে-শিল্পীদেরই আধিপত্য ছিল।

কলকাতার হাড়কাটা গলির অবিদ্যাপাড়ার বাসিন্দা নামকরা গায়ক লালচাঁদ বড়ালও ছিলেন রেকর্ডিংয়ের প্রথম পর্বের শিল্পী। গেইস্‌বার্গ তাঁর কণ্ঠের তারিফ না করতে পারলেও রেকর্ডশিল্পী হিসেবে লালচাঁদ দারুণ নাম করেছিলেন, তাঁর রেকর্ডের চাহিদা ছিল প্রায় গওহরজানের কাছাকাছি। লালচাঁদ বাংলা গানের পাশাপাশি হিন্দুস্থানি খেয়ালের রেকর্ডও করেন। যতদূর মনে হয় লালচাঁদের প্রথম রেকর্ড একটি হিন্দুস্থানি খেয়াল গানের — 'পিয়া বিন্ নিন্দা মেরি'। 'তুমি কাদের কুলের বউ গো', 'উমা কেমন মা কে জানে', 'আমারে আসতে বলে', 'তোমার ভালো তোমাতে', 'ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা' — বড়ালের এইসব গান এতোই জনপ্রিয় হয়েছিল যে শ্রোতাদের চাহিদা পূরণের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্যে রেকর্ডগুলো অনেকবার ছাপতে হয়েছিল। ১৪ মার্চ ১৯০৭-এ মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু না হলে বাংলা গান — বিশেষ করে গ্রামোফোন-শিল্প আরো সমৃদ্ধ হতে পারতো। গেইস্‌বার্গের কলকাতায় ছয় সপ্তাহের সফর আশাতীত সফল হয়েছিল। এই যাত্রায় গেইস্‌বার্গ সাত ও দশ ইঞ্চি মিলিয়ে মোট ৬৫২ খানা কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড করেন। গওহরজান ও লালচাঁদ বড়ালের পাশাপাশি থিয়েটারসহ বাইজিমহল ও পতিতাপল্লি থেকে যে-সব শিল্পী আবিষ্কৃত হন, কয়েক দশক ধরে তাঁরা গ্রামোফোনের মাধ্যমে বাংলার সংগীতজগৎকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। যে-গান ছিল বিত্তবানের বৈঠকখানা-জলসাঘর-বাগানবাড়ি কিংবা বাইজিমহল-পতিতালয়ে সীমাবদ্ধ, ক্রমে ক্রমে তা হয়ে উঠলো আমজনতার বিনোদনের সামগ্রী। এর পরের কাহিনি গ্রামোফোনের ক্রম-প্রসার ও জন-মন-জয়ের ইতিহাস।

সাত

গেইস্‌বার্গের কল্যাণে ভারতে, বিশেষ করে বাংলায়, গ্রামোফোনের এক বড়ো বাজার তৈরি হয়। 'দ্য গ্রামোফোন অ্যান্ড টাইপরাইটার লিমিটেড' এই বাজার সম্প্রসারণে আরো তৎপর হয়ে ওঠে। তাই গেইস্‌বার্গের পরে রেকর্ডিংয়ের জন্যে ১৯০৪-এ উইলিয়ম সিনক্লের ডার্বি এবং ১৯০৬-এ গেইস্‌বার্গের অনুজ উইলিয়ম কন্‌রাড গেইস্‌বার্গ ভারতে আসেন। ডার্বির নেতৃত্বে বাংলা ও মার্গসংগীতের অনেক নামি শিল্পীর গান রেকর্ড করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কিরানা ঘরানার প্রখ্যাত শিল্পী ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ। ছোটো গেইস্‌বার্গ যাঁদের গান রেকর্ড করেন তাঁদের মধ্যে পিয়ারা সাহেব, 'ছপ্পান ছুরি' নামে পরিচিত জানকি বাই, গওহরজানের নাম সবার আগে বলতে হয়। এঁদের মধ্যে গওহরজানের গান বড়ো গেইস্‌বার্গ আগেই রেকর্ড করেছিলেন ১৯০২ সালে। তবে পিয়ারা সাহেব ও জানকি বাইকে আবিষ্কারের কৃতিত্ব ছোটো গেইস্‌বার্গের। আর একটা তথ্য চমকে দেয় আমাদের, 'পরবর্তী ২৫ বছরে গ্রামোফোন কোম্পানির সর্বাধিক রেকর্ড বিক্রির লিস্টে তাঁর [পিয়ারা সাহেব] নামই ছিল সবার ওপরে' (দৈনিক *আজকাল* : ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১)। আগে তো কেবল গ্রামোফোন-যন্ত্র ও বিদেশি ভাষার রেকর্ড বিক্রি হতো, এখন বাংলা গানের রেকর্ড তৈরি ও বিক্রির সুযোগ মিললো। প্রথম যুগে এদেশে ধারণকৃত রেকর্ড জার্মানির হ্যানোভারে পাঠাতে হতো চূড়ান্ত ছাপার জন্যে। এতে সময় যেমন বেশি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাগতো, পাশাপাশি অনেক রেকর্ড নষ্টও হতো। এ-সব সমস্যা দূর করার জন্যে এবং ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এদেশেই, গেইস্‌বার্গের প্রথম রেকর্ডিংয়ের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে, ১৯০৭-এ কলকাতার বেলেঘাটায় ভারতে গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের প্রথম কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সিলিন্ড্রিক্যাল রেকর্ড থেকে ডিস্‌ক রেকর্ড যুগে প্রবেশ করে গ্রামোফোন। এই কারখানা স্থাপনের ভেতর দিয়ে এদেশে গ্রামোফোনের বাজার দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। ততদিনে বিদেশি গ্রামোফোন কোম্পানিগুলো একে একে এসে ভিড় জমিয়েছে কলকাতায় : দ্য গ্রামোফোন অ্যান্ড টাইপরাইটার লিমিটেড এবং পরে পরিবর্তিত নামে দ্য গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড (গ্রামোফোন রেকর্ড, গ্রামোফোন কনসার্ট রেকর্ড, গ্রামোফোন মনার্ক রেকর্ড, জোনোফোন রেকর্ড, হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও কলম্বিয়া রেকর্ড : প্রথম পর্যায়ে ভারতের সোল্ এজেন্ট ছিল — মিউটোস্কোপ অ্যান্ড বায়োগ্রাফ), দ্য নিকোল রেকর্ড কোম্পানি লিমিটেড (নিকোল রেকর্ড), দ্য বেকা রেকর্ড জি.এম.বি.এইচ. (বেকা রেকর্ড), ইন্টারন্যাশনাল টকিং মেশিন কোম্পানি (ওডিয়ন রেকর্ড), দ্য নিওফোন কোম্পানি লিমিটেড (নিওফোন রেকর্ড), লাইরোফোন-হ্বের্ক অ্যাডল্‌ফ্ ল্যেবান অ্যান্ড কোম্পানি (এলিফোন রেকর্ড), প্যাথি কোম্পানি (প্যাথি রেকর্ড), ইউনিভার্সাল টকিং মেশিন ডিপো (নভেল রেকর্ড ও ইউনিভার্সাল রেকর্ড), ভিক্টর টকিং মেশিন কোম্পানি (মনার্ক রেকর্ড), এ. জানোউইটজার-রেকর্ডকৃত (আজানো ডবল-ফেস্ রেকর্ড), কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানি (কলম্বিয়া রেকর্ড), ভায়েলোফোন, ফেভারিট রেকর্ড ইত্যাদি। ফ্রেডরিক্ উইলিয়ম গেইস্‌বার্গ তাঁর *Music on Record* (১৯৪৮) বইয়ের এক অধ্যায়ে যে-তথ্য দিয়েছেন তাতে ভারতে গ্রামোফোন কোম্পানিগুলোর ১৯৩২ সাল নাগাদ তৎপরতা ও ব্যবসায়ের বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। গেইস্‌বার্গ বলেছেন : 'Almost every year thereafter from two to three thousand songs have been recorded in all parts of India, in most of the six hundred dialects and languages.' এ-থেকে সহজেই ধারণা করা যায় গ্রামোফোন কতোখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এদেশে এবং কী পরিমাণ ব্যবসার সুযোগ তারা পেয়েছিল। বিদেশি কোম্পানির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামোফোন-যন্ত্র ও রেকর্ড বিক্রি থেকে বাঙালি উদ্‌যোক্তারা ক্রমে রেকর্ড তৈরির ব্যবসায়েও নামেন এবং সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই উদ্‌যোগের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেছনে ব্যবসায়িক মানসতার পাশাপাশি স্বদেশি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও স্বাদেশিকতাবোধের চেতনাও অনেকাংশে কাজ করেছিল। গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির এই স্বদেশি উদ্‌যোগের প্রথম পুরুষ ছিলেন হেমেন্দ্রমোহন বসু ওরফে এইচ. বোস।

আট

সেকালে এইচ. বোস নামের আড়ালে হেমেন্দ্রমোহন বসু — এই পোশাকি নামটি অনেকখানিই চাপা পড়ে গিয়েছিল। হেমেন্দ্রমোহন ছিলেন স্বাপ্নিক-নিরীক্ষাপ্রিয় মানুষ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। তিনি যে রুচিশীল সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন সে পরিচয়ও তাঁর কাজের ভেতর দিয়ে পাওয়া যায়। সুগন্ধি-দ্রব্যের ব্যবসায়ে তিনি সারা ভারতে নাম কিনেছিলেন। তাঁর উৎপাদিত সুগন্ধি-দ্রব্যের উল্লেখ থাকতো ছড়ায় লেখা এই বিজ্ঞাপনটিতে :

কেশে মাখো 'কুন্তলীন'।
রুমালেতে 'দেলখোস্'।
পানে খাও 'তাম্বুলীন'।
ধন্য হউক এইচ বোস।

এইচ. বোস কেবল যে সুগন্ধি-ব্যবসায়ের সাফল্যেই 'ধন্য' হয়েছিলেন তা নয়, স্বদেশি রেকর্ড প্রকাশের পথিকৃৎ হিসেবেও 'ধন্য' করেছিলেন বাঙালিকে। সাহিত্যপ্রিয় হেমেন্দ্রমোহন ছোটগল্প প্রতিযোগিতার জন্যে 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। সেই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অখ্যাত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন নামে গল্প লিখে 'কুন্ত লীন পুরস্কার' পান।

এই হেমেন্দ্রমোহন সুগন্ধি-ব্যবসায়ের পাশাপাশি সাইকেল-কারখানা, ছাপাখানা, মোটরগাড়ি ও ক্যামেরা বিক্রির ব্যবসায়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সেইসঙ্গে ১৯০৬ সালের শুরুতেই ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র ও সিলিন্ডার রেকর্ড প্রস্তুত ও বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন কলকাতার ধর্মতলায় মার্বেল হাউসে 'দ্য টকিং মেশিন হল' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ১৯০০ সাল নাগাদ যখন এডিসনের কাছ থেকে একটি ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র সংগ্রহ করেন, তখন থেকেই কলের গান ও রেকর্ড-তৈরির স্বপ্ন জেগেছিল তাঁর মনে। ফরাসি দেশের প্যাথি কোম্পানির সহায়তায় তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তাঁর তৈরি রেকর্ড অল্পদিনেই সকলের নজর কাড়ে। হেমেন্দ্রমোহন বিদেশের ওপর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্ভর না করে নিজেই রেকর্ড সিলিন্ডার তৈরি করে চমক লাগিয়ে দেন। এই প্রয়াসের স্বীকৃতি ও সম্মাননাও তিনি পেয়েছিলেন ১৯০৬ সালে কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল এগজিবিশনে স্বর্ণপদক লাভের ভেতর দিয়ে। কলকাতায় তাঁর ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র ও রেকর্ডের একমাত্র পরিবেশক ছিল মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসের খানদানি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডোয়ার্কিন অ্যান্ড সন। রেকর্ড তৈরি শুরু করেছিলেন ওই অবিদ্যাপাড়ার থিয়েটারওয়ালি মিস্ নরি, মিস্ বসন্ত — এঁদের দিয়েই। কিন্তু ভিন্ন রুচি ও দৃষ্টির পরিচয় মিললো অল্পদিনেই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্য ছিল। সেই সুবাদে হেমেন্দ্রনাথ কবির আনুকূল্য লাভ করেন। এইচ. বোসের রেকর্ডে (H. Bose's Record) রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাঁরই রচিত গান ও কবিতা ধারণ করা হয়। রবীন্দ্রকণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এর রেকর্ডও প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশে গ্রামোফোনের আদিপর্বে রেকর্ডে রবীন্দ্রকণ্ঠ ধরে রাখার কৃতিত্ব একান্তভাবেই হেমেন্দ্রমোহন বসুর। ১৯০৬-এর মার্চে প্রকাশিত H. Bose's Records (Part II)-এর তালিকায় রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গানের বিবরণ মেলে। ফরাসি দেশের প্যাথি রেকর্ড কোম্পানির সহযোগিতায় এইচ. বোসের রেকর্ড প্রকাশিত হতো, — তাই রেকর্ডের লেবেলে লেখা থাকতো — PATHE–H. BOSE'S RECORD। তালিকা-পুস্তিকা থেকে জানা যায়, '১১ ইঞ্চি ডবল সাইডেড বাঙ্গালা প্যাথি রেকর্ড'-এর দাম ছিল তিন টাকা। ১৯০৭-এ কলকাতায় ডিস্‌ক রেকর্ড তৈরির কারখানা স্থাপিত হলে সিলিন্ডার রেকর্ডের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সেইসঙ্গে বিদেশি কোম্পানির ডিস্‌ক রেকর্ডও তখন সমানে এদেশে আসতে শুরু করেছে। এই সংকট মোকাবিলায় উদ্যমী হেমেন্দ্রমোহন ফ্রান্সের প্যাথি কোম্পানির সহায়তায় ডিস্‌ক রেকর্ড তৈরির ব্যবসায়ে যুক্ত হন। কিন্তু স্থানিক দূরত্ব, ধারণকৃত রেকর্ড প্রসেসিংয়ের বিলম্ব ও আরো নানারকম সমস্যার কারণে 'প্যাথি–এইচ. বোসেজ রেকর্ড' বাজারে অন্য কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারলো না। আর হেমেন্দ্রমোহন নির্ভর করলেন মূলত স্বদেশি গান ও রবীন্দ্রনাথের ওপর। নতুন শিল্পী সন্ধান ও নানা বিষয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ গান নির্বাচনে তাঁর তেমন উদ্‌যোগ ছিল না, যা অন্য রেকর্ড কোম্পানি জোরেশোরে শুরু করেছিল। ফলে এইচ. বোসের রেকর্ড কোম্পানি উঠে যায়। ঠিক কোন সাল পর্যন্ত এই রেকর্ড কোম্পানি চালু ছিল তা স্পষ্ট করে জানা যায় না, তবে অনুমান ১৯১০-এর পরে আর তার অস্তিত্ব ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Amrita Bazar Patrika-য় (১৯ মার্চ ১৯০৬) 'H. Bose's Records on Our New Model Phonographs' শিরোনামে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে বেশকিছু তথ্য পাওয়া যায়। এখানে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে : 'H. Bose's Records will prove to you that it has become possible for a Talking Machine to take the place of a Singer.' বিজ্ঞাপনে আরো জানানো হয় : 'For the first time in Calcutta, highly respectable gentlemen like Babu Rabindranath Tagore, Dwijendralal Roy, have kindly allowed us to record their voices and this is a privilege which has not been conferred upon any one else.' এখানে 'বন্দেমাতরম্' গানসহ রবীন্দ্রনাথ-রচিত ও গীত আটটি, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-রচিত পাঁচটি দেশাত্মবোধক এবং দ্বিজেন্দ্রলাল-রচিত ও গীত আটটি গানের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাঁর রচিত কবিতা ও গান অন্য রেকর্ড কোম্পানিও ধারণ করে প্রকাশ করেছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠের গান এইচ. বসুর রেকর্ড ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানি ধারণ করেনি। তাই সংরক্ষণের অভাবে ডি. এল. রায়ের কণ্ঠের গান চিরতরে হারিয়ে গেছে। প্যাথির সৌজন্যে প্রকাশিত এইচ. বোসের রেকর্ড-তালিকায় দেখা যায়, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রও রেকর্ডে গান দিয়েছিলেন — সে গানও রবীন্দ্রনাথের রচিত — 'বহে নিরন্তর আনন্দধারা' এবং 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে'। এ-থেকে বেশ বোঝা যায়, হেমেন্দ্রমোহনের ব্যবসাদারি মনোভাবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল শৌখিন ও সাহিত্যপ্রিয় মানসতা। আর স্বাদেশিকতাবোধের প্রেরণাও যে এর পেছনে প্রবলভাবেই ছিল, তার প্রমাণ মেলে 'H. Bose's Swadeshi Records' শিরোনামের এক বিজ্ঞাপন থেকে। সেখানে বলা হয়েছিল : 'Don't Send your money beyond the seas, be a true Swadeshi by using Genuine Swaseshi Records.' এ-সব কারণেই স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক হেমেন্দ্রমোহনের 'টকিং মেশিন হল' পুলিশি খানাতল্লাশির হাত থেকে রক্ষা পায়নি — ফলে নষ্ট হয়েছে অনেক মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সিলিন্ডার রেকর্ড এবং মূল্যবান কাগজপত্র। এইচ. বোসের 'স্বদেশি রেকর্ড' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জনমনে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল — অল্পদিনেই রেকর্ডের ব্যবসাও প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু ডিস্‌ক রেকর্ডের আবির্ভাবে সিলিন্ডার রেকর্ড অচল হয়ে গেলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হেমেন্দ্রমোহনের ভরসা ছিল প্যাথি কোম্পানির সহায়তার, কিন্তু নানা কারণে সে-পথও বন্ধ হওয়ায় একটি আশা-জাগানিয়া মহৎ সম্ভাবনা বিকশিত হওয়ার আগেই হারিয়ে গেল।

নয়

হেমেন্দ্রমোহনকে আমরা দেশি রেকর্ড-নির্মাতাদের অগ্রণী হিসেবে উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমাদের হাতে যে অস্পষ্ট ও সামান্য তথ্য আছে তাতে দেখা যায়, হেমেন্দ্রমোহনেরও আগে বাণিজ্যিকভাবে রেকর্ডে গান ধরে রাখার সূচনা করেছিলেন কলকাতার এক ঐতিহ্যবাহী বাঙালি প্রতিষ্ঠান 'ডোয়ার্কিন অ্যান্ড সন'। দ্বারিকানাথ ঘোষ ১৮৭৫-এ প্রতিষ্ঠা করেন 'ডি. ঘোষ অ্যান্ড সন' নামে বাদ্যযন্ত্র-নির্মাণ ও মেরামতের প্রতিষ্ঠান। ১৮৭৮-এ সাহেবি কেতায় এর নতুন নামকরণ হয় 'ডোয়ার্কিন অ্যান্ড সন'। 'ডোয়ার্কিন' হাত-হারমোনিয়ামের উদ্ভাবক। এই প্রতিষ্ঠান বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গ্রামোফোন ও রেকর্ডের ব্যবসাও জুড়ে দেয়। এরপর তাঁরা এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভারতে ডোয়ার্কিনই প্রথম সিলিন্ডার রেকর্ড ছাপার উদ্‌যোগ গ্রহণ করে। ১৯০৪ সালে এক বিজ্ঞাপনে তাঁদের প্রয়াসের কথা জানা যায়। তাঁদের তৈরি রেকর্ডের যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে শিল্পী হিসেবে লালচাঁদ বড়াল, পিয়ারা সাহেব, কুসুমকুমারী প্রমুখের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁদের রেকর্ডের লেবেল ও শিল্পীদের গানের বিবরণ সম্পর্কে কোনো ধারণা মেলে না। তবে খুব বেশিদিন রেকর্ড তৈরির কাজে ডোয়ার্কিন সক্রিয় ছিল না। বোধ হয় ১৯০৫-এর মধ্যেই তাঁদের এই প্রয়াসের মৃত্যু ঘটে, তাঁরা আবার পুরনো ব্যবসাতেই পুরোপুরি ফিরে যান।

দশ

১৯০৩-এ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতার হ্যারিসন রোডে 'মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জী' নামে গ্রামোফোন ও রেকর্ড ব্যবসায়ের এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯০৪-এ তাঁরা নিকোল রেকর্ডের ডিলারশিপ পান ওয়াটসন হডের সৌজন্যে। নিকোল ও অন্যান্য রেকর্ডের ব্যাপক চাহিদা তাঁদের রেকর্ড তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯০৬ সালের শেষদিকে 'রয়্যাল রেকর্ড' নামে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রেকর্ড বের হয়। একপিঠ-বাজা এই রেকর্ডের দাম ছিল দুই টাকা। কলকাতার ৩ ক্রিক রো-তে এই কোম্পানির রেকর্ডিং স্টুডিও ও কারখানা ছিল। 'মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জী'ই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম বাঙালি কোম্পানি, যাঁরা সিলিন্ডারের বদলে ডিস্‌ক রেকর্ড তৈরি করে পথিকৃতের সম্মান লাভ করেন। গওহরজান ও নরীসুন্দরীর মতো সেকালের নামি শিল্পী 'রয়্যাল রেকর্ডে' গান দিয়েছিলেন। 'রয়্যাল রেকর্ড' খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয় এবং কলকাতার এক প্রদর্শনীতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্রও লাভ করে। তাঁদের বায়োস্কোপ মেশিনের রমরমা ব্যবসার কারণে রেকর্ড তৈরির উদ্‌যোগে ভাটা পড়ে। ফলে, কারো কারো মতে, সম্ভবত ১৯০৮-এর পরে আর 'রয়্যাল রেকর্ড'-এর অস্তিত্ব ছিল না।

এগারো

স্বল্পস্থায়ী স্বদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'দ্য বীণাপাণি রেকর্ডিং কোম্পানি'র নাম বিশেষ কারণে উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৯০৮-এর জানুয়ারিতে এস. সি. দাস এই রেকর্ড কোম্পানির কারখানা স্থাপন করেন 'মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জী'র 'রয়্যাল রেকর্ডে'র ক্রিক রো-র কারখানার জায়গাতেই। পরিবেশকের দায়িত্ব বর্তায় কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে অবস্থিত এফ. ডি. ইউনিয়ন স্টোরের স্বত্বাধিকারী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ওপরে। ১৯০৮-এর শুরুতেই প্রকাশিত 'স্বদেশি বীণাপাণি রেকর্ড'-এর প্রতিষ্ঠাপর্বের বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয় :

SWADESHI BINAPANI RECORDS
'Swadeshi' — in the truest sense of the term
'Swadeshi' not in name only.
Unlike so-called Swadeshi Phonographic records of which the songs are recorded in India with Foreign Materials. But our 'SWADESHI RECORDS' are Manufactured by 'Swadeshi' Brethrun with 'Swadeshi' Materials.

বিজ্ঞাপনে যে বলা হয়েছিল, 'স্বদেশি বীণাপাণি রেকর্ড' 'The pride of the country' ও 'The glory of motherland' — তার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিল প্রথম প্রয়াস হিসেবে 'বন্দেমাতরম্' রেকর্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে। 'বীণাপাণি রেকর্ড'-এর লেবেলে দুই পিঠ-বাজা বেশ কিছু ডিস্‌ক রেকর্ড বেরিয়েছিল। কিন্তু কারা শিল্পী ছিলেন, কোন ধরনের গান রেকর্ড হয়েছিল তার কোনো হদিস মেলে না। মালিকানা বা কর্তৃত্ব নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দক্ষ পরিচালনার অভাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্মারক সম্ভাবনাময় 'বীণাপাণি রেকর্ডিং কোম্পানি' আত্মপ্রকাশের কিছু সময় পরেই হারিয়ে যায়।

বারো

'বীণাপাণি রেকর্ডে'র সঙ্গে যুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওই কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'কমলা রেকর্ডিং কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন। 'রয়্যাল রেকর্ড' ও 'বীণাপাণি রেকর্ড' ক্রিক রো-র যে কারখানা থেকে বেরুতো 'কমলা রেকর্ড'-এরও ওই একই ঠিকানা হলো। 'বীণাপাণি রেকর্ড'-এর কায়দাতেই কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হলো, ১৯০৯-এর সূচনাতেই স্বদেশি প্রয়াস ও উপকরণে স্বদেশি 'কমলা রেকর্ড' বের হবে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই ঘোষণার ফল আর আলোর মুখ দেখেনি। তবে কোনো কোনো অসমর্থিত সূত্রে দু'পিঠ-বাজা 'কমলা রেকর্ড' প্রকাশের অসম্পূর্ণ তথ্য জানা যায়।

তেরো

স্বদেশি-চেতনার ঢেউ কিছু এসে লেগেছিল মুসলমান সমাজেও। তবে তাতে বিত্তহীন, ব্যবসা-বুদ্ধি ও পরিকল্পনারিক্ত বাঙালি মুসলমান নয় — অবাঙালি মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করেছিল গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। মীনা পেশোয়ারী নামে এক অবাঙালি ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী বিশের দশকে, সম্ভবত ১৯২৫/২৬ সাল নাগাদ, কলকাতায় 'শাহানশাহ্ রেকর্ড কোম্পানি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মীনা পেশোয়ারী মূলত ফলের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থবিত্তের অধিকারী হন। তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। কলকাতা শহরে তাঁর দাপটের কথা মোটামুটি অনেকেরই জানা ছিল। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার একসময়ের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। রাইচাঁদ বড়ালের ভগ্নিপতি যুগলকিশোর সেন ছিলেন সংগীতরসিক মানুষ। বিশেষ অন্তরঙ্গতার কারণে মীনা পেশোয়ারী শোভাবাজারে এঁর বাড়িতেই 'শাহানশাহ্ রেকর্ড কোম্পানি'র আপিস খুলেছিলেন এবং রেকর্ডিংয়ের প্রস্তুতি-পূর্ব রিহার্সেলও হতো এখানেই। সুরকার কমল দাশগুপ্তের অনুজ সুবল দাশগুপ্ত তাঁর কৈশোরেই 'শাহানশাহী' লেবেলে প্রকাশিত রাইচাঁদ বড়ালের পিয়ানো-বাদ্যের রেকর্ডে তবলা বাজিয়েছিলেন। এই 'শাহানশাহী' বা 'শাহেনশাহী' লেবেলে কে. মল্লিকের কণ্ঠে নজরুলের দুটি বিখ্যাত গানের ('আমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয়নে নয়ন রাখি' ও 'তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ') রেকর্ড বের হয়েছিল ১৯৩৩ (বাংলা ১৩০৪) সালে, কোম্পানির সংকেত-চিহ্নহীন রেকর্ডের নম্বর ছিল ১৪০৩। এর বাইরে শিল্পীদের মধ্যে কারা এই কোম্পানির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা আর কাদের রেকর্ড বেরিয়েছিল সেই তথ্য জানা যায় না। 'শাহানশাহ্ রেকর্ড কোম্পানি' কতোদিন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল সে-কথাও কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। তবে দেশভাগের কিছু পরেও 'ওয়েলেসলি স্ট্রীটে ক্রাউন সিনেমার পাশে একটা রেকর্ডের দোকানের কাঠের দরজার গায়ে ... শাহানশা রেকর্ড কোম্পানীর একটা সাইনবোর্ড'-এর অস্তিত্ব ছিল — 'পুরনো মরচে ধরা, একটা টিনের সাইনবোর্ড, রঙচটা — পেরেক ঠুকে তখনো লাগানো ছিল'। উদ্‌যোগটা অবাঙালির হলেও এর সঙ্গে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানেরই মূলত সম্পৃক্ততা ছিল। সামান্য যেটুকু তথ্য মেলে তা থেকে এ-ও বেশ বোঝা যায়, সেকালের নামি শিল্পী ও কলাকুশলীরাই 'শাহানশাহ্ রেকর্ড কোম্পানি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

চোদ্দ

১৯০৯ থেকে ১৯৩১ — এই দীর্ঘ বাইশ বছরে আর কোনো বাঙালি কোম্পানি সম্ভবত রেকর্ড-প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। তবে তিরিশের দশক থেকে আবার নতুন উদ্যম ও আগ্রহ দেখা দিলো এ-বিষয়ে। ফলে দশক-শুরুর প্রায় প্রথম দিকেই আরো সামর্থ্য ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশি রেকর্ড কোম্পানির আবির্ভাব ঘটলো। এই উদ্‌যোগের পেছনে ছিলেন মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্-ব্যবসায়ের তিন ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, চণ্ডীচরণ সাহা ও বিভূতিভূষণ সেন — যাঁদের নিষ্ঠা ও শ্রমে গড়ে উঠেছিল তিন যুগপ্রবর্তক দেশি রেকর্ড কোম্পানি 'মেগাফোন', 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' ও 'সেনোলা'। এরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানির বেশ শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠাও পেলো — বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলো এদের নাম। এই স্বদেশি কোম্পানিগুলোর সাফল্যের প্রেরণায় পরে আরো কিছু কোম্পানি গড়ে উঠলো — এদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় 'পাইওনিয়ার', 'ভারত', 'রিগ্যাল', 'কলম্বিয়া' 'কোহিনুর', 'মেল-ও-ডি' ও 'ভারতী'র। 'গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডে'র সঙ্গে এইসব কোম্পানির একধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বদেশি কোম্পানির স্টুডিওতে গান রেকর্ডিং এবং তা ছাপা হতো গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারখানা থেকে নিজ নিজ কোম্পানির লেবেলে। 'গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড' প্রতিভাবান-প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী সন্ধান করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে তুলে তাঁদের দিয়ে গান রেকর্ড করাতো। গ্রামোফোন কোম্পানির বাঁধা শিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও প্রশিক্ষকও থাকতেন। তিরিশের দশকের স্বদেশি কোম্পানিগুলোও এই একই পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেছিল। আবার নতুন করে গ্রামোফোন রেকর্ডের সুবাদে সূচনা হলো বাংলা গানের স্বর্ণযুগের আরেক অধ্যায়ের।

পনেরো

বরিশালের এক অজপাড়াগাঁ থেকে সেই কিশোর বয়সেই ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলেন জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ (জে. এন. ঘোষ)। বিদ্যের জোর তেমন না থাকলেও ছিল বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তাই অনেক শ্রম আর নিষ্ঠায় নিজের ভাগ্যকে গড়ে তুলেছিলেন — অর্থ-বিত্ত-যশ-সম্মানে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। স্বাধীন জীবিকার আগ্রহে জিতেন ঘোষ সাইকেল মেরামতের কাজ শিখে ১৯১০ সালের ২১ নভেম্বর হ্যারিসন রোডে 'জে. এন. ঘোষ কোং' নামে একটি ছোটো দোকান দেন। কিছুকাল পরে সাইকেল সারাইয়ের পাশাপাশি সাইকেল বিক্রির ব্যবস্থাও করেন। ধীরে ধীরে গ্রামোফোন-যন্ত্র, রেকর্ড ও হারমোনিয়ামও দোকানে রাখতে শুরু করেন। 'গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডে'র প্রধান জর্জ কুপারের আনুকূল্য ও প্রেরণা তাঁকে প্রতিষ্ঠার পথে অনেকখানি এগিয়ে দেয়। তিনি 'মেগাফোন' নাম দিয়ে গ্রামোফোন-যন্ত্র ও হারমোনিয়াম তৈরি করে ব্যবসায়ে অভাবনীয় উন্নতি ও সাফল্য অর্জন করেন। দূরদৃষ্টি ও ব্যবসা-বুদ্ধির ফলে তিনি গ্রামোফোন-রেকর্ড তৈরির পরিকল্পনা করেন। এইভাবেই ১৯৩২-এ ৭১/১ হ্যারিসন রোডের ঠিকানায় জন্ম হয় মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির।

মেগাফোন কোম্পানির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে এক মনোগ্রাহী বিবরণ মেলে সংগীত-থিয়েটার-চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হীরেন বসুর স্মৃতিচর্চায়। 'পঞ্চবর্ষী' ছদ্মনামে লেখা তাঁর 'জাতিস্মরের শিল্পলোক' বইয়ে বলেছেন :

'গ্রামোফোন কোম্পানিতে গীতিকার ও শিক্ষক হিসাবে কাজীদাই সর্বপ্রথম আইন-আদালত করে 'রয়্যালটি' আদায় করে নিলেন। ফলে কাজীদাকে সাময়িকভাবে এইচ.এম.ভি. ত্যাগ করতে হলো। কাজীদার কর্মপদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরাও বেচা গান আর কাজ পুনরুদ্ধার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতে না পেরে এইচ.এম.ভি. ত্যাগ করার কঠিন পণ মনে মনে বরণ করে নিলাম।

'কাজীদা হঠাৎ একদিন আমাকে আর ধীরেন দাসকে নিয়ে চললেন হ্যারিসন রোডে শ্রীযুত জিতেন ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের কাছে। জিতেনবাবু গ্রামোফোন গিল্ডের মেম্বর। সারা ভারতবর্ষে 'টুইন মার্কা' রেকর্ড সেল্‌সের একচ্ছত্র ব্যবসায়ী। তাঁকে তাই সে সময় রেকর্ড ব্যবসায়ীদের মধ্যে 'কিং'ই বলা হতো। জিতেনবাবু সদাশয় লোক। ইনি 'মেগাফোন কোম্পানী' নামে একটি রেকর্ডিং কোম্পানী খোলার ব্যবস্থা করেছেন। কাজীদা তাই তাঁরই কাছে আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন।

'এক সপ্তাহের মধ্যে আধুনিক মেগাফোন কোম্পানির পিছনের বাড়ির দোতলার ঘরে এক সন্ধ্যায়, মেঝেতে শতরঞ্জি চাদর পাতা শুরু হলো। শতরঞ্জির চারি কোণ ধরলাম, আমি, কাজীদা, ধীরেন দাস আর স্বয়ং জিতেনবাবু। এই হলো মেগাফোনের উদ্বোধন। যার যত নতুন জানা গায়ক-গায়িকা ছিল নিয়ে এসে জড় করা হতে লাগলো। আমি নিয়ে এনে তুললাম আমার চেনা ম্যাডান কোম্পানির হিরোইন শ্রীমতী কাননকে। ধীরেন দাসও কাকে যেন নিয়ে এলেন। কাজীদার জন্যেও বহু নামী আর্টিস্ট যোগ দিলেন মেগাফোনে।

'মেগাফোন কোম্পানির বিশেষত্ব গড়ে উঠতে লাগলো জিতেনবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে। তাঁর দূরদৃষ্টিটুকু সত্যিই প্রশংসনীয়। সংগীত আসর ছাড়াও তিনি রেকর্ড-নাটকের বিশিষ্টতায় মনোযোগী হলেন। পূর্বে প্রহসন, গীতিনাট্য বা ধর্মমূলক নাটিকাই রেকর্ড করা হতো [,] কিন্তু জিতেনবাবু শুরু করলেন সামাজিক নাটক। শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীর সম্মিলন ঘটালেন। এছাড়া ডাকলেন ওস্তাদমহলকে — আখতারি বাঈ, ফয়েজ [ফৈয়াজ] খাঁ সাহেব, ভীষ্মদেববাবু থেকে শুরু করে গাঁয়ের স্বভাবশিল্পী, বৈরাগী বৈরাগিনীদের পর্যন্ত।'

'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড'-এর প্রথম তালিকা-পুস্তিকা বের হয় সেপ্টেম্বর ১৯৩২-এ। 'আমাদের আবেদন' শীর্ষক ভূমিকা থেকে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির সূচনাপর্বের অনেক কথাই জানা যায়। সেইসঙ্গে স্বদেশি-চেতনার স্পষ্ট পরিচয়ও মেলে এই বক্তব্যে। বলা হয় :

'কামধেনু ভারতের দুগ্ধে আজ বিশ্ব পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখিবার সাধনা যাঁহাদের — তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা এই দুঃসাহসিক ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য অর্থ, পরিশ্রম, সাধনা কোন কিছুর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিক দিয়া এতটুকু ত্রুটী রাখি নাই বা কার্পণ্য করি নাই। ...

'আমাদের প্রস্তুত 'মেগাফোন রেকর্ড' পরিপূর্ণরূপে স্বদেশজাত। ইহার অর্থ বাঙ্গালীর, মূলধন বাঙ্গালীর, পরিশ্রম বাঙ্গালীর, পরিচালনা বাঙ্গালীর। এক কথায় এই রেকর্ড বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব শিল্পজাত।

'বাঙ্গালার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও আজ প্রশ্ন করিতেছি — বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না বাঁচাইলে কে বাঁচাইবে?

'আমাদের এই শিশু-প্রতিষ্ঠান তাই বাঙ্গালীর মুখ চাহিয়াই অসম সাহসের পথে অবতরণ করিয়াছে।'

মেগাফোন কোম্পানির এই যাত্রা ও সংকল্প ব্যর্থ হয়নি। সংগীত-জহুরি জিতেন ঘোষের যোগ্য পরিচালনা আর দেশখ্যাত শিল্পী-কুশলীদের সমাবেশে মেগাফোন কোম্পানি হয়ে উঠেছিল বাঙালির সংস্কৃতিসাধনা ও মিলনমেলার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

হীরেন বসু জানিয়েছেন নজরুলের সুবাদে অনেকেই এইচ.এম.ভি. ছেড়ে মেগাফোনে যোগ দেন। কানন দেবীও যুক্ত হন মেগাফোনের সঙ্গে। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, আখতারি বাঈ (পরে বেগম আখতার নামে পরিচিত), ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ও সমৃদ্ধ করলেন মেগাফোনকে। কোম্পানির প্রথম তালিকা-পুস্তিকায় আরো নাম পাওয়া যায় 'কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে যাহাদের যশঃখ্যাতি ভারতবিদিত' — সেই 'সরোদিয়া আমীর খাঁ, সপ্ততন্ত্রী বাদক এনায়েৎ খাঁ, সারেঙ্গী-বাদক ছোটে খাঁ, কণ্ঠ-সঙ্গীত-বিশারদ জমিরুদ্দিন খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, জদ্দন বাঈ প্রভৃতি সঙ্গীত-জগতের শ্রেষ্ঠ গুণীর সমাবেশ আর কোনো 'রেকর্ড' প্রস্তুতকারী কোম্পানী করিতে পারে নাই'। এই তালিকা দিনের পর দিন স্ফীতই হয়েছে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, বংশীবাদক গোপালচন্দ্র লাহিড়ী, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, কমলা ঝরিয়া, সামাদ কাওয়ালের মতো গাইয়ে-বাজিয়ের সমাবেশে। নজরুলের লেখা 'লক্ষ্মীর বন্দনা' ('লক্ষ্মী মা তুই ওঠ্ গো আবার সাগর-জলে সিনান করি') দিয়েই 'মেগাফোন রেকর্ডে'র যাত্রা শুরু — শিল্পী ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দাস। গান-বাঁধিয়ে অজয় ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রকুমার রায়, গিরীন চক্রবর্তী, সজনীকান্ত দাস, সুবোধ পুরকায়স্থ, জসীমউদ্‌দীন, বন্দে আলী মিয়া এবং আরো কেউ কেউ জড়িয়ে পড়েছিলেন মেগাফোনের মায়ায়। সুর-যোজনায় নজরুল তো ছিলেনই, তাঁর সঙ্গে আরো যোগ দিয়েছিলেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, হীরেন বসুর মতো অনন্য সুরস্রষ্টা। কমল দাশগুপ্তের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এইচ.এম.ভি. তবে তিনি 'মেগাফোনে'ও কাজ করেছেন। নজরুলের গান বা প্রণব রায়-অজয় ভট্টাচার্যদের কাব্যগীতি তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুরসৃষ্টির মাধ্যমে এমনই আবেদন সৃষ্টি করতো যে সেসব গান উত্তরকালকেও মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে। তুলসী লাহিড়ী তো একই সঙ্গে গীতিকার-সুরকার-প্রশিক্ষক-নাট্যনির্দেশক-অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রেকর্ড-নাট্যের শিল্পী হিসেবে নাম করতে হয় শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাসসহ আরো অনেকের। কতো অখ্যাত-অজ্ঞাত শিল্পী মেগাফোনের সৌজন্যে নাম করেছেন, সে হিসেব নিলেও বিস্মিত হতে হয়। পল্লিগানের দরদভরা কণ্ঠ ছিল যাঁর — সেই বরিশালের শিল্পী অনন্তবালা বৈষ্ণবী, আসামের অকালপ্রয়াত প্রতিশ্রুতিবান শিল্পী মোমের আলী এবং আরো অনেকে সুরের ভুবনে নাম কিনেছিলেন মেগাফোনের কল্যাণেই। বাংলা ছাড়াও অসমিয়া, উড়িয়া, উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি — নানা ভাষার গানের রেকর্ড বেরিয়েছে 'মেগাফোন' থেকে। জিতেন ঘোষ আক্ষরিক অর্থেই 'মেগাফোন কোম্পানি'কে একটি পরিবারে পরিণত করেছিলেন। কানন দেবী তো পাঁচ মুখে তাঁর কর্মনৈপুণ্য, মমত্ববোধ, গুণগ্রাহিতা ও ব্যবসা-বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন।

আব্বাসউদ্দীন 'মেগাফোনে' এসেছিলেন অতিথি-শিল্পী হিসেবে। তাঁর স্মৃতিচর্চা থেকে জানা যায়, মেগাফোনের কর্ণধার জিতেন ঘোষের সঙ্গে এইচ.এম.ভি.-র কর্তাব্যক্তিদের খাতির থাকার কারণে ওই প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিয়ে মেগাফোনে আব্বাসউদ্দীন ইসলামি, কাব্যগীতি ও ভাওয়াইয়ার ছ'খানা গান রেকর্ড করেন। এর মধ্যে নজরুলের কথা ও সুরে গাওয়া 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'নদীর নাম সই অঞ্জনা' ও 'পদ্মদীঘির ধারে ধারে'-র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এইসব গানের রেকর্ড বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই তা সুপারহিট। চুক্তির নিগড়ে বাঁধা থাকার কারণে এরপরে আর আব্বাসউদ্দীন মেগাফোনে রেকর্ড করতে পারেননি। এই ধরনের চুক্তির শর্তের কারণে সেকালের অনেক শিল্পীই স্বাধীনভাবে তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটাতে পারেননি।

কমলা ঝরিয়া ছিলেন মেগাফোনের অমূল্য সম্পদ — যেমন ছিলেন বেগম আখতার। কমলার শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে কে. মল্লিকের অবদানের কথা সংগীতসমাজ মনে রাখেনি — কমলা নিজেও না। কমলা দুই জায়গায় বাঁধা ছিলেন — ব্যক্তিগত জীবনে তুলসী লাহিড়ীর কাছে আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'মেগাফোনে'র কাছে। কমলা দু'জায়গাতেই নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। কী গাননি তিনি — কীর্তন, রামপ্রসাদী, বিজয়া, আগমনী, আধুনিক, পল্লিগীতি থেকে শুরু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে ভজন, টপ্পা, ঠুমরি, খেয়াল — ফিল্মের গানও করেছেন — আবার চলচ্চিত্রে-মঞ্চে অভিনয়েও নেমেছেন। বাংলা ছাড়াও উর্দু-হিন্দি-পাঞ্জাবি ভাষাতেও গানের রেকর্ড করেছেন। তুলসী লাহিড়ী তাঁর শিক্ষক যেমন, তেমনি 'বাবু'ও ছিলেন, তাই গানের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতকেই মান্য করতে হয়েছে। নজরুলও ছিলেন তাঁর গানের অন্যতম গুরু — তাঁর গানও গুটিকয় রেকর্ড করেছেন। তারপরও মোটের ওপর তুলসী লাহিড়ীর কথা ও সুরের গানই তাঁকে বেশির ভাগ গাইতে হয়েছে। কমলা ঝরিয়া মারা গেলে কোনো শোকসভা হয়নি, কেউ শোক-প্রকাশ করে বাণীও দেননি। শ্মশানে সংগীতজগতের কেউ না, কেবল 'মেগাফোনে'র একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন মাত্র। রেকর্ড-যুগের অবসান হলেও 'মেগাফোন' আজও কমলা ঝরিয়ার গান বাঁচিয়ে রেখেছে ক্যাসেট ও সিডির মাধ্যমে।

কমলা ঝরিয়া আর তুলসী লাহিড়ীর কথা যখন উঠলোই তখন সত্যের খাতিরে এই জগৎটার অন্দরমহলের অন্ধকার কুঠরিগুলোর ভেতরে একটু আলো ফেলা যাক। সিনেমা-থিয়েটার ও গ্রামোফোনের গানের ভুবনে একটা ব্যাপার আকসারই ঘটতো — সেই সময়ের পটভূমিতে এ-সব স্বাভাবিক-সাধারণ ঘটনা বলেই সবাই ধরে নিতো — ওই যে 'বাবু-বিবি' সম্পর্কের কথা। কখনো কখনো অভিনয় বা সাংগীতিক সম্পর্কের পাশাপাশি দেহ-মনের সম্পর্কও গড়ে উঠতো। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে অভিনেত্রী-গায়িকা তারকবালা ওরফে মিস্ লাইটকে নিয়ে থাকতেন। মিস্ লাইটকে তিনি একটি পুত্রসন্তানও উপহার দিয়েছিলেন। এ-নিয়ে পরিবারে বেশ অশান্তিও হয়েছিল। কীর্তনশিল্পী রাধারানী তো লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই ছাদের তলায় থাকতেন। সন্ন্যাসী-শিল্পী দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে গায়িকা সাহানা দেবীর গভীর সম্পর্কের কথা তাঁদের নিকটজনদের অজানা ছিল না। নজরুলের সঙ্গে সুরের জগতের কার না অন্তরঙ্গতা ছিল — সেই প্রথম জীবনে প্রতিভা সোম থেকে শুরু করে আঙুরবালা-ইন্দুবালা হয়ে কানন দেবী পর্যন্ত। হীরেন বসু তো তাঁর স্মৃতিচর্চায় জানিয়েছেন, গ্রামোফোনের এক নটী-শিল্পীর খপ্পরে পড়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে স্বামীর কর্তব্য পালন করতে হয়।

যাই হোক, মেগাফোনের আলোচনায় সব মিলিয়ে বলতে হয়, সৃষ্টি বা আড্ডায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন নজরুল। এইচ.এম.ভি. ছেড়ে নজরুল যখন মেগাফোনে এলেন, তখন তিনি বাংলার সংগীতজগতে কীর্তিমান পুরুষ, বিশেষ করে কলের গানের ভুবনে তাঁর নাম কিংবদন্তির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মতো ছড়িয়ে পড়েছে — তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক 'মিথ'। নজরুল এবং তাঁর সহযাত্রীদের মেগাফোনে যোগ দেওয়ার ফলে অল্পদিনেই মেগাফোন কোম্পানি যে সাফল্য পেয়েছিল, তাতে খোদ সাহেব-কোম্পানি এইচ.এম.ভি.-র কর্তা-ব্যক্তিদেরও কপালে ভাঁজ পড়েছিল। বিদেশি রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে স্বদেশি কোম্পানির প্রতিযোগিতা অসম হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হরিণ-মার্কা মেগাফোন কুকুর-মার্কা এইচ.এম.ভি.-কে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল। এই প্রতিযোগিতায় নজরুল ছিলেন মেগাফোনের প্রধান হাতিয়ার। মেগাফোনের শুরুতে নজরুল যোগ্য মর্যাদা, সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। মেগাফোনের নানা কাজে জিতেন ঘোষ সবসময়ই নজরুলের আন্তরিক সহায়তা ও পরামর্শ পেয়েছেন। দোতলায় মেগাফোনের বড়ো পরিসরের আপিস, বিশ্রামকক্ষ ও রিহার্সেল রুম ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সোজা এগিয়ে ডানদিকে গেলে বামপাশে যে-ঘরটি সেখানেই বসতেন নজরুল আর তার মুখোমুখি যে-বড়ো হলরুম সেটিই ছিল গান-শেখানোর ঘর। নজরুল তাঁর ঘরে বসে গান লিখতেন — সুর করতেন আর সেইসঙ্গে শিল্পীদের কণ্ঠে তুলে দিতেন সেই গান। জিতেন ঘোষ আরো কোনো কোনো কাজে যে নজরুলের সহায়তা নিতেন তারও কিছু প্রমাণ মেলে। যে চামড়া-বাঁধানো মোটা জাবদা খাতায় রেকর্ডকৃত গানের বিবরণ লেখা থাকতো তাতে দেখেছি আপিসের করণিকের অচেনা হাতের লেখার পাশাপাশি নজরুলের চেনা হস্তাক্ষর। গুরুত্ব যে নজরুল কতোখানি পেতেন তা বেশ বোঝা যায় মেগাফোন রেকর্ডের প্রথম প্রকাশিত ক্যাটালগের প্রচ্ছদে তাঁর ছবি ছাপার ভেতর দিয়ে। এই ক্যাটালগের ভূমিকার ভাষা দেখে অনুমান করা যায় তা হয়তো নজরুলেরই লেখা। মেগাফোনের প্রথম রেকর্ডের জন্যে গান লিখেছিলেন নজরুল। ১২ আগস্ট ১৯৩২-এ নজরুলের কণ্ঠের প্রথম গানের রেকর্ডও প্রকাশ করে মেগাফোন — এর একপিঠে ছিল 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়', অপর পিঠে 'পাষাণের ভাঙ্গালে ঘুম'। এরপরেও নজরুল-কণ্ঠের আরো দুটি গানের ('কেন আসিলে ভালবাসিলে' ও 'দাঁড়ালে দুয়ারে কে তুমি') রেকর্ড মেগাফোন থেকে বের হয় এপ্রিল ১৯৩৩-এ। মেগাফোনকে নজরুল দু'হাত ভরে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই মেগাফোনও নজরুলকে ধরে রাখতে পারেনি — আবার তাঁকে ফিরে যেতে হয় সেই পুরনো নীড়ে।

জিতেন ঘোষের মৃত্যুর পর মেগাফোন কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় তাঁর ভাইপো কমলকুমার ঘোষের ওপর। কমল ঘোষও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট রুচিবান ও সংগীত-সমঝদার মানুষ। একসময় সিনেমার দিকে ঝুঁকেছিলেন — 'হসপিটাল' ও 'কিনু গোয়ালার গলি' তাঁরই প্রযোজিত ছবি। এরপর 'মেগাফোন' নিয়েই আছেন — রূপান্তরিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে এখনো টিকিয়ে রেখেছেন পরম যত্ন ও শ্রমে। তাঁর কাছে বহুদিন ঘুরেছি মেগাফোনের কাহিনি শোনার জন্যে — পুরনো দিনের ক্যাটালগ বা কাগজপত্রের জন্যে। একসময় অবশ্য হাসিমুখেই হাতে তুলে দিয়েছেন উইয়ে খাওয়া একরাশ বাতিল কাগজপত্র। একবার অনেক পীড়াপীড়ির পর আপিসঘরের স্টিলের আলমারি খুলে গোলাপি রঙের মোটা ফাইল বের করে নজরুলের নিজের হাতে-লেখা দুটি গানের খাতা, চুক্তিপত্র ও আরো কিছু কাগজপত্র দেখিয়েছিলেন। তারপর নানা অজুহাতে ওই আলমারি আর খোলেননি। যে প্রতিষ্ঠানের জন্যে নজরুল তাঁর মেধা ও শ্রম ঢেলে দিয়েছিলেন একদিন, এখন সেখানে নজরুলের স্মৃতি বলতে আর কিছুই নেই। নজরুল যে ঘরটিতে বসতেন তাতে তাঁর কোনো ছবিও নেই। এমনকি রিহার্সেল-রুমে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কানন দেবী ও কমলা ঝরিয়া — এই তিনজনের বড়োসড়ো ছবি শোভা পেলেও নজরুল ও অন্যেরা সেখানে অনুপস্থিত। 'আমায় নহে গো, ভালবাস মোর গান' — নজরুলের এই গানটির সুর এসব দেখে আপনা-আপনি মনের মধ্যে বেদনায় গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

ষোলো

চণ্ডীচরণ সাহা বিলেতে গিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের সৌজন্যে রেকর্ডিং-বিদ্যা শিখে কলকাতায় ফিরে ১৯৩১-এ (১৪ জুলাই ১৯৩২-এ রেজিস্ট্রিকৃত) ৬/১ অক্রুর দত্ত লেনে 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ অ্যান্ড ভ্যারাইটিস্ সিন্ডিকেট লিমিটেড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' নামে গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশের সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য লাভের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ৭ চৈত্র ১৩৩৮ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী বাসন্তী দেবীকে এক চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন : 'একজন ভদ্রলোক গ্রামোফোনের সুর ধরবার বিদ্যা য়ুরোপে শিখে এসেছেন। তিনি এখানে এসেছেন আমার কণ্ঠ থেকে কিছু আদায় করবার প্রস্তাব নিয়ে।' শেষ পর্যন্ত চণ্ডীচরণ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কবিতা ও গান ধারণে তাঁর সম্মতি পান। ৫ এপ্রিল ১৯৩২ হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসের নিজস্ব স্টুডিওতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা ও গান রেকর্ড করেন, তা দিয়েই 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র যাত্রা শুরু।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিকণ্ঠের 'H.1' চিহ্নিত রেকর্ডটির এক পিঠে কবিতা 'আমি যখন বাবার মত হব' এবং অপর পিঠে 'তবু মনে রেখো' এই গানটি ছিল। জানা যায়, এর পরেও — ১৯৩৬ ও ১৯৩৯-এ হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করা হয়। প্রথম যেবার রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থান রেকর্ডের স্টুডিওতে যান, এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য লিখে দেন এই বলে : 'হিন্দুস্থান ম্যুজিকাল প্রডাক্টস ভেরাইটি সিন্ডিকেট জয়যুক্ত হৌক, — এরূপ প্রতিষ্ঠান এদেশে এই প্রথম, ইহার সফলতায় আমাদের সকলেরই গৌরব।' সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথ যে আশাবাদ প্রকাশ করেন, চণ্ডীচরণের যোগ্য পরিচালনায় উত্তরকালে এই প্রতিষ্ঠান তার 'সফলতায়' যথার্থই 'আমাদের সকলেরই গৌরব'-এর দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়।

চণ্ডীচরণ সাহা, যিনি সি.সি. সাহা নামেও পরিচিত, শিক্ষিত ও উদ্যমী পুরুষ ছিলেন। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়। বিশেষ করে সংগীত-সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে অন্যতম আদি স্বদেশি প্রতিষ্ঠানের দাবি এই সাহা-পরিবার করতে পারেন। চণ্ডীচরণের পিতা মতিলাল সাহা ১৮৯৫-এ এম.এল. সাহা (M. L. Shaw) নামে হারমোনিয়াম তৈরির ব্যবসায়ে নামেন কলকাতার ধর্মতলায়। এরপর ১৯০৫-এর দিকে এম.এল. সাহা নিকোল কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে 'নিকোল রেকর্ড' এবং 'নিকোলফোন'-যন্ত্র বিক্রির একমাত্র পরিবেশক নিযুক্ত হন। গ্রামোফোন-সামগ্রীর ব্যবসায়েও এম.এল. সাহার ব্যাপক সাফল্য ছিল উল্লেখ করার মতো। পিতার আদর্শ ও প্রেরণায় ১৯২২ সাল নাগাদ চণ্ডীচরণ এই ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর মনে গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুনে পিতার সমর্থনে রেকর্ডিং-বিদ্যা শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাই চণ্ডীচরণের আকাঙ্ক্ষা, উদ্‌যোগ ও সাফল্যের পেছনে পারিবারিক প্রেরণার দান যে অনেকখানি তা স্বীকার করতেই হয়। চণ্ডীচরণের পুত্র সোহনলাল সাহাও উত্তরকালে 'ইন্‌রেকো' নামের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শতবর্ষের পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির রূপকার চণ্ডীচরণ সাহা বিদেশ থেকে রেকর্ডিং সম্পর্কে যে প্রশিক্ষণ লাভ করেন, তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' প্রকাশের কার্যক্রমে। এই প্রশিক্ষণের জ্ঞান ও তাঁর নিজের উদ্ভাবনী চিন্তার সমন্বয়ে যে নিরীক্ষাধর্মী প্রয়াস তিনি গ্রহণ করেন তা বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। পঙ্কজকুমার মল্লিক স্মরণ করতে পারেন :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বাংলা সঙ্গীত রেকর্ডিং-এর জগতে এই উদ্যোগী ও নিরলস মানুষটি [চণ্ডীচরণ সাহা] স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি অক্রুর দত্ত লেনে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শব্দযন্ত্রের আধুনিক কলাকৌশল — যা তিনি জার্মানী থেকে শিক্ষা করে এসেছিলেন — তাকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করে এদেশে সঙ্গীত রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে গ্রামোফোন কোম্পানীর সমকক্ষতা অর্জন করা।

'একদিন সহসা তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে রাইচাঁদ, বাণীকুমার ও আমাকে তাঁর অফিসে যেতে অনুরোধ করলেন। মাইক্রোফোন সহযোগে আধুনিক ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে তিনি রেকর্ডিং ট্রায়াল দেবেন, আমাদের সহযোগিতা তাঁর কাম্য।

'আমরা সম্মত হলাম। রেডিও থেকে বেরিয়ে প্রত্যহ রাত নটা সাড়ে নটা নাগাদ চণ্ডীবাবুর স্টুডিওতে যেতাম। একতলার অঙ্গনে বসে আমি মাইক-এ গান করতাম অর্গান বাজিয়ে, রাই তবলায় ঠেকা দিত — আর, দোতলায় বসে চণ্ডীবাবু ম্যাট্রিক্স্-এ রেকর্ড করতেন। টেপ্ রেকর্ডিং প্রথা তখনো অজ্ঞাত। মোমের ম্যাট্রিক্স্-এর ছাঁচ থেকেই হার্ড ডিস্ক প্রস্তুত করে নেওয়া হতো সে-যুগে।

'চণ্ডীবাবুর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নবলব্ধ শিক্ষাকে নিপুণ ও ত্রুটিহীনভাবে কাজে লাগানো। প্রভূত সতর্কতা সহকারে তিনি নানা ঢঙের, নানা যন্ত্রের ও নানা কণ্ঠের রেকর্ডিং করার উদ্যোগ করেছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও বিভিন্ন লঘু সঙ্গীতের সার্থক রেকর্ডিং করার প্রতিজ্ঞা তিনি নিয়েছিলেন। ... আমি রাইচাঁদের তবলাসংগতসহ নানা কবি রচিত নানান্ ধরনের গান গাইতাম। প্রত্যেক গান চার-পাঁচবার করে গাইতাম। প্রত্যেক রেকর্ডিং-এর শেষে চণ্ডীবাবু গানটি প্লে ব্যাক করতেন ত্রুটি সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে।'

এইভাবে দিনের পর দিন চেষ্টার ফলে 'রেকর্ডিং-বিষয়ে ... তাঁর অভিজ্ঞতা সার্থক হয়ে উঠল'। 'মেগাফোন' বা 'সেনোলা'র নিজস্ব রেকর্ডিং স্টুডিও ছিল, কিন্তু 'হিন্দুস্থানে'র পাশাপাশি এঁদের রেকর্ড বাজিয়ে তুলনা করলে সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য কানে ধরা পড়বেই — এই পার্থক্য অবশ্যই রেকর্ডিংয়ের বৈশিষ্ট্যের এবং এর কৃতিত্ব যে চণ্ডীচরণের তা বলাই বাহুল্য।

চণ্ডীচরণের রুচির মেজাজ ছিল উঁচু তারে বাঁধা। এদিক দিয়ে তাঁর তুলনা হতে পারে হেমেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের পরপরই চণ্ডীচরণ বের করলেন অতুলপ্রসাদের নিজের কণ্ঠে গাওয়া গানের রেকর্ড

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

('মিছে তুই ভাবিস মন' ও 'জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী')। এরপর একে একে আসেন কুন্দনলাল সায়গল, শচীন দেববর্মন (শচীনকর্তা), পঙ্কজকুমার মল্লিক, সুধীরলাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পন্ডিচেরিবাসী দিলীপকুমার রায়, রেণুকা দাশগুপ্তা, সাবিত্রী দেবী, সুপ্রভা ঘোষ (সরকার), অনুপম ঘটক, আঙুরবালা এবং আরো অনেকে। 'হিন্দুস্থানে' সংগীত পরিচালক ও প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন তিমিরবরণ, অনুপম ঘটক ও সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। শচীনকর্তা ও সায়গলের প্রথম রেকর্ড বের হয় 'হিন্দুস্থান' থেকেই — এঁদের দু'জনেরই রেকর্ড বাজার মাত করলো। এক লাহোরেই সায়গলের পঞ্চাশ হাজার রেকর্ড বিক্রি হয়েছিল। সুরের সাধক সায়গলকে খেয়েছিল সুরায় — মাত্র ৪৩ বছর বয়সে এই অসামান্য শিল্পী চলে যান। কলকাতাই ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রধান কেন্দ্র — একদিকে বি.এন. সরকারের 'নিউ থিয়েটার্স', অপরদিকে সি.সি. সাহার 'হিন্দুস্থান রেকর্ড'-এর পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায় — তিনি হয়ে ওঠেন সিনেমা ও সংগীতজগতের কিংবদন্তির নায়ক। 'যখন রব না আমি দিন হলে অবসান', 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে', 'এই পেয়েছি অনল জ্বালা', 'বাঁধিনু মিছে ঘর', 'বালম আও বসো মেরে মন মে', 'প্রেম কহাঁ ইস্ জগমে', 'দুখ কে অব দিন বিতা নহিঁ' — 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে' প্রকাশিত সায়গলের এইসব ফিল্মের গান আজও মানুষকে উদাস ও স্মৃতিভারাতুর করে তোলে। ১৯৪৩-এ তিনি কলকাতা ছাড়েন আর তার দু'বছর আগে ১৯৪১-এ 'হিন্দুস্থানে' শেষ রেকর্ডিং করেন রাইচাঁদ বড়ালের পরিচালনায় *পরিচয়* ও *লগন* ছায়াছবির বেশ কয়েকটি গানের।

জনপ্রিয়তার নিরিখে দরদভরা কণ্ঠের শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তীর কথা না বললে তো কাহিনি অসম্পূর্ণই থেকে যায়। যে-কোনো সংবেদনশীল শ্রোতার মনে পড়বে তাঁর 'মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে,/ মা'কে মনে পড়ে' গানটির কথা। 'হিন্দুস্থানে'র জন্যে তিনি 'রজনী গো যেও না চলে', 'খেলাঘর মোর ভেসে গেছে হায়, নয়নেরি যমুনায়' — এমন বেশ কয়েকটি গান গেয়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিলেন। 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'র সঙ্গে এককালে যিনি সম্পৃক্ত ছিলেন, সেই শিল্পী বিমান মুখোপাধ্যায় যখন সাক্ষ্য দেন দ্বিতীয় গানটির রেকর্ড 'কয়েক লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছিল', তখন এই সত্যভাষ্যকেও অবিশ্বাস্য মনে হয়। একদিন যিনি মিনতি করেছিলেন রজনীকে না যেতে, তিনিই মাত্র তেত্রিশ না পেরুতেই চলে গেলেন সুরার সখ্য সইতে না পেরে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্গসংগীতের দিকপালেরাও তশরিফ এনেছিলেন অক্রুর দত্ত লেনের অপরিসর গলি পেরিয়ে 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র গানের বাড়িতে। মনে পড়বে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, শ্রীকৃষ্ণ রতনঝঙ্কার, পণ্ডিত দিলীপচাঁদ বেদী — এঁদের কথা। ফৈয়াজ খাঁ বা বড়ে গোলাম আলী তিন মিনিট সময়ের মধ্যে কী করে গান শেষ করতেন সে ছিল এক বিস্ময়। 'হিন্দুস্থানে'ই এঁদের গান প্রথম রেকর্ড হয়। বড়ে গোলাম আলীর গাওয়া 'বাজুবন্দ্ খুলু খুলু যায়' ঠুমরিটি পরে বেগম আখতারসহ আরো কেউ কেউ 'মেগাফোন' বা অন্য কোম্পানি থেকে রেকর্ড করেছিলেন, কিন্তু কেউই খাঁ সাহেবকে অতিক্রম করতে পারেননি। যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে সেতারবাদক ওয়ালিউল্লা খান, সানাইবাদক প্রফেসর নাজির হোসেন, সরোদবাদক তিমিরবরণ ও রাধিকামোহন মৈত্রের রেকর্ড বেরিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান থেকেই। ওস্তাদ বিসমিল্লাহ্ খাঁর সানাইয়ের প্রথম রেকর্ড প্রকাশের কৃতিত্বও 'হিন্দুস্থানে'র। এ-থেকে বোঝা যায়, মার্গসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের ভারতখ্যাত শিল্পীদের কদরদান করতে 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' কতোখানি আন্তরিক ও তৎপর ছিল।

রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড-প্রকাশে 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। খোদ রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পঙ্কজকুমার মল্লিক, কুন্দনলাল সায়গল, রাজেশ্বরী বাসুদেব [দত্ত], অমিয়া ঠাকুর, অমিতা সেন, শান্তিদেব ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাসের মতো শিল্পীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বেরিয়েছে 'হিন্দুস্থান' থেকে। পঙ্কজ মল্লিক এখানে আধুনিক গানও গেয়েছেন। লোকগানের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হয়েছে 'হিন্দুস্থানে'র কল্যাণে। শচীন দেববর্মন থেকে দীনেন্দ্র চৌধুরী — মাঝখানে আরো কারো কারো নাম উল্লেখ করা যায়। শচীনকর্তা লোকগানে যেমন আধুনিকগানেও তেমনি সুর ও গায়কিতে একটি নতুন 'ধরন' সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র চুক্তিবদ্ধ শিল্পী। সব মিলিয়ে তাঁর পঞ্চান্নটি গান রেকর্ডিং হয় এই প্রতিষ্ঠান থেকে। ১৯৩২-এ এগারো নম্বর রেকর্ডে প্রথম তাঁর এই গান দুটি প্রকাশ পায় — 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে' ও 'এই পথে আজ এস প্রিয়'। কালজয়ী এই শিল্পী প্রচুর ব্যবসা দিয়েছিলেন 'হিন্দুস্থান'কে। আজও তাঁর গানের আবেদন নতুন যুগের শ্রোতাদের কাছেও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। 'হিন্দুস্থান' নিউ থিয়েটার্সের ফিল্মের গান প্রকাশ করে বাংলা গানের জগতে নতুন এক স্বাদ এনে দেয়। অবশ্য মেগাফোন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোম্পানির ভূমিকাও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। 'মেগাফোন' মূলত কানন দেবীর কণ্ঠের ফিল্মের গানই রেকর্ড করার অনুমতি পায়, কেননা কানন ছিলেন 'মেগাফোনে'র শিল্পী। 'ইস্ট ইন্ডিয়া' ও 'কালী ফিল্মে'র রেকর্ডও এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। 'হিন্দুস্থানে'র 'H' চিহ্ন-নম্বরেই আবার আলাদাভাবে 'ভারতবাণী রেকর্ড'ও বেরিয়েছিল। হাতি-মার্কা প্রতীকের 'নিউ থিয়েটার্স' কবেই বিদায় নিয়েছে ফিল্মের জগৎ থেকে — সত্যিকার অর্থে ফিল্ম নয়, গানের ভেতর দিয়েই প্রতিষ্ঠানটির স্মৃতি এখনো কারো কারো মনে দোলা দেয় — ওই 'হিন্দুস্থান' বা 'মেগাফোনে'র সৌজন্যে।

'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র আরেক মহান অবদান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীদের কণ্ঠে উদ্দীপনামূলক জাগরণী দেশগানের রেকর্ড প্রকাশ। অংশুমান রায়ের কণ্ঠে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার-রচিত 'শোন, একটি মজিবরের থেকে/ লক্ষ মজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি,/ আকাশে বাতাসে ওঠে রণি/ বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ' — এই সংগ্রামী-চেতনার আবেগসঞ্চারী গানটির রেকর্ডও বের হয় 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' থেকে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র এই সাংস্কৃতিক সমর্থনের প্রয়াসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

সতেরো

কেউ কেউ — যেমন 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'র শব্দযন্ত্রী নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ১৯৩২-এ 'সেনোলা রেকর্ড' প্রথম বের হয়। কিন্তু এই বক্তব্য মানতে দ্বিধা থেকে যায়, কেননা আমাদের হাতে 'সেনোলা রেকর্ডে'র আগস্ট ১৯৩৫-এর যে ক্যাটালগ আছে তাতে স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে — 'সেনোলা রেকর্ডের প্রথম গীতি-অর্ঘ্য'। বেশ আগে থেকেই কলকাতার ১৮৩ ধর্মতলা স্ট্রিটে 'সেনোলা মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্' গ্রামোফোন-যন্ত্র ও রেকর্ড বিক্রির ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু আগস্ট ১৯৩৫-এর রেকর্ড-তালিকা-পুস্তিকার 'নিবেদন' থেকে রেকর্ড-তৈরিতে তারা ১৯৩৫-এর আগে আসেনি বলেই মনে হয়। 'নিবেদন'-এর ভাষ্যে জানা যায় :

'সেনোলা রেকর্ডের নূতন অর্ঘ্য লইয়া সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ কোম্পানী রেকর্ড-শিল্প-জগতে প্রবেশ করিল।

'আপনাদের প্রীতি-প্রমুখ সহযোগিতার ফলেই আজ সেনোলার নাম ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এমন কি ভারতবর্ষের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাহিরেও বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। সেই প্রীতি, সেই সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের এই নব-শিল্প-অর্ঘ্য আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করা হইল।

'যাহাতে রেকর্ডের সঙ্গীতে, পালায় এবং বাদ্যে একটা নূতন রুচি, একটা নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার জন্য কোন শ্রমই গ্রহণ করিতে আমরা পরাঙ্মুখ হই নাই। শুধু শ্রম এবং অর্থ-ব্যয়ে যাহা হয় না, তাহার জন্য প্রয়োজন রসিক মনের; তাহার জন্য প্রয়োজন সৃষ্টি-শীল সজাগ মনের। সেনোলা রেকর্ডের সর্ব্ব-প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, তাহার প্রত্যেক রেকর্ডের পিছনে যেমন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের প্রতিভা, শব্দ-বিজ্ঞান-অভিজ্ঞ সঙ্গীত-পরিচালকদের নব নব উদ্ভাবনা এবং সুরের আব-হাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য বাদ্য-যোজনার নূতন কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি সর্ব্বোপরি রহিয়াছে, শিল্প-বিভাগের সকল উদ্যমকে মিলাইয়া একটা সম্পূর্ণ রস-সৃষ্টি করিবার মত সক্ষম এবং সজাগ মন। সেনোলা রেকর্ড গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এ-যুগের সর্ব্ব-প্রথম অভিযান।

'আমাদের উদ্যম সেই অভিযানকে সফল করিয়া তুলিয়াছে।

'আমাদের প্রথম-প্রকাশিত রেকর্ডগুলি এবং সীতা-পালা শুনিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

'সেই সফলতা সার্থক হইবে আপনাদের প্রীতির প্রাণ-স্পর্শে।'

সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও সেনোলা রেকর্ড-তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন বিভূতিভূষণ সাহা। শ্রীমতী আশা রায়ের দুটি দেশ-বন্দনার গান দিয়েই ('আমার সোনার হিন্দুস্থান' এবং 'আমার বাংলা মায়ের বাণী') সেনোলা রেকর্ড-জগতে প্রবেশ করেছিল। প্রথম-পর্বের রেকর্ডিং-এ আরো গান গেয়েছিলেন সন্তোষ সেনগুপ্ত, শ্রীমতী দুর্গারাণী ও শ্রীমতী সরযূবালা। সন্তোষ সেনগুপ্তের 'আজি শাঙন ঝরে মম বিজন বনে' গানটি লিখেছিলেন শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী। হাসিরাশিই কি রেকর্ডের প্রথম মহিলা-গীতিকার? জগৎ ঘটকের রচনায় দু'খানি বাংলা ভজন গেয়েছিলেন দুর্গারাণী। 'প্রথম-প্রকাশিত হিন্দুস্থানী রেকর্ডে'র মধ্যে শ্রীমতী সরযূবালা, সন্তোষ সেনগুপ্ত, শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি, টি. আহ্‌মেদ ও পণ্ডিত লাড্‌লীপ্রসাদের গান প্রকাশিত হয়েছিল। হরিদাস গাঙ্গুলীর মাউথ অর্গানই সেনোলার প্রথম যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড। তবে সেনোলার প্রথম প্রয়াসে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল শ্রীবিষ্ণুশর্মা-রচিত সাতখানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ পালানাট্য 'সীতা'। এই নাটকের প্রযোজক ও রাম-চরিত্রের অভিনেতা ছিলেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সীতা-চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন 'শিশিরকুমারের আদি-শিষ্যদের অন্যতমা অদ্বিতীয়া মাইক্রোফোন-অভিনেত্রী শ্রীমতী উষাবতী (পটল)'। সংগীত-পরিচালনায় ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। 'সীতা' নাটকটি সেইসময়ের পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয়, তার নমুনা রেকর্ডের তালিকা-পুস্তিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। এর পরে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-রচিত 'রাবণ' পালা-রেকর্ডও অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। এতে রাবণ করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী আর সীতা — শ্রীমতী সরযূবালা। পৌরাণিক নাটকের পাশাপাশি 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' নামে রঙ্গ-নাটিকার রেকর্ডও বের করেছিল সেনোলা। দেশভাগের আগ পর্যন্ত 'সেনোলা রেকর্ড' বেশ দাপটেই চুটিয়ে ব্যবসা করেছে। পঞ্চাশ দশক থেকে নানা কারণে 'সেনোলা'র রেকর্ড ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়।

আঠারো

'কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানি' কী করে বাঙালি মালিকানা অথবা পরিচালনায় এলো এবং এইচ.এম.ভি.-র ঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। হীরেন বসুর বরাতে এর সামান্য আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তিনি নজরুলের হাত ধরে এইচ.এম.ভি. ছেড়ে মেগাফোনে এসে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর আবার একসময় মেগাফোন থেকে চলে গিয়ে যুক্ত হন কলম্বিয়ার সঙ্গে। হীরেন বসুর মুখেই সে-কথা শোনা যাক :

'মেগাফোন কোম্পানির জিতেনবাবুর সস্নেহ বন্ধন আমায় কিন্তু ধরে রাখতে পারলো না মেগাফোনে। কারণ আমার পুরাতন মনিব শ্রীযুক্ত নৃপেন মজুমদার মশাই হঠাৎ নিলেন কলোম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মভার। আমার ডাক পড়লো। শুনলাম এইচ.এম.ভি.-র বিপক্ষে কলোম্বিয়া কোম্পানি ভারতীয় রেকর্ডের অভিযান চালাবেন। সেই অভিযানের কর্ণধার হবেন মজুমদার মশাই, সেনাপতি হবো আমি। পুরানো আক্রোশ মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠলো, এইচ.এম.ভি.-র বিপক্ষে।

'নিত্য নতুন আর্টিস্ট রিক্রুট্‌মেন্ট চলেছে।

'এল লীলা (ফক্স), গামা সাহেব, পারুল, আশালতা, রাণীবালা, আভাবতী, প্রফুল্লবালা, নলিনী এমনি কত। অ্যামেচার শিল্পী হয়ে এলেন, নীলিমা বসু, উত্তরা দেবী। পঙ্কজ মল্লিক, আমি, নলিনী সরকার, সুশীল বসু ইত্যাদিতে কলোম্বিয়ার নৈবেদ্য রচনার কাজ চলতে লাগলো।

'প্রতিদিন সকাল আটটায় রিহার্সল রুমে আমি গিয়ে বসি এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিরি সন্ধ্যায়। বাড়ি থেকে খাবার আসতো। ওখানেই খাওয়া, ওখানেই বিশ্রাম।'

হীরেন বসু আর তাঁর সঙ্গীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অল্পদিনেই বাঙালি-পরিচালনায় পুরনো ঐতিহ্যের পথ ধরে কলম্বিয়া আবার বেশ ভালোভাবে দাঁড়িয়ে গেল। নতুন নতুন শিল্পীকে তিনি তৈরি করে নিলেন। একেবারে আনকোরা শ্রীমতী রাণীবালার সঙ্গে হীরেন বসুর দ্বৈতকণ্ঠের ভজন 'এসো শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী' খুবই মনে ধরলো শ্রোতাদের। এরপর রাণীবালা রাতারাতি একেবারে তারকাশিল্পীর কাছাকাছি এসে গেলেন 'আমার আঁখিতে রহ গো নন্দদুলাল' রেকর্ড করে। আশালতার মতো উচ্চারণ না-জানা অনক্ষর মূর্খকেও তিনি শিল্পী বানিয়ে দিলেন। 'মলয়া শোন রে তোরে বলি' — এই গান গেয়ে আশালতাও জাতে উঠলেন। কানন দেবীরও হীরেন বসু কিংবা কলম্বিয়ার টানে মেগাফোনের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হলো। হীরেন বসু তাঁর কণ্ঠে তুলে দিলেন — 'রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি পায়েলা বাজে' — এই গান সবার মন-জয় করলো। কলম্বিয়া তখন একের পর এক চমক দিয়ে যাচ্ছে এইচ.এম.ভি.-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কলের গানের ভালো বাজার পেয়ে গেলো কলম্বিয়া। বহুদিন ধরে কলম্বিয়া এককভাবে তার রেকর্ড-তৈরির ব্যবসা রমরমিয়ে করেছিল। কিন্তু এইচ.এম.ভি.-র কৌশল, পুঁজি ও অবকাঠামোগত সুবিধার জন্যে একসময় কলম্বিয়াকে হার মানতে হলো। এইচ.এম.ভি.-র সঙ্গে আবার মিশে যেতে হলো তাকে। সে অবশ্য অনেক পরের কথা। কিন্তু তখনো এইচ.এম.ভি.-র তত্ত্বাবধানে হলেও 'কলম্বিয়া' লেবেলের রেকর্ড প্রকাশ বন্ধ হয়নি।

উনিশ

স্বদেশি রেকর্ড কোম্পানির ইতিহাসে 'পাইওনিয়ার রেকর্ডস্ এন্ড মিউজিক্যাল ভ্যারাইটিজ্'-এর 'পাইওনিয়ার রেকর্ড'-এর কথাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কোম্পানির আপিস ছিল কলকাতার ৪৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে। পাইওনিয়ারের রেকর্ডসহ গ্রামোফোন-সামগ্রীর পরিবেশক ছিলেন কলকাতার ১৬১/১ হ্যারিসন রোডের কে.সি. দে অ্যান্ড সন্স। রেকর্ড প্রকাশের আগে থেকেই নিজ নামে পাইওনিয়ারের গ্রামোফোন ও গ্রামোফোন-পিন তৈরি ও বিক্রির ব্যবসা ছিল।

পাইওনিয়ারের গ্রামোফোন-সামগ্রী বিক্রির ব্যবসা বিশের দশকের শেষ থেকেই ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু রেকর্ড-তৈরি ঠিক কখন থেকে শুরু হয় তার সাল-তারিখ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবে 'পাইওনিয়ার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রেকর্ড'-এর জুন ১৯৩৯-এর তালিকা-পুস্তিকা থেকে বেশ বোঝা যায় অন্তত ১৯৩৭-৩৮ নাগাদ এই লেবেলে রেকর্ড ছাপা শুরু হয়। জুন ১৯৩৯-এর ক্যাটালগে মুদ্রিত 'প্রচার সম্পাদকের দপ্তর হইতে' শীর্ষক বক্তব্যে 'পাইওনিয়ার রেকর্ড' সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় :

'জনগণের মনোরঞ্জন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট যে আমরা হই নাই একথা বলিবার সাহস আজ আমাদের হইয়াছে কারণ আমরা আমাদের শ্রোতাগণের অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি, পাইওনিয়ার রেকর্ডকে তাঁহারা প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন।

'এই দুরন্ত প্রতিযোগিতার দিনেও কেবলমাত্র অর্থকারী সঙ্কীর্ণতার পন্থা অবলম্বন করিয়া আমরা যে কুরুচির প্রশ্রয় দিই নাই তার প্রমাণ দুর্গাদাসের পরিচালনায় শচীন্দ্রনাথের 'স্বামী-স্ত্রী'র মত বিখ্যাত ও অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত প্রগতিমূলক নাটক আমাদেরই কীর্ত্তি-কীরিট। অনাথ রায়ের পরিচালনায় শৈলজানন্দের 'এস মা লক্ষ্মী' আমাদেরই একনিষ্ঠ সাধনার কর্ম্মফল, অবশ্য ভাগ্যফল হইতে বঞ্চিতও আমরা হই নাই কারণ আজ প্রতি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই পাইওনিয়ার রেকর্ডই মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ...

'আমাদের এ মাসের রেকর্ডগুলিও রেকর্ড জগতে এক নূতন ইতিহাস রচনা করিবে। তার কারণ রেকর্ডগুলি নূতনত্বে সমৃদ্ধ ও আপনার মাধুরীতে আপনি বিকশিত। শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পী ও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর একত্রে একান্ত সাধনায় যে অপরূপ ফল আমরা পাইয়াছি তাহা রেকর্ডজগতে সত্যিই বিরল। আমাদের এই উক্তির সত্যাসত্য আপনাদের বিচারাধীন। আপনাদের হৃদয়হরণ করিতে পারিলেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে। ...'

'পাইওনিয়ার রেকর্ডে' যাঁরা গান দিয়েছিলেন তাঁদের একটি তালিকা এখানে দেওয়া গেলো : কুমারী কুলসম আমেদ (ঝন্টু), গায়ত্রী দাসগুপ্তা, মণীন্দ্রচন্দ্র দে, মাধুরী সেনগুপ্তা, সুশীল চক্রবর্তী, বেলারানী সেন (যশোর), বিভা মুখার্জি, মিনতি ব্যানার্জি, গৌরি দাসগুপ্তা, কমলা (হাজরা), সতী চ্যাটার্জি, রণজিৎ মণ্ডল, সৌরিন দাসগুপ্ত, গৌরি দাসগুপ্তা, গীতা সেনগুপ্তা, ধীরাজ ভট্টাচার্য (ফিল্ম), নীলিমা দত্ত, ক্ষীরোদ মুখার্জী, পুষ্প ঘোষ, পুষ্পরাণী রায়, শচীন চক্রবর্তী, প্রাণতোষ চক্রবর্তী, নমিতা গাঙ্গুলি, রাজলক্ষ্মী (স্টার থিয়েটার), ধনপতি সান্যাল, শোভা রায়চৌধুরী, নীলিমা চ্যাটার্জী, বরদা গুপ্ত, পদ্মরাণী, শৈল দেবী, নমিতা সেনগুপ্তা, নিবেদিতা সেন, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, হিমাংশুভূষণ রায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য, উমা ভট্টাচার্য, ক্ষীরোদগোপাল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুখোপাধ্যায়, শোভা দেবী, মইনা পাগলা, তৃপ্তি সেন, দ্বিজেন চৌধুরী, তারকবালা (স্টার থিয়েটার), কমলা ঝরিয়া, গোবিন্দরানী বাইজী, দিলওয়ার হোসেন প্রমুখ। লক্ষ করার বিষয়, পাইওনিয়ার নতুন সংগীত-প্রতিভাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। তাই যশোর, টাটানগর, বহরমপুর কিংবা কুচবিহার থেকেও শিল্পী খুঁজে এনে রেকর্ড করিয়েছে। অবরোধবাসিনী মুসলিম মেয়েরাও যে পর্দার ঘোমটা ছুঁড়ে ফেলে গানের জগতে ধীরে ধীরে এসে জড়ো হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে কুমারী কুলসম আমেদের দৃষ্টান্ত থেকে। পাইওনিয়ার তার রেকর্ড-তালিকার প্রচ্ছদে (জুন ১৯৩৯) কুলসমের ছবিও ছেপেছিল। কুলসমের পরিচয় ও গানের আভাস দিয়ে বলা হয় :

'বাংলাদেশের সংস্কৃতি সাধনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এমনই এক সম্ভ্রান্ত মুশ্লিম পরিবারের আনন্দদুলালী কুমারীর কণ্ঠকাকলী রেকর্ডের মায়ারেখায় আঁকিয়া তুলিতে একমাত্র পাইওনিয়ারই সক্ষম হইয়াছে। সাউন্ডবক্সের আজীবন ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা বলা যাইতে পারে। এই শুভ কর্ম্মসাধনায় একমাত্র পাইওনিয়ারই যে পাইওনিয়ার অর্থাৎ অগ্রণী একথা আজ আমরা গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি।

'কুমারী কুলসমের গানের রেশটুকু যেন গোলাপবাগের বুলবুলের আওয়াজের মত মিঠা। খাঁচার পাখীর অসহায় কণ্ঠস্বরের মত আড়ষ্ট নয়। এ বিষয়ে আমরা আর কিছু বলিব না রেকর্ডখানি শুনুন — ফলেন পরিচিয়তে। ...'

একই সঙ্গে ফিল্ম ও সংগীতের সঙ্গে অনেক শিল্পীই জড়িত ছিলেন এবং দুই মাধ্যমেই তাঁরা নাম করেছিলেন। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে চটজলদি নাম মনে পড়বে কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুন্দনলাল সায়গল, রবীন মজুমদার বা কানন দেবীর। তবে মূলত চলচ্চিত্রজগতেরই নামি শিল্পী যাঁরা দু-চারটে গানের রেকর্ডও করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্য একজন। ধীরাজ ছিলেন ছায়াছবির সেই সময়ের জনপ্রিয় নায়ক — লেখক-খ্যাতিও জুটেছিল তাঁর, বিশেষ করে 'যখন নায়ক ছিলাম' ও 'যখন পুলিশ ছিলাম' বইয়ের জন্যে। কিন্তু তিনি রেকর্ডে গান গেয়েও যে নাম কিনেছিলেন, সে-খবর ক'জনেরই বা জানা আছে! শুধু 'পাইওনিয়ার' নয়, 'মেগাফোন' বা 'হিন্দুস্থান' থেকেও তাঁর গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল। অবশ্য পাহাড়ী সান্যালের কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে পড়বে — তবে সান্যাল তো রীতিমতো তালিম নেওয়া শিল্পীই ছিলেন, ফিল্মের কাজে ব্যস্ত সান্যালের ফুরসত না থাকায় গানের দিকটায় তেমন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মন দিতে পারেননি। চলচ্চিত্রের নায়ক অসিতবরণের রেকর্ডের গানও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

পাইওনিয়ারের বিশিষ্ট গীত-রচয়িতাদের মধ্যে প্রণব রায়, শৈলেন রায়, নীহারবিন্দু সেন, সুবোধ পুরকায়স্থের নাম করতে হয়। সুরসৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্যের মতো প্রখ্যাত সংগীত-পরিচালক। শৈলেন রায়ের কথা ও হিমাংশু দত্তের সুরে মাধুরী সেনগুপ্তার কণ্ঠের 'তোমারি পথপানে চাহি/ আমারি পাখী গান গায়' পাইওনিয়ার রেকর্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান। এই গানটি এককালে মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে।

'পাইওনিয়ার' বাংলা গানের পাশাপাশি হিন্দি ও উর্দু গানের রেকর্ডও প্রকাশ করেছে। কমলা ঝরিয়ার মতো শিল্পীকে দিয়েও তারা হিন্দি রেকর্ড বের করেছিল। হিন্দুস্থান রেকর্ড ও মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির মতো পাইওনিয়ারও চলচ্চিত্রের গানের রেকর্ড প্রকাশ করেছিল। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'পরশমণি' ও 'অভয়ের বিয়ে' ছবির গানের রেকর্ড 'পাইওনিয়ার' থেকেই বের হয়েছিল।

'পাইওনিয়ার রেকর্ড' যে ১৯৪২-এর শেষ পর্যন্তও বেরিয়েছিল তা তাদের রেকর্ডের তালিকা-পুস্তিকা থেকে জানা যায়। সুধীরচন্দ্র গুহ স্বাক্ষরিত ডিসেম্বর ১৯৪২-এর ক্যাটালগে পাইওনিয়ার-প্রকাশিত রেকর্ডে প্রতিমা সেন ও শুভ গুহঠাকুরতার গাওয়া 'রবীন্দ্র-গীতি', বেচু দত্ত ও রেণুকা সেনের কণ্ঠের 'কাব্য-গীতি'র উল্লেখ মেলে। লক্ষ করার বিষয়, 'রবিবাবুর গান' ততদিনে 'রবীন্দ্র-গীতি'তে উত্তীর্ণ হলেও 'রবীন্দ্রসংগীত' হিসেবে তখনো হয়তো তেমন পরিচিতি পায়নি।

কুড়ি

ডিসেম্বর ১৯৪২-এ 'পাইওনিয়ার' ও 'ভারত রেকর্ডে'র পক্ষ থেকে যৌথভাবে 'গীতি-চয়নিকা' নামে রেকর্ডের একটি তালিকা-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এতে একই মলাটে আলাদাভাবে 'পাইওনিয়ার' ও 'ভারতে'র রেকর্ডের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 'ভারত রেকর্ড'-এর SC. 31 নম্বর পর্যন্ত রেকর্ডের তথ্য মেলে। এ-থেকে ধারণা করা যায়, ১৯৪২ বা তার কিছু আগেই 'ভারত রেকর্ডে'র জন্ম। 'ভারত রেকর্ডে'র শিল্পী হিসেবে মঞ্জু বসু, মণি চক্রবর্তী, চলচ্চিত্র-নায়িকা চিত্রা দেবী, উমা দত্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মনীন্দ্র চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যায়। 'ভারত রেকর্ড ক্লাব' *শেষ উত্তর* ছবির 'আমি বনফুল গো' এবং *গরমিল* ছবির 'হৃদয় আমার হ'ল স্বয়ম্বরা' — এই জনপ্রিয় গান দুটির 'অর্কেস্ট্রা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাজনা'র রেকর্ড প্রকাশ করেছিল। 'ভারত রেকর্ড' আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল — পরে 'পাইওনিয়ারে'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, নাকি 'ভারত রেকর্ড' 'পাইওনিয়ারে'রই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ছিল — এ-প্রশ্নের মীমাংসার কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

আবার 'ভারতী রেকর্ডস্ অ্যান্ড মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্'-এর পক্ষ থেকে 'ভারতী' (BHARATI) লেবেলেও অনেক রেকর্ড বেরিয়েছিল। বিমান মুখোপাধ্যায় 'ভারতী'র সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই জড়িত ছিলেন। 'ভারতী' লেবেলে তাঁর ভক্তিগীতির রেকর্ডও বেরিয়েছিল ('যা পেয়েছি মাগো'–BRT. 104)। বিমান মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে 'ভারতী রেকর্ডে' পদ্মরেণু চট্টোপাধ্যায় গেয়েছিলেন — 'বাহিরে বাদল কাঁদে — মনে কাঁদে ফাল্গুন'।

একুশ

তিরিশের দশকের শেষদিকে, সম্ভবত ১৯৩৭-৩৮-এ, 'রিগ্যাল রেকর্ড' প্রকাশিত হয় কলকাতার কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানির তত্ত্বাবধানে। ১৯৩৩ সাল নাগাদ কলম্বিয়া বাঙালি মালিকানা বা পরিচালনায় কাজ শুরু করে। কলম্বিয়া কোনো অখ্যাত কোম্পানি ছিল না, তাই তার পূর্ব পরিচিতি ও সুনাম নিয়ে অল্পদিনেই রেকর্ড-ব্যবসায়ে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়। কলম্বিয়ার প্রয়াসে 'রিগ্যাল রেকর্ড'ও অল্প সময়েই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পূর্ব ভারতে 'রিগ্যাল রেকর্ডে'র মুখ্য পরিবেশক ছিল কলকাতার ১৮৩ ধর্মতলা স্ট্রিটের সেনোলা মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ কোম্পানি। দেশভাগের পরেও অনেকদিন 'রিগ্যাল রেকর্ড'-এর অস্তিত্ব বজায় ছিল।

এইচ.এম.ভি. যে বুদ্ধি ও কায়দায় প্রায় একচেটিয়া রেকর্ড-ব্যবসা করে আসছিল, কলম্বিয়াও ওই একই পথ ধরলো। এইচ.এম.ভি.-র যেমন 'টুইন' লেবেলে সস্তা দামের রেকর্ড ছিল, ঠিক একইভাবে কলম্বিয়া 'রিগ্যাল রেকর্ড' নামে অপেক্ষাকৃত কম দামের রেকর্ড বাজারে ছাড়তে শুরু করে। যে-কাজ 'টুইন' বা 'মেগাফোন' বেশ আগেই করেছিল, 'রিগ্যাল' লেবেলে কলম্বিয়াও তাই অনুসরণ করলো — প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ শিল্পীদের টেনে এনে। নজরুল-কে. মল্লিক (মহাম্মদ কাসেম)-আব্বাসউদ্দীনের ইসলামি গানের জোশে একসময় বাঙালি মুসলমান সমাজে 'হারাম' গানবাজনা 'হালাল' হয়ে উঠলো। নতুন নতুন মুসলিম শিল্পীদের গানে ভরে উঠলো 'টুইন'-'মেগাফোন'। মুসলমান সমাজ গানের কদর বুঝতে শুরু করলে রেকর্ডের বাজার ক্রমে প্রসারিত হয়ে উঠলো। হিন্দু গায়ক-গায়িকা মুসলমান নাম নিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইসলামি গানের রেকর্ড বের করতে লাগলেন। যেমন একসময় হিন্দুসমাজে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্যে মহাম্মদ কাসেমকে আগমনী ও ভক্তিগীতি গাইতে হয়েছিল কে. মল্লিক বা শঙ্কর মিশ্র নাম নিয়ে। এই নতুন বাজার ধরার জন্যে 'রিগ্যাল' এন্তার মুসলিম শিল্পীদের গানই শুধু রেকর্ড করলো না, সেইসঙ্গে ইসলাম ধর্মের নানা প্রসঙ্গ এবং মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে নানা গান, নাটিকা, কথিকা প্রচারেও উদ্‌যোগী হয়ে উঠলো। রেকর্ড বেরুলো 'নমাজের মর্ত্তবা', 'কাসেমের যুদ্ধযাত্রা'র জারি, 'মাণিকপীরের গান', 'মুস্কিল আসানের গান' আর ইসলামি ভক্তিগীতির। ব্যবসায়িক কারণে এই ধর্মীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছিল 'এইচ.এম.ভি.'-'টুইন', তারপরে 'মেগাফোন' এবং সবশেষে 'রিগ্যাল'। তবে এর অন্য একটা দিকও ছিল, — এই প্রয়াসের ফলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একধরনের সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে ওঠার সুযোগও তৈরি হয়েছিল।

বাইশ

'গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড' বা 'নিকোল', 'বেকা', 'ওডিয়ন' বাঙালি-প্রতিষ্ঠান ছিল না বটে, কিন্তু এরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল বাঙালি শিল্পী-কলাকুশলী-ব্যবস্থাপকদের শ্রম-মেধা আর প্রয়াসেই। একসময়ে কোম্পানির নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত ছাড়া 'গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড'-এর আর সবকিছুই পরিচালনা করতেন বাঙালিরা, এঁদের মধ্যে ভগবতীচরণ ভট্টাচার্যের প্রভাব ছিল সর্বোচ্চ। পরে আসেন হেমচন্দ্র সোম। বিদেশি কোম্পানির মধ্যে দীর্ঘজীবী এই প্রতিষ্ঠান — যারা 'এইচ.এম.ভি.', 'টুইন', 'কলম্বিয়া' লেবেলে রেকর্ড বের করতো, তাদের ব্যবসা ছিল প্রায় একচেটিয়া। কঠিন শর্তের জালে তারা শিল্পী-কলাকুশলীদের বেঁধে রাখতো। অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও সম্মানী পেতেন না। কথা, সুর ও গানের স্বত্ব তাঁদের থাকতো না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবস্থান ও গুরুত্বের কারণে কোম্পানির কাছ থেকে এই স্বত্বের সুবিধা পেলেও অন্যদের জন্যে তা প্রযোজ্য ছিল না। নজরুল তাঁর সহশিল্পীদের নিয়ে এই বিষয়ে যথেষ্ট দেন-দরবার ও শেষে আন্দোলন করে এই সমস্যার সুরাহা করেছিলেন। কিন্তু চুক্তিবদ্ধ বাঁধা-শিল্পীর দস্তুর থেকেই গিয়েছিল। 'গ্রামোফোন কোম্পানি'র আদেশ-নিষেধ ও নিয়ম-রীতি শিল্পীদের জন্যে অনেক সময়ই অসহনীয় হয়ে উঠতো — আত্মমর্যাদা রক্ষাও কঠিন হতো। ফলে নজরুল এইচ.এম.ভি. ছেড়েছিলেন সদলবলে অনেকটা বিদ্রোহ করেই। তুলসী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাহিড়ীও টিকতে পারেননি। কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে তাঁর গান রেকর্ড না করার সিদ্ধান্ত অপমানসূচক ভাষা ও পদ্ধতিতেই কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়। এ-থেকে সহজেই অনুমান করা চলে, মধ্যম-সারি কিংবা নতুন শিল্পীরা কেমন পরিবেশে কাজ করতেন — সম্মানই বা পেতেন কতোটুকু! একচেটিয়া ব্যবসা আর সাহেব-কোম্পানি হওয়ায় 'এইচ.এম.ভি.' অহম্‌বোধ ও উন্নাসিকতার কারণে পঙ্কজকুমার মল্লিক, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় বা শচীন দেববর্মনের মতো শিল্পীকে তাদের রেকর্ডে গান দেওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করেছিল।

ইন্দুবালা, আঙুরবালা, যূথিকা রায়, রবীন মজুমদার, জগন্ময় মিত্র, সত্য চৌধুরী, বেচু দত্ত, অখিলবন্ধু ঘোষ — এঁদের গান শুনে এখনো সেকালের গানের সমঝদার-শ্রোতা স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠেন। কি গায়কি, কি সুর, কি বাণী — সব মিলিয়ে অন্তরছোঁয়া সেইসব গান শ্রোতাকে এক অলৌকিক আনন্দ-উপলব্ধির ভুবনে নিয়ে যায়। এঁদের অনেকেই সাহেব-কোম্পানির কাছে চুক্তির শর্তে বাঁধা ছিলেন, নিষেধের লক্ষ্মণ-রেখা অতিক্রম করতে পারেননি। রেকর্ডে বাংলা গানের যুবরাজ কে. মল্লিকও পারেননি 'ওডিয়ন', 'বেকা', 'এইচ.এম.ভি.', 'টুইনে'র বাইরে স্বদেশি রেকর্ড কোম্পানিতে গান দিতে — কারণ ওই চুক্তির 'দাসত্ব'।

অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। এক্ষেত্রে পঙ্কজকুমার মল্লিকের নাম করা যায়। তিনি জানিয়েছেন : 'কলম্বিয়া, গ্রামোফোন বা হিন্দুস্থান, কোনো রেকর্ডিং কোম্পানীর সঙ্গেই আমি কখনো চুক্তিবদ্ধ হইনি। সর্বত্রই গান করার ও রেকর্ড করার স্বাধীনতা আমি বজায় রেখেছিলাম।' তাই যখন গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য তাঁকে রেকর্ডের শিল্পী-নির্বাচক, সংগীত-প্রশিক্ষক ও শিল্পী হিসেবে এইচ.এম.ভি.-র সঙ্গে চুক্তি করার জন্যে যথেষ্ট চাপ দেন, পঙ্কজ মল্লিক তখন সেই প্রস্তাব সবিনয়ে ফিরিয়ে দেন। শিল্পীর স্বাধীনতাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর তাছাড়া শিল্পীজীবনের সূচনাপর্বে গান রেকর্ডের প্রত্যাশা নিয়ে এইচ.এম.ভি.-তে গেলে সেখানে অবমানিত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষোভ ও বেদনাও তাঁর মনে ছিল।

তেইশ

কলের গান আর কখনো বাজবে না। এই যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে 'সুখী গৃহকোণ/ শোভে গ্রামোফোন' — প্রবচনের মতো এই সুন্দর পদবন্ধটিও আজ বহুদূরের স্মৃতিতে পরিণত। গ্রামোফোন আজ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্রামোফোন-যুগের মানুষের কাছে মধুর সুখ-স্মৃতির পাশাপাশি বেদনা-জাগানিয়া অনুভূতির প্রতীক। আর এই প্রজন্মের কাছে হয়তো বা কেবলই পুরনো দিনের ক্লান্তিকর বাসি কাহিনি। পিতামহের আমলের সেই ঝক্‌ঝকে ধুতরো ফুলের মতো পেতলের চোঙ-অলা কলের গানের স্মৃতি 'সে কি ভোলা যায়'! — যতোই না হোক সে আজ ধূসর ক্যানভাসের অস্পষ্ট ছবি।

নতুন চিন্তার কারণে, প্রয়োজনের গরজে ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনে যুগ পাল্‌টায় — মনের রূপান্তর ঘটে — রুচির ধারা বদলে যায়। কলের গানের বিলুপ্তিও এই পথ ধরেই ঘটেছে। একদিন যা সত্য ছিল, তা আজ স্মৃতি, আবার আগামীকাল তা হয়তো কেবলই শ্রুতি। কলের গানের সৌজন্যে যাঁদের কণ্ঠের গান একদিন মানুষকে আনন্দ দিয়েছে — আবেগের স্পর্শে শিহরণ জাগিয়েছে, দু'চারজন বাদে তাঁরা আজ প্রায় সকলেই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন। সেইসঙ্গে যাঁদের যত্নে-আয়োজনে গোল কৃষ্ণ-চাকতির ভেতর দিয়ে এই গান পৌঁছে যেতো মানুষের কাছে, তাঁদের কথাও কেউ আর মনে রাখেনি। কতো স্বপ্ন নিয়ে — সংগ্রাম করে — শ্রম দিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন একেকটি প্রতিষ্ঠান — তারও আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই — ধূসর হয়ে গেছে সেইসব প্রয়াসের কথা। কিন্তু বাঙালির সংগীত-সংস্কৃতির একটি মহান অধ্যায়ের কথা চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে এই বেদনা কি কাউকে ভারাক্রান্ত ও বিধুর করে তোলে না? সংগীত-গবেষক ও ঐতিহ্যসাধক শোভন সোম আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে কিছুটা খেদ করে আর অনেকখানি প্রত্যাশায় বলেছিলেন : 'হিন্দুস্থান, মেগাফোন ও সেনোলা বাঙালীর এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে একই ধরনের ব্যবসায় না নেমে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান বাংলা গানে সুরুচি ও সুকণ্ঠের প্রবর্তন করেছিলেন, তারা এমন সব গান ও কণ্ঠ ধরেছিলেন, যা অন্যথায় পাওয়া যেত না। অবশ্য এ ব্যাপারে তাদের পূর্বসূরি হেমেন্দ্রমোহন বসু পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁর বোসেজ্ রেকর্ড থেকে শুরু করে হিন্দুস্থান, মেগাফোন ও সেনোলার প্রামাণ্য ইতিহাস লেখা প্রয়োজন' (*দেশ*, ২২ মাঘ ১৩৮৯)। কিন্তু এতোকাল পরেও তাঁর সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে এমন কথা হয়তো বলা যাবে না। কলের গানের রেকর্ড কোম্পানির ইতিহাসের একটি রূপরেখা আঁকতে গিয়ে বারবার বিড়ম্বিত হয়েছি উপকরণের অভাবে। পণ্ডিতজনদের তথ্যভ্রান্তি আর মহাজনদের স্মৃতিচর্চার স্ববিরোধী কিংবা পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের কারণে আরও বিভ্রান্ত হতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। তবুও অনেককাল ধরে মাধুকর-বৃত্তির কল্যাণে একটি অস্পষ্ট-অসম্পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। বলতে চেয়েছি তাঁদের প্রয়াসের কথা — যাঁরা গান অবসানের পর অনাদৃত বীণার মতো অবহেলার ধূসর ধুলায় আজ বিস্মৃত।

বহু যুগের ওপার হতে ভেসে আসে এক অস্পষ্ট সুর, সেই অর্ঘ্য দিয়েই প্রণতি জানাই সুরলোকের স্মৃতি-বিস্মৃতির নায়কদের :

'চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে
দিনগুলি মোর কোথায় গেল, বেলা-শেষের শেষ আলোকের রথে॥
নিয়ে গেল কতই আলো কতই ছায়া,
নিল কানে-কানে-ডাকা নামের মনে-মনে-রাখা মায়া,
নিয়ে গেল বসন্ত সে
আমার ভাঙা কুঞ্জশাখা হতে॥'

গ্রন্থঋণ

১. Michael Kinnear : *The Gramophone Company's First Indian Recordings 1899-1908.* Delhi, 1994.
২. পঞ্চবর্ষী : *জাতিস্মরের শিল্পলোক*। কলকাতা, ১৩৭০।
৩. সন্তোষকুমার দে : *কবিকণ্ঠ ও কলের গান*। বিশ্বভারতী, ১৩৯৯।
৪. আব্বাসউদ্দীন আহমদ : *আমার শিল্পী জীবনের কথা*। ঢাকা, ১৯৬০।
৫. পঙ্কজকুমার মল্লিক : *আমার যুগ আমার গান*। কলকাতা, ১৯৮০।
৬. সিতাংশুশেখর ঘোষ : *বিমানে বিমানে আলোকের গানে*। কলকাতা, ২০০৩।
৭. আবদুশ শাকুর : *সংগীত সংগীত*। ঢাকা, ১৪১১।
৮. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : *বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত*। কলকাতা, ২০০১।
৯. করুণাময় গোস্বামী : *সঙ্গীতকোষ*। ঢাকা, ১৯৮৫।
১০. আবুল আহসান চৌধুরী : *আব্বাসউদ্দিন*। কলকাতা, ২০০২।
১১. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : *বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা*। ঢাকা, ২০০২।
১২. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*। চতুর্থ খণ্ড। ঢাকা, আষাঢ় ১৩৯৯।
১৩. *দেশ* (সাপ্তাহিক, কলকাতা) : ৯ আশ্বিন ১৩৮৩, ১৬ পৌষ ১৩৮৯, ২২ মাঘ ১৩৮৯, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯।
১৪. *আজকাল* (দৈনিক, কলকাতা) : ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ ও ৩০ অক্টোবর ২০১১।
১৫. বিভিন্ন গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানির ক্যাটালগ ও কাগজপত্র।
১৬. বিভিন্ন সংগীতরসিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মে গা ফো ন কো ম্পা নি

কমলকুমার ঘোষের ভাষ্য

'গ্রামোফোন কোম্পানি' ১৯০২ সালে ভারতে স্থানীয় শিল্পীদের কণ্ঠের গান ও যন্ত্রীদের বাজনা রেকর্ডের জন্যে বিলেত থেকে ফ্রেডরিক উইলিয়ম গেইস্‌বার্গ ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে ভারতে পাঠান। গেইস্‌বার্গ আর তাঁর সঙ্গীরা ওই বছরের ২৮ অক্টোবর কলকাতায় এসে পৌঁছান। সময় নষ্ট করেননি গেইস্‌বার্গ, পৌঁছানোর মাত্র এগারো দিনের মাথায় অর্থাৎ ৮ নভেম্বর প্রথম বাঙালি শিল্পীর বাংলা গান রেকর্ড। 'কাঁহা জীবনধন' — এই কীর্তনটি গেয়েছিলেন ক্ল্যাসিক থিয়েটারের চতুর্দশী নর্তকী মিস্ শশীমুখী। এই যাত্রায় গেইস্‌বার্গের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার নিঃসন্দেহে কিন্নরকণ্ঠী গওহরজান। ১১ নভেম্বর গেইস্‌বার্গ গওহরজানের কণ্ঠে হিন্দুস্থানি ভাষার গান ধারণ করেন রেকর্ডে। গেইস্‌বার্গ-ধারণকৃত তাঁর প্রথম বাংলা গান হলো — 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে'। এই পর্যায়ে নামকরা গাইয়েদের মধ্যে লালচাঁদ বড়ালের গানও রেকর্ড করা হয়। গেইস্‌বার্গ কলকাতার থিয়েটারপাড়া আর বেশ্যা-বাইজির আসরে-বাসরে ঘুরে বেশ কিছু কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পী আবিষ্কারে সফল হন।

গেইস্‌বার্গের কল্যাণে ভারতে, বিশেষ করে বাংলায়, গ্রামোফোনের এক বড়ো বাজার তৈরি হয়। 'দ্য গ্রামোফোন অ্যান্ড টাইপরাইটার লিমিটেড' এই বাজার সম্প্রসারণে আরো তৎপর হয়ে ওঠে। তাই গেইস্‌বার্গের পরে রেকর্ডিংয়ের জন্যে ১৯০৪-এ উইলিয়ম সিনক্লের ডার্বি এবং ১৯০৬-এ গেইস্‌বার্গের অনুজ উইলিয়ম কন্‌বাড গেইস্‌বার্গ ভারতে আসেন। তাঁদের এই সফর খুবই সফল হয়। আগে তো কেবল গ্রামোফোন-যন্ত্র ও বিদেশি ভাষার রেকর্ড বিক্রি হতো, এখন বাংলা গানের রেকর্ড তৈরি ও বিক্রির সুযোগ মিললো। প্রথম যুগে এদেশে ধারণকৃত রেকর্ড জার্মানির হ্যানোভারে পাঠাতে হতো চূড়ান্ত ছাপার জন্যে। এতে সময় যেমন বেশি লাগতো, পাশাপাশি অনেক রেকর্ড

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নষ্টও হতো। এসব সমস্যা দূর হলো গেইস্‌বার্গের প্রথম রেকর্ডিংয়ের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই, যখন ১৯০৭-এ কলকাতার বেলেঘাটায় ভারতে গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের প্রথম কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে এদেশে গ্রামোফোনের বাজার দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে এবং নিশ্চিত বাণিজ্যিক সাফল্যের সম্ভাবনায় বিদেশি গ্রামোফোন কোম্পানিগুলো অবিলম্বে কলকাতায় পৌঁছে যায়। এদের মধ্যে নাম করতে হয় এই কোম্পানিগুলোর : দ্য গ্রামোফোন অ্যান্ড টাইপরাইটার লিমিটেড — পরে পরিবর্তিত নাম দ্য গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড, দ্য নিকোল রেকর্ড কোম্পানি লিমিটেড, দ্য বেকা রেকর্ড জি.এম.বি.এইচ., ইন্টারন্যাশনাল টকিং মেশিন কোম্পানি, দ্য নিওফোন কোম্পানি লিমিটেড, লাইরোফোন-হ্বের্ক অ্যাডল্‌ফ্‌ ল্যেবান অ্যান্ড কোম্পানি, প্যাথি কোম্পানি, ইউনিভার্সাল টকিং মেশিন ডিপো, ভিক্টর টকিং মেশিন কোম্পানি, কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানি ইত্যাদি। বিনোদনের সামগ্রী হিসেবে গ্রামোফোন অচিরেই অসামান্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিদেশি কোম্পানিগুলো চুটিয়ে ব্যবসা করতে থাকে। বিদেশে কোম্পানির এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামোফোন-যন্ত্র ও রেকর্ড বিক্রি থেকে বাঙালি উদ্‌যোক্তারা ক্রমে রেকর্ড তৈরির ব্যবসায়েও নামেন এবং সাফল্যের এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেন। এই উদ্‌যোগের পেছনে ব্যবসায়িক মানসতার পাশাপাশি স্বদেশি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও স্বাদেশিকতাবোধের চেতনাও অনেকাংশে কাজ করেছিল।

দুই

সাধারণত হেমেন্দ্রমোহন বসু বা এইচ. বোসকেই দেশি রেকর্ড-নির্মাতাদের প্রথম পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের হাতে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যায়, হেমেন্দ্রমোহনেরও আগে বাণিজ্যিকভাবে রেকর্ডে গান ধরার সূচনা করেছিলেন কলকাতার এক ঐতিহ্যবাহী বাঙালি প্রতিষ্ঠান 'ডোয়ার্কিন অ্যান্ড সন'। দ্বারকানাথ ঘোষ ১৮৭৫-এ 'ডি. ঘোষ অ্যান্ড সন' নামে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ ও মেরামতের যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন সাহেবি কেতায় ১৮৭৮-এ তার নতুন নাম হয় 'ডোয়ার্কিন অ্যান্ড সন'। এই প্রতিষ্ঠান বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গ্রামোফোন ও রেকর্ডের ব্যবসাও জুড়ে দেয়। এরপর তাঁরা শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভারতে প্রথম সিলিন্ডার রেকর্ড ছাপার উদ্‌যোগ গ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে এক বিজ্ঞাপনে তাঁদের প্রয়াসের কথা জানা যায়। লালচাঁদ বড়াল, পিয়ারা সাহেব, কুসুমকুমারী প্রমুখের নাম পাওয়া যায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডোয়ার্কিনের রেকর্ডের শিল্পী হিসেবে। স্থায়িত্বের মেয়াদ সম্ভবত বছর খানেকের হলেও ডোয়ার্কিন বাঙালি রেকর্ড কোম্পানির সূচনা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এইচ. বোস ছিলেন সুগন্ধ-বণিক। সুগন্ধি-দ্রব্যের ব্যবসায়ে তিনি সারা ভারতে নাম কিনেছিলেন। 'কুন্তলীন' কেশতেল বা 'দেলখোস্' সুগন্ধির উদ্ভাবক এইচ. বোস ছিলেন রুচিশীল সংস্কৃতিবান মানুষ — ছিলেন স্বাপ্নিক-নিরীক্ষাপ্রিয়ও। ১৯০৬ সালের শুরুতেই ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র ও সিলিন্ডার রেকর্ড প্রস্তুত ও বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন কলকাতার ধর্মতলায় মার্বেল হাউসে 'দ্য টকিং মেশিন হল' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এরও আগে ১৯০০ সাল নাগাদ তিনি যখন একটি ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র সংগ্রহ করেন, তখন থেকেই কলের গান ও রেকর্ড তৈরির স্বপ্ন জেগেছিল তাঁর মনে। ফরাসি দেশের প্যাথি কোম্পানির সহায়তায় তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তাঁর তৈরি সিলিন্ডার রেকর্ড অল্পদিনেই সকলের নজর কাড়ে। শুরুতে থিয়েটারের নটী মিস্ নরি, মিস্ বসন্তদের দিয়ে রেকর্ড শুরু করলেও কিছু পরেই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাঁর গান ও কবিতার রেকর্ড করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কণ্ঠও তিনি ধরে রাখেন রেকর্ডে। স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ এইচ. বোস ব্যবসায়িক স্বার্থ উপেক্ষা করে স্বদেশি গানের উপরেই জোর দিয়েছিলেন। 'স্বদেশি রেকর্ড' প্রকাশের তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। এর ফলে তাঁকে পুলিশি-হয়রানি সহ্য ও ক্ষতি-স্বীকারও করতে হয়। অপরদিকে ডিস্ক রেকর্ড চালু হওয়ায় অন্য কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতাতে তিনি পিছিয়ে পড়েন এবং অনুমান ১৯১০-এর পরে 'প্যাথি-এইচ. বোসেজ রেকর্ড' তার অস্তিত্ব হারায়।

'মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জী' ১৯০৬ সালের শেষদিকে 'রয়্যাল রেকর্ড' নামে তাদের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রেকর্ড বের করে। ১৯০৩-এ কলকাতার হ্যারিসন রোডে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রামোফোন ও রেকর্ড-ব্যবসায়ের এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। ১৯০৪-এ তাঁরা নিকোল রেকর্ডের ডিলারশিপ পান। মূলত নিকোল ও অন্যান্য রেকর্ডের ব্যাপক চাহিদা দেখে তাঁরা নিজস্ব রেকর্ড তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হন। 'মুখার্জী অ্যান্ড মুখার্জী'ই প্রথম বাঙালি কোম্পানি, যাঁরা সিলিন্ডারের বদলে ডিস্ক রেকর্ড তৈরি করে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। গওহরজান ও নরীসুন্দরীর মতো সেকালের নামি শিল্পী 'রয়্যাল রেকর্ডে' গান দিয়েছিলেন। 'রয়্যাল রেকর্ড' খুব অল্প সময়েই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯০৮-এর পরে সম্ভবত এই প্রয়াস আর অব্যাহত ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯০৮-এর জানুয়ারিতে 'দ্য বীণাপাণি রেকর্ডিং কোম্পানি'র কারখানা স্থাপন করেন এস.সি. দাস কলকাতার ক্রিক রো-তে। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, 'স্বদেশি রেকর্ড' স্বদেশি উপকরণে স্বদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত। 'স্বদেশি বীণাপাণি রেকর্ড' যে যথার্থই স্বদেশ-চেতনার স্মারক ছিল তার সার্থক প্রতিফলন ঘটে প্রথম প্রয়াস হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' রেকর্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে। কিন্তু নানা সংকটের কারণে কিছুটা সম্ভাবনা জাগিয়েই উঠে যায় 'বীণাপাণি রেকর্ড কোম্পানি'।

'বীণাপাণি রেকর্ডে'র অন্যতম শরিক যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আলাদা হয়ে ওই কোম্পানির স্বদেশি-চেতনার আদর্শেই প্রতিষ্ঠা করেন 'কমলা রেকর্ডিং কোম্পানি'। সেই মর্মে ১৯০৯-এর শুরুতেই কাগজে বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বদেশি 'কমলা রেকর্ড' প্রকাশ পেয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট জানা যায় না।

গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসায়ে বাঙালি মুসলমান প্রায় প্রথম পর্যায় থেকেই যুক্ত ছিলেন। মুসলমান সমাজে গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন দীর্ঘকাল কলকাতাবাসী মীনা পেশোয়ারি নামে একজন অবাঙালি ধনাঢ্য ফল-ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী রাজনৈতিককর্মী। যতোদূর ধারণা করা চলে, ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ কলকাতায় 'শাহানশাহ্ রেকর্ড কোম্পানি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই 'শাহানশাহী' বা 'শাহেনশাহী' লেবেলে কে. মল্লিকের কণ্ঠের গান যেমন রেকর্ড হয়েছিল, তেমনি রাইচাঁদ বড়ালের পিয়ানো-বাদনের রেকর্ডও বেরিয়েছিল এখান থেকে। কতোদিন টিকে ছিল এই কোম্পানি তা জানা না গেলেও কেউ কেউ সাক্ষ্য দিয়েছেন দেশভাগের কিছু পরেও কলকাতায় অন্তত এই কোম্পানির সাইনবোর্ডের অস্তিত্ব ছিল। মালিকানা অবাঙালি ব্যবসায়ীর হলেও এর সঙ্গে মূলত বাঙালি হিন্দু-মুসলমান গায়ক-কলাকুশলীরাই যুক্ত ছিলেন।

তিন

বঙ্গদেশে রেকর্ডিংয়ের প্রথম পর্যায়ে স্বল্পায়ু হলেও বেশকিছু বাঙালি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৯০৯ থেকে ১৯৩১ — এই দীর্ঘ বাইশ বছরে 'শাহানশাহ' ছাড়া অন্য কোনো রেকর্ড কোম্পানির খবর মেলে না। তবে তিরিশের দশক থেকে আবার নতুন আগ্রহ দেখা দিলো এ-বিষয়ে। মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ ব্যবসায়ের তিন ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, চণ্ডীচরণ সাহা ও বিভূতিভূষণ সেন — এঁদেরই নিষ্ঠা ও শ্রমে গড়ে উঠেছিল তিন যুগপ্রবর্তক স্বদেশি রেকর্ড কোম্পানি —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'মেগাফোন' (১৯৩২), 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' (১৯৩২) ও 'সেনোলা' (১৯৩৫)। এরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানির শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল এবং তাদের একচেটিয়া রেকর্ড-ব্যবসার অবসান ঘটিয়েছিল। স্বদেশি কোম্পানিগুলো জনপ্রিয়তার পাশাপাশি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাও পায় — বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় এদের নাম।

চার

'মেগাফোনে'র পরিকল্পক ও প্রতিষ্ঠাতা জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের (জে.এন. ঘোষ) জীবন এক লড়াকু কর্মবীরের জীবন। নিষ্ঠা, শ্রম, অধ্যবসায়, অঙ্গীকার ও দূরদৃষ্টি থাকলে মানুষ কীভাবে একেবারে শূন্য থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, জিতেন ঘোষ তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর জন্ম ১৮৯৬ সালে বরিশালের এক অখ্যাত পল্লীতে। সেখান থেকে কৈশোরেই কলকাতায় আসেন বড়ো হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। না ছিল বিদ্যের জোর — না ছিল আত্মীয়-বান্ধবের আশ্রয় বা পৃষ্ঠপোষকতা। বড়ো হতে গেলে কোনো ছোটো কাজকেই অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য করতে নেই জেনেই সাইকেল-সারাইয়ের কাজ শিখে ১৯১০ সালের ২১ নভেম্বর হ্যারিসন রোডে ছোটোমতো একটি দোকান খোলেন 'জে.এন. ঘোষ কোং' নাম দিয়ে। সাইকেল-মেরামতের পাশাপাশি সাইকেল বিক্রিও শুরু করেন। ধীরে ধীরে গ্রামোফোন-যন্ত্র, রেকর্ড ও বাদ্যযন্ত্রও যোগ হয় এই ব্যবসায়ে। তাঁর প্রতি জিতেন ঘোষের কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। এখানে বলতে হয়, কুপার যখন অবসর নিয়ে বিলেতে চলে যান, তখন তাঁকে বিদায় জানাতে একমাত্র জিতেন ঘোষই দমদম বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, তাঁর এই অগ্রযাত্রায় আন্তরিক সহযোগিতা পান গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের কর্ণধার জর্জ কুপারের। তাঁরই প্রেরণায় জিতেন ঘোষ গ্রামোফোন-রেকর্ড তৈরিতে হাত দেন কিছু অভিজ্ঞতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সম্বল করে। এইভাবেই ১৯৩২-এ ৭১/১ হ্যারিসন রোডের ঠিকানায় জন্ম নেয় মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি। হীরেন বসু 'জাতিস্মর' হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মকথায় জানিয়েছেন : '... আধুনিক মেগাফোন কোম্পানির পিছনের বাড়ির দোতলার ঘরে এক সন্ধ্যায়, মেঝেতে শতরঞ্জি চাদর পাতা শুরু হলো। শতরঞ্জির চারি কোণ ধরলাম আমি, কাজীদা, ধীরেন দাস আর স্বয়ং জিতেনবাবু। এই হলো মেগাফোনের উদ্বোধন'।

'স্বদেশি মেগাফোন রেকর্ডে'র প্রথম যে ক্যাটালগ বের হয় সেপ্টেম্বর ১৯৩২-এ, তাতে 'আমাদের আবেদন' শীর্ষক ভূমিকায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেগাফোনের লক্ষ্য ও অঙ্গীকার সম্পর্কে বলা হয় : 'আমাদের প্রস্তুত 'মেগাফোন রেকর্ড' পরিপূর্ণভাবে স্বদেশজাত। ইহার অর্থ বাঙ্গালীর, মূলধন বাঙ্গালীর, পরিশ্রম বাঙ্গালীর, পরিচালনা বাঙ্গালীর। এক কথায় এই রেকর্ড বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব শিল্পজাত। ... আমাদের এই শিশু-প্রতিষ্ঠান তাই বাঙ্গালীর মুখ চাহিয়াই অসম সাহসের পথে অবতরণ করিয়াছে'। সুখের কথা, বাঙালিসমাজ এই প্রতিষ্ঠানটিকে যোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য দান করেছিল।

অল্পদিনেই মেগাফোনের ভবন নবীন-প্রবীণ, প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীর সমাগমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। নজরুলের কারণে ধীরেন দাসসহ অনেকেই এইচ.এম.ভি. ছেড়ে মেগাফোনে যোগ দেন। হীরেন বসুর সৌজন্যে আসেন কানন দেবী। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আমীর খাঁ, ওস্তাদ এনায়েত খাঁ, ওস্তাদ ছোটে খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, জদ্দন বাই, আখতারি বাই (বেগম আখতার), গোপালচন্দ্র লাহিড়ী, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, কমলা ঝরিয়া, অনন্তবালা বৈষ্ণবী, সামাদ কাওয়ালের মতো গাইয়ে-বাজিয়ের সমাবেশে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে 'মেগাফোন'। সুরসৃষ্টি ও প্রশিক্ষণে নজরুলের পাশাপাশি কাজ করেছেন হীরেন বসু, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, তুলসী লাহিড়ী, কমল দাশগুপ্তের মতো মেধাবী সুরকারেরা। গীতিকার হিসেবে নাম করতে হয় নজরুল, হেমেন্দ্রকুমার রায়, তুলসী লাহিড়ী, অজয় ভট্টাচার্য, গিরীন চক্রবর্তী, সুবোধ পুরকায়স্থ, প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরী, জসীমউদ্‌দীন — এঁদের। নজরুল ও তুলসী লাহিড়ীর ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক।

মেগাফোন থেকে যেমন নজরুলগীতি, আধুনিক কাব্যগীতি, পল্লিগীতি, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, ইসলামি গান, ভজন, টপ্পা, ঠুমরি, খেয়াল, ফিল্মের গানের রেকর্ড তেমনি সরোদ, সারেঙ্গি, বাঁশি, সানাই, — নানা যন্ত্রের রেকর্ডও বেরিয়েছে। আর বাংলার পাশাপাশি অসমিয়া, উড়িয়া, উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি, এমনকি বার্মিজ ভাষার গানের রেকর্ডও প্রকাশ পেয়েছে।

রেকর্ড-নাট্য প্রকাশেও মেগাফোনের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পালা-রেকর্ডের মধ্যে আছে — 'শকুন্তলা', 'মীরকাশিম', 'কর্ণার্জুন', 'সীতাহরণ', 'কালাপাহাড়', 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', 'ষোড়শী', 'মন্ত্রশক্তি', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', বঙ্গে বর্গী', 'খনা', 'রামপ্রসাদ', 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'সোহরাব-রোস্তম', 'শিরি-ফরহাদ' ইত্যাদি। এসব পালা-রেকর্ডের নাট্যকার ছিলেন ডি.এল. রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুরূপা দেবী, মন্মথ রায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, নিশিকান্ত বসুরায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বন্দে আলী মিয়া ও এন. সুলতান। মেগাফোনের এইসব পালা-রেকর্ডে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায়, ছবি বিশ্বাস, তারাসুন্দরী, সরযূবালা, কানন দেবী, প্রভা দেবী, পদ্মাবতীর মতো সেকালের তারকা-শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন। এই পালা-রেকর্ডগুলো আসামান্য জনপ্রিয়তার পাশাপাশি ভালো ব্যবসাও পেয়েছিল।

মেগাফোনের এই সাফল্যের মূলে ছিলেন জিতেন ঘোষ। 'মেগাফোন কোম্পানি'কে তিনি একটি পরিবারে পরিণত করেছিলেন। তাঁর কর্মনৈপুণ্য, দূরদৃষ্টি, মমত্ববোধ, গুণগ্রাহিতা ও ব্যবসা-বুদ্ধির ফলে 'মেগাফোন' হয়ে উঠেছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক গৌরবের এক অনন্য প্রতীক। কানন দেবী তাঁর 'সবারে আমি নমি' স্মৃতিচর্চায় এই মানুষটি সম্পর্কে বলেছেন : 'এই সময় একদিন রেকর্ড করার আহ্বান এলো মেগাফোন কোম্পানী থেকে। সেই সূত্রেই পরিচয় হোল জে এন ঘোষের সঙ্গে। ইনি এক আশ্চর্য মানুষ। শিল্প ও ব্যবসা এ দুটি বস্তুর মধ্যে যে অহিনকুল সম্পর্ক ছাড়াও অন্য সম্পর্ক হতে পারে — এ সম্পর্কে দৃষ্টি ফুটেছিলো তাঁকে দেখেই। কি নিরলস তাঁর শিল্পসেবা! কি সংযম সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরদানে অর্থসমাগমের প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও। ধনী হয়েও এমন নিরভিমানী, সম্মান ও খ্যাতিতে সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েও শিশুর মত সরলতা এবং ঐশ্বর্য্য সমারোহের মধ্যেও বিলাসবর্জিত, অতি সাধারণ বেশভূষার বিনয়ী মানুষ আমি আর দেখিনি।' কানন দেবী ভারি আক্ষেপ করে বিষাদমাখা কণ্ঠে আরো বলেছেন : ' ... এইসব মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সুন্দর যুগের নিষ্ঠুর অবসান ঘটতে বসেছে।' ১৯৫৮-তে মেগাফোনের প্রাণপুরুষ জিতেন ঘোষের মৃত্যুতে শুধু মেগাফোন নয়, বাংলার সংগীত-সংস্কৃতি জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হলো।

পাঁচ

জে.এন. ঘোষের অবর্তমানে মেগাফোন কোম্পানির দায়িত্ব নেন ভাইপো কমলকুমার ঘোষ। কাজের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি জিতেন ঘোষের যোগ্য উত্তরসূরি। কমল ঘোষও রুচিশীল ও সংগীত-সমঝদার মানুষ। নানাভাবে তাঁর মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সংগীত ছাড়াও ফটোগ্রাফি ও ফিল্মেও তাঁর ঝোঁক ছিল। ফটোগ্রাফার হিসেবে একসময়ে *আনন্দবাজার*সহ নানা পত্রিকায় কাজ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছেন। চলচ্চিত্র-অঙ্গনেও তাঁর বিচরণ ছিল উল্লেখ করার মতো। *কিনু গোয়ালার গলি* ও *রজনীগন্ধা* তাঁরই প্রযোজিত ছবি। কে.জি. প্রোডাকসন্সের এইসব ছবির একমাত্র পরিবেশক ছিল মেগা পিকচার্স। তবে বহুদিন আগেই ফটোগ্রাফি ও ফিল্মের জগৎ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এখন তাঁর পুরোপুরি মনোযোগ মেগাফোন কোম্পানির কাজের দিকেই।

কমল ঘোষ কেতাদুরস্ত নিপাট ভদ্রমানুষ। পরনে আদ্দির সাদা পাঞ্জাবি আর মিহি ধুতি। তাঁর গৌরকান্তি চেহারা জুড়ে আভিজাত্যের ছাপ। চলনে-বলনে-পোশাকে-আশাকে সেকালের 'বাবু'র একটা প্রচ্ছন্ন ছাপ যেন খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম পরিচয়ে তাঁকে মিতবাক বলেই মনে হবে — কিন্তু আপাত গাম্ভীর্যের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলে পাওয়া যায় মজলিশি মানুষটিকে। কাজের মানুষ — এক দণ্ডও কাজ ছাড়া দেখিনি তাঁকে। অবশ্য কাজের ফাঁকে কিংবা কিছুটা জিরিয়ে নেওয়ার অবসরে আলাপও চলতে থাকে।

খুব একটা সংকট-মুহূর্তে মেগাফোনের দায়িত্ব বর্তেছিল কমল ঘোষের ওপর। কিন্তু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে সেই পরীক্ষায় উতরে যান। পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ করেন আধুনিক প্রত্যাশাকে। তাঁর সময়েও অনেক খ্যাতিমান শিল্পী এসে জুটেছিলেন মেগাফোনে — এখান থেকে রেকর্ড বেরিয়েছে কিশোরকুমার, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণদাস বাউল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস এবং আরো অনেকের। নট্ট কোম্পানির যাত্রাপালার রেকর্ড বের করে যেন সেই অতীতের পালা-নাটকের যুগকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। নট্ট কোম্পানির 'নটী বিনোদিনী', 'অচল পয়সা', 'মা মাটি মানুষ', 'দেবী' — এইসব যাত্রাপালা ঈর্ষণীয় সমাদর ও সাফল্য পেয়েছিল। লং-প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশেও তাঁর সাফল্য ছিল উল্লেখ করার মতো। ডিস্‌ক রেকর্ডের যুগ শেষ হয়ে যায় আশির দশকেই প্রায়। আসে নতুন প্রযুক্তির ক্যাসেট — তারপর সিডি। হারিয়ে যেতে না দিয়ে মেগাফোনের ভাণ্ডার থেকে তিনি চিরকালের প্রিয় গানকে আবার শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন — সুদৃশ্য মলাটের সিডি-অ্যালবাম বের করেছেন কানন দেবী, কমলা ঝরিয়া, বেগম আখতারের। স্মৃতিকাতর শ্রোতাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন বাংলা গানের সেই স্বর্ণযুগে।

ছয়

কমল ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয়ের বয়স প্রায় বছর দশেক তো হবেই। প্রথম যোগাযোগটা হয়েছিল কমলা ঝরিয়ার ওপরে কাজ করার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্যে তথ্য-জোগাড়ের প্রয়োজনে। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। কলকাতায় গেলে কমলদার সঙ্গে গল্পগুজব করার জন্যে অন্তত একবার যে মেগাফোনের আপিসে ঢুঁ মারবো তাতে কোনো ভুল নেই। একসময় মনে হলো এই গুণী ও কর্মী মানুষটার একটা সাক্ষাৎকার নেওয়া উচিত। প্রস্তাব পাড়তেই উনি বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে হাঁ হাঁ করে হাত উঁচিয়ে বললেন, 'সে কি মশাই, আমি কি কোনো বিখ্যাত লোক যে এইসব সাক্ষাৎকার-টাক্ষাৎকার নেবেন? বাদ দিন মশাই, তারচে' আসুন গল্পগুজব করা যাক!' যাই হোক, অনেক সওয়াল-জবাবের পর শেষপর্যন্ত রাজি হতে হলো তাঁকে — কমল-বনে মত্ত হস্তীর অনুপ্রবেশ ঘটলো। ২০০৭-এর ১ ও ৫ অক্টোবর — এই দুইদিনে কমল ঘোষের দেড় ঘণ্টার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি মেগাফোন কোম্পানিতে তাঁর আপিসঘরে বসে।

আপিসঘরটি হাল আমলের আদলে পরিপাটি করে সাজানো নয়। সবকিছুতেই লেগে আছে পুরনো দিনের ছাপ। সেই পুরনো আসবাব — চারদিকের দেয়ালে বাঁধানো কিছু সেকালের ছবি — প্রাচীন-ক্লান্ত ঘড়ি — কিছু ডিস্‌ক রেকর্ড দেয়ালে একটি কাঁচের ফ্রেমে বন্দি — ক্যাসেট ও সিডির মলাট অন্য দুই দেয়ালে। পুরনো শো-কেস্‌ ও কাঠের আলমারির পাশে একটি বেমানান স্টিল-আলমারি। ভেতরের ঘরে ক্যাসেট ও সিডির লেবেল ও কভার-লাগানোর কাজে কর্মীরা ব্যস্ত। কমল ঘোষের মুখোমুখি প্রবেশ-প্রস্থানের দরোজা দিয়ে দেখা যায় দোতলার সেই আমলের কতো না স্মৃতিভরা রিহার্সেল রুমটি!

এই সাক্ষাৎকার যখন নিয়েছিলাম তখন তাঁর বয়স ছিল ঊনআশি — আর প্রায় তিন বছর পর এটি যখন ছাপা হতে যাচ্ছে তখন বয়স এসে পৌঁছেছে বিরাশিতে। বয়সের ছাপ চেহারায় — একটা ক্লান্তি-অবসাদের চিহ্নও চোখে পড়ে। তবু তাঁর কাজের পৃথিবী থেকে ছুটি নেননি। কী এক নেশা — কী এক স্মৃতির টানে এখনো প্রায় নিয়মিতই মেগাফোনের জীর্ণ পলেস্তারা ওঠা এই বাড়িটা তাঁকে ডেকে নিয়ে আসে।

সাত

কমল ঘোষ কী কারণে যেন নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চান। জানি না, সে কোনো অভিমানে কিনা কিংবা হতে পারে প্রচারবিমুখ স্বভাবের কারণেও! এই বয়সে স্মৃতিও অনেকখানি কমে এসেছে। কখনো কথাবার্তা কিছু অসংলগ্ন — আবার তথ্য-ভ্রান্তি বা স্মৃতিবাধিতাও ধরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়ে। তার কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। যেমন নজরুলের কণ্ঠে মেগাফোনে যে চারটি গান রেকর্ড হয়েছিল সে-গানের বাণী তিনি ভুলে গেছেন। ১২ আগস্ট ১৯৩২-এ প্রকাশিত প্রথম রেকর্ডের গান দুটি ছিল এই — 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়' ও 'পাষাণের ভাঙ্গালে ঘুম'। এরপরে নজরুলকণ্ঠের আরো দুটি গানের রেকর্ড বের হয় — 'কেন আসিলে ভালবাসিলে' ও 'দাঁড়ালে দুয়ারে কে তুমি'। মেগাফোনে বড়ে গোলাম আলী খাঁর প্রথম রেকর্ডের কথা স্মরণ করতে পারেননি কমল ঘোষ, তা হবে — 'মেরে নয়না লাগে' ও 'হো সাহিবে জমাল'। কমল ঘোষ আলাপে বলেছেন এ.কে. ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — মাত্র এই দুইজনেরই স্বকণ্ঠের কথিকার রেকর্ড বেরিয়েছিল। কিন্তু না, 'শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি'র রেকর্ড প্রকাশ পেয়েছিল স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের কণ্ঠে — সেটি ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদের রেকর্ডের অনেক আগে। কোনো কোনো তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে সংশয় জাগে, যেমন — ডা. বিধানচন্দ্র রায় জিতেন ঘোষের সঙ্গে মেগাফোনের বাড়িতে একসময় থাকতেন! কমল ঘোষের স্মৃতিভ্রমের আরো নমুনা আছে — কথা-প্রসঙ্গে একবার বলছেন ওস্তাদ এনায়েত খাঁকে তিনি দেখেননি, আবার অন্য জায়গায় বলছেন তাঁকে দেখেছেন। মেগাফোনের বাড়িতে কানন দেবী থাকতেন কিনা — এই নিয়ে হ্যাঁ, না — দুই ধরনের জবাবই দিয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্মৃতি তাঁকে পুরোপুরি সহায়তা করেনি।

আট

কমল ঘোষের এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশযোগ্য করে তোলার জন্যে কিছুটা সম্পাদনার প্রয়োজন হয়েছে। বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি কিংবা কথার অস্পষ্টতার অংশ বাদ দিতে এবং প্রশ্ন-অনুযায়ী জবাব না দিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে যাওয়ার কারণে প্রশ্নের ধরন বদলাতে হয়েছে। কখনো কখনো কথার খেই ধরিয়ে দিতে হয়েছে। দু-একটি ক্ষেত্রে তথ্যের শূন্য পূরণ না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ বা অর্থহীন হয়ে যায় বলে প্রাসঙ্গিক তথ্য জুড়তে হয়েছে। তবে কোনোমতেই তাঁর মূল বক্তব্যের হেরফের করা হয়নি।

দেড় ঘণ্টার এই আলাপচারিতা ক্যাসেট-রেকর্ডার থেকে লেখন-রূপান্তরের দুরূহ কাজটি করেছেন আমার প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক মাসুদ রহমান। ভূমিকা-লেখার তথ্য-উপাত্তের জন্যে সুরাজ-শ্রুতি-সদনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অমিত গুহের সহায়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় সংগীতরসিক চিত্রকর কাইয়ুম চৌধুরীকে, যিনি এই কাজে আমাকে উদ্বুদ্ধ ও প্রাণিত করেন।

দুই পুরুষের সাধনায় কলের গানের স্বদেশি রেকর্ড কোম্পানি মেগাফোনের একশো বছর পূর্ণ হলো এই বছর (২০১০)। প্রিয় পাঠক! আসুন, ঐতিহ্যের সেই রঙমহলে প্রবেশ করে এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় কর্ণধার কমলকুমার ঘোষের সঙ্গে আলাপচারিতায় শরিক হই।

আবুল আহসান চৌধুরী : কমলদা, মেগাফোন কোম্পানির জন্মের ইতিহাসটা একটু বলুন।

কমলকুমার ঘোষ : মেগাফোন কোম্পানির জন্ম হয়েছিল ১৯১০ সালে। তখন মেগাফোন কোম্পানি তৈরি করতো গ্রামোফোন মেশিন, হারমোনিয়াম — নাম ছিল মেগাফ্লুট, তখন থেকে মানে ১৯১০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত মেগাফোন কোম্পানি এই গ্রামোফোন এবং হারমোনিয়াম তৈরির কাজেই ব্যস্ত ছিল। জিতেন ঘোষ — ১৯৩২ সালেই রেকর্ডিং আরম্ভ করেন এবং প্রথম রেকর্ডটা ছিল ধীরেন দাসের এবং কথা ও সুর ছিল কাজী নজরুল ইসলামের। একদিকে লক্ষ্মীবন্দনা, আরেকদিকে সরস্বতীবন্দনা।

আবুল আহসান : এই যে মেগাফোন কোম্পানির রেকর্ড তৈরির শুরুটা হলো, এর প্রথম পর্যায়ে কারা মেগাফোনের সাথে জড়িত ছিলেন — শিল্পী, কলাকুশলী কিংবা কর্মকর্তা হিসেবে?

কমল ঘোষ : আগেই বলেছি মেগাফোন কোম্পানিতে প্রথম রেকর্ডটা নজরুল — কাজী সাহেবের কথা ও সুরে ধীরেন দাস করেন। দ্বিতীয় রেকর্ড করেছিলেন জ্ঞান দত্ত — 'মজনু আমার দাও গো বিদায়' ও 'ও পিয়ারী লাইলী আমার' এবং তারপরে অনেকেই করেছেন। তার ভিতরে ছিলেন কানন দেবী। এখানে রবীন মজুমদার এবং ভবানীচরণ দাস রেকর্ড করেন। তারপরে ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ে প্রথমেই আছেন ওস্তাদ এনায়েত খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ বেলায়েত খাঁ এবং আরো অনেক শিল্পী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আছেন। তারপর এলেন আখতারী বেগম। তবলা বাজানোর জন্য এসেছিলেন গোলাম আলী খাঁ — যাঁকে আমরা জানতাম বড়ে গোলাম আলী খাঁ বলে। তিনি বেগম আখতারীর সঙ্গেই প্রথম আসেন। বড়ে গোলাম আলী খাঁর প্রথম যে রেকর্ড সেটা মেগাফোন থেকেই বেরিয়েছিল।

আবুল আহসান : জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মেগাফোন কোম্পানি থেকে রেকর্ড বের করার প্রেরণা কীভাবে পেয়েছিলেন?

কমল ঘোষ : প্রথমে ওঁর একটা ছোট্ট গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান ছিল। গ্রামোফোন কোম্পানির তখন জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন জর্জ কুপার — উনি ওঁকে অনুরোধ করেন যে, 'আপনি রেকর্ড কোম্পানি খুলুন। আপনাকে আমরা সবরকমভাবে সাহায্য করবো।' তখন গ্রামোফোন কোম্পানির আব্বাসউদ্দীন আহমদ এবং আরো অনেক শিল্পীকে ওঁরা দিয়েছিলেন। এখন আর আমার নাম মনে নেই। তারপরে আর দরকার হয়নি। পরে তো উনি নিজেই সব করেছেন। মেগাফোন কোম্পানিতে পল্লিগীতির একটা বিরাট জায়গা ছিল। তখনকার দিনে অনন্তবালা বৈষ্ণবীর যেসব রেকর্ড, সমস্ত রেকর্ডই মেগাফোন থেকে বেরিয়েছিল। তারপরে এখন ওঁরা বাংলাদেশে চলে গেছেন — ওসমান খান, মমতাজ আলী খান এঁদের রেকর্ড বের হয়েছে। আরো অনেক পল্লিগীতির শিল্পী ছিলেন, এখন মনে নেই। মেগাফোন কোম্পানির আরেকটা বিরাট দিক ছিল পালা-রেকর্ড, যেটা আমরা বলি ড্রামা-রেকর্ড। তার মেইন কাজের লোক ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, ওস্তাদ হিসেবে ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তারপরে এখানে জ্ঞানেন্দ্রনাথ গোস্বামীর অনেক গান রয়েছে গ্রামোফোনে। সমস্ত গান মেগাফোনেই আছে — অন্য কোথাও নেই।

আবুল আহসান : মেগাফোনের প্রশিক্ষক-ট্রেনার হিসেবে কারা কারা কাজ করেছেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কমল ঘোষ : প্রথমেই কাজী নজরুল ইসলামের নাম বলতে হয়। কাজীদাই মেগাফোনের জন্য অনেক গান — প্রচুর গান উনি এখানে বসে লিখেছেন, এখানে সুর করেছেন, এখানে শিল্পীদের গান শিখিয়েছেন এবং গান করিয়েছেন। তারপরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় — উনিও এখানে মেইন ট্রেনার হিসেবে ছিলেন। পরে এখানে কমল দাশগুপ্ত, রবীন চ্যাটার্জি, ভবানী দাসের ট্রেনিংয়েও অনেক গান রেকর্ড হয়েছিল। তারপরে যাঁরা এসেছেন — সুধীন দাশগুপ্ত বলুন, নচিকেতা ঘোষ বলুন, সলিল চৌধুরী বলুন, এঁদের প্রথম রেকর্ড মেগাফোনই বের করেছিল। সলিল চৌধুরী অনেক গান এখানে ট্রেনিং দিয়েছেন, আবার গানও লিখেছেন।

আবুল আহসান : মেগাফোনের জন্যে অনেকেই তো গান লিখেছেন। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কাদের নাম মনে পড়ে?

কমল ঘোষ : প্রথমেই বলতে হবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম। তারপরে বলতে হবে শৈলেন রায়, তারপরে বলতে হবে সুবোধ পুরকায়স্থ, তারপরে বলতে হবে মোহিনী চৌধুরীর নাম। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গান — তাঁর প্রথম গান উনি মেগাফোনেই লিখেছিলেন। তারপরে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। আরো অনেকেই গান লিখেছেন। আমার এখন ঠিক মনে নেই।

আবুল আহসান : সেকালে মেগাফোন কোম্পানিকে কেন্দ্র করে এখানে নিশ্চয়ই সংগীতশিল্পীদের — কলাকুশলীদের একটা আড্ডা বা মজলিশও গড়ে উঠতো। হয়তো তারই টানে অন্যেরাও এখানে আসতেন। সেই সম্পর্কে কিছু বলবেন?

কমল ঘোষ : আপনি যেটা বললেন সে-কথায় আমি ঠিক রাজি নই। আড্ডা ছিল না এখানে, এখানে শিল্পীকে তৈরি করা হতো এবং তার জন্যে প্রচুর খাটা হতো। এক-একটা গান এক মাস পর্যন্ত রিহার্সেল করানো হতো। যাঁরা এখানে রেকর্ডিং দেখাশোনা করতেন তাঁরা যদি সন্তুষ্ট না হতেন তা হলে আবার গান শেখানো হতো। এখানে ট্রেনিং দেওয়াটা খুব ভালোভাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হতো। যেসব শিল্পীকে এখন দেখছেন, অনেকে গান করে বেড়াচ্ছেন — তাঁদের বেশিরভাগকে এই মেগাফোনই তৈরি করেছে।

আবুল আহসান : মেগাফোনের সঙ্গে তো কমলা ঝরিয়া — তুলসী লাহিড়ী — এঁরাও জড়িত ছিলেন। এঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

কমল ঘোষ : তুলসী লাহিড়ীর বহু গান — ওঁর ট্রেনিংয়ে বহু গান কমলা ঝরিয়া করেছেন। কমলা ঝরিয়া এখানে অনেক হিন্দি, পাঞ্জাবি গীতও করেছিলেন। কমলা ঝরিয়া একজন অসাধারণ শিল্পী। তুলসী লাহিড়ী প্রচুর গান লিখেছিলেন। ওঁর জন্য এবং আরো কারো কারো জন্যেও লিখেছিলেন। তুলসী লাহিড়ী এখানে একটা পালা-রেকর্ড করেছিলেন — সেটার নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া', তার ভেতরেও কমলা ঝরিয়ার গান ছিল। এখন আমাদের কাছে নেই। তখনকার দিনে শুনেছিলাম, একটা খুব ভালো রেকর্ড হয়েছিল।

আবুল আহসান : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেগাফোন কোম্পানির সম্পর্কের বিষয়ে কি কিছু বলবেন?

কমল ঘোষ : রবীন্দ্রনাথ মেগাফোনে এসেছিলেন এবং একবারই।

আবুল আহসান : এই বাড়িতেই নাকি?

কমল ঘোষ : এই বাড়িতেই। এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম যেটা ছবির গান সেটা মেগাফোনই বের করেছিল। গানটা হলো — 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে', অপরপিঠে ছিল — 'তার বিদায় বেলার মালাখানি'। তখন বিশ্বভারতী ফরম্ করেনি, গান দুটো কানন দেবী গেয়েছিলেন। *মুক্তি* — ছবির এই নামটাও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। সেই ছবির গান উনি নিজে শুনে অ্যাপ্রুভ্ করেছিলেন।

আবুল আহসান : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহলে মেগাফোন কোম্পানির একটা যোগাযোগ ছিল!

কমল ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের সাথে অনেকবারই — আমাদের মেগাফোন কোম্পানির যিনি প্রতিষ্ঠাতা — জে.এন. ঘোষ দেখা করেছেন। তিনি যেতেন ওঁর ওখানে —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জ্যাঠামশাই আর কি আমার! কাগজপত্র, চিঠি চালাচালি দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের সাথে জে.এন. ঘোষের একটা সম্পর্ক ছিল।

আবুল আহসান : রবীন্দ্রনাথ মেগাফোন কোম্পানিতে তাঁর গান বা আবৃত্তি এসব কি রেকর্ড করেছেন?

কমল ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের গান-আবৃত্তি রেকর্ড করা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের কণ্ঠে নেই।

আবুল আহসান : নজরুল তো মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এখানে তিনি প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন — গান লিখেছেন এবং তাঁর কণ্ঠের গান এখানে রেকর্ডও হয়েছে। এই বিষয়টি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।

কমল ঘোষ : ওঁর নিজের গাওয়া চারখানা গান এখানে রেকর্ড হয়েছে। পরে আমি যখন এখানে এলাম তখন দু'খানা গান সংগ্রহ করে বের করতে পেরেছি। আর দু'খানা পারিনি।

আবুল আহসান : গান দু'খানার কথা কি মনে পড়ে?

কমল ঘোষ : না, কথাটা আমার এখন ঠিক মনে নেই।

আবুল আহসান : সেকালে মেগাফোন কোম্পানিকে কেন্দ্র করে সংগীতজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং বলা চলে স্বদেশি রেকর্ড তৈরিতে মেগাফোন কোম্পানি একটা বিপ্লব এনেছিল। সেই সময়ে এই ব্যাপারটা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া বা প্রেরণা জাগিয়েছিল গানের ভুবনের শ্রোতা-শিল্পীদের মনে?

কমল ঘোষ : যথেষ্ট ভালো এবং সেই সময়ে একটা রেকর্ড বের করেছিলেন মেগাফোনের কর্ণধার জে.এন. ঘোষ সাহেব — ভবানী দাসের 'বন্দে মাতরম্', যেটা সারা ভারতবর্ষে একটা আলোড়ন ফেলেছিল। এবং তখন উনি এমন সব রেকর্ড করেছিলেন যার অনেকগুলো গান ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেন্সর করে বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে সেগুলো আমি আবার বের করেছি। যেমন, 'শহিদ ক্ষুদিরাম', 'বিপ্লবী কানাইলাল' — এগুলো তখন বন্ধ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : পালা?

কমল ঘোষ : এগুলো পালা-রেকর্ড।

আবুল আহসান : কার লেখা?

কমল ঘোষ : এটা নরেশ চক্রবর্তীর লেখা ছিল।

আবুল আহসান : মেগাফোন কোম্পানির প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসময়ে কিংবা তার কিছু পরে আরো কয়েকটি স্বদেশি গ্রামোফোন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলেন।

কমল ঘোষ : স্বদেশি বলতে গেলে একটাই — মেগাফোন কোম্পানি। আর কোনো কোম্পানি ছিল বলে এরকম নাম আমি জানি না। তবে সেই সময় কয়েকটা রেকর্ড কোম্পানি আরো তৈরি হয়েছিল মেগাফোন কোম্পানির সমসময়ে — হিন্দুস্থান কোম্পানি, অনেক পরে সেনোলা, তারপরে পাইওনিয়ার, ভারত — এই কোম্পানিগুলো।

আবুল আহসান : ব্যবসার দিক থেকে মেগাফোন কি এদের উপরে ছিল?

কমল ঘোষ : সে কথাটা আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে মেগাফোন গ্রামোফোনে তখন যাঁরা রেকর্ডের কাজ করতেন তাঁদের রেকর্ড ভালো বিক্রি হতো। এছাড়া মেগাফোন ছিল টুইন রেকর্ডের সোল ডিস্ট্রিবিউটর, আরো কয়েকজনও ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন টুইন রেকর্ডের — তবে যে ক'টা প্রাইজ বেরিয়েছিল সব কয়টা প্রাইজই জে.এন. ঘোষ জিতে নিয়েছিলেন।

আবুল আহসান : মেগাফোনের যিনি প্রতিষ্ঠাতা — জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ — তাঁর সম্পর্কে আজকের দিনে যাঁরা গানের মানুষ কিংবা সংগীতপ্রেমী — বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানেন না। এই প্রচারবিমুখ অন্তরালের মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাইপো হিসেবে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।

কমল ঘোষ : অভাবের মধ্যে বড়ো হয়েছেন এবং এই গানের ব্যবসায় আসার পেছনে ওঁর মনের ভিতরে কী ভাব ছিল সেটা তো আমি জানি না। কেননা আমি জন্মাবার আগে থেকেই মেগাফোন কোম্পানি তৈরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেছে। ওঁর অসাধারণ একটা প্রতিভা আমরা দেখেছি। আমি নিজে দেখেছি তিনি গান এবং ড্রামা — এইগুলো অসাধারণ বুঝতেন। হিন্দি রেকর্ড বা উড়িয়া রেকর্ড, উর্দু এগুলোর উনি অনায়াসে লেবেল লিখতে পারতেন। উনি খুব বেশিদূর পড়াশোনা করেননি, কিন্তু ওর এই প্রতিভা আমরা দেখেছি — উনি গান শুনে বলতে পারতেন কোন গানটা কতো বিক্রি হবে।

আবুল আহসান : জে.এন. ঘোষের জন্ম-জন্মস্থান — এসব বিষয়েও আমাদের আগ্রহ আছে জানার।

কমল ঘোষ : বাংলাদেশের বরিশালের গাভা গ্রামে ওঁর বাড়ি ছিল। সেখানেই জন্ম।

আবুল আহসান : কোন মহকুমায়?

কমল ঘোষ : গাভা গ্রাম, এইটুকুই আমি জানি।

আবুল আহসান : কোন সালে ওঁর জন্ম?

কমল ঘোষ : আমি এখন ঠিক বলতে পারছি না।

আবুল আহসান : ওঁর শেষজীবনের কথা যদি কিছু বলেন।

কমল ঘোষ : এই সম্বন্ধে বলতে গেলে খুব খারাপ লাগে। শুধুই কাজ করতেন এবং আমরা যখন দেখেছি শেষজীবনে ওঁর চোখে চশমা খুব একটা দরকার হতো না। কখনো খবরের কাগজ পড়তে-টড়তে গেলে উনি চশমা পরতেন — না হলে এমনি খালি চোখেই উনি সব কাজ করতেন। যখন এখানে রায়ট হলো ১৯৪৬ সালে, তখন আমাদের দুটো দোকান ধরমতলায় লুট হলো এবং আমাদের অনেক ছবি, গান সব ছাপা ছিল রেকর্ডে — তার মধ্যে নামকরা ছবি হচ্ছে 'অ্যারাবিয়ান নাইট', 'ফয়সালা', 'কৃষ্ণলীলা' — সমস্ত রেকর্ড, কানন দেবীর সব গান ছাপা ছিল, সেই সময় রায়টে সমস্ত লুট হয়ে গেল। ওঁর চোখের ভিতরে ব্লাডপ্রেশারটা একটু বেশি ছিল কিনা তা আমার ঠিক জানা নেই। চোখের ভিতরে — ভিশনের ভিতরে রক্ত উঠে, রক্তটা জমে উনি রাতারাতি অন্ধ হয়ে গেলেন। তারপরে যে ক'বছর, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত, উনি বেঁচে ছিলেন, ২৮ আগস্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু হয় — শেষদিন পর্যন্ত উনি কিন্তু কাজে থেমে থাকেননি। কাজ করে গেছেন। ওঁর একটু বাতের ব্যাপার ছিল। কিন্তু উনি অনেক কষ্ট করে অফিসে আসতেন। মৃত্যু হওয়ার পনেরো দিন আগেও কাজ করে গেছেন। এটুকু আমার মনে আছে।

আবুল আহসান : বয়স কেমন হয়েছিল মৃত্যুর সময়ে?

কমল ঘোষ : বাষট্টি বছর।

আবুল আহসান : আমরা মেগাফোন কোম্পানির সেই পুরনো দিনের হারানো স্মৃতি উদ্ধার করার চেষ্টা করছি শ্রদ্ধেয় কমল ঘোষের স্মৃতিচারণের ভেতর দিয়ে। আচ্ছা কমলদা, মেগাফোন কোম্পানির হাল প্রতিষ্ঠাতা জে.এন. ঘোষের মৃত্যুর পর ১৯৫৮ সাল থেকে কে ধরলেন?

কমল ঘোষ : আমি আরম্ভ করলাম কাজ করতে। মানে উনি শেষজীবনে যখন কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন তখন সেই সময়টাতে কাজ বন্ধই ছিল। তারপর আমি আবার নতুন করে আরম্ভ করলাম এবং আজ পর্যন্ত করে যাচ্ছি। ১৯৫৮ সালের পর থেকে অনেক রেকর্ড আমি বের করেছি — ওঁর কাছে আমি যতোটুকু শিখেছি, সেটাকেই পাথেয় করে নিয়ে আমি আজ পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছি।

আবুল আহসান : কমলদা, আপনার জন্ম কোন সালে এবং কোথায়?

কমল ঘোষ : ১৯২৯ সালে, কলকাতার বালিগঞ্জের হিন্দুস্তান পার্কে।

আবুল আহসান : তারিখটা মনে পড়ে?

কমল ঘোষ : এইটথ্ নভেম্বর নাইনটিন টোয়েন্টিনাইন। এখন আমার বয়স আটাত্তর বছর কমপ্লিট করে উনআশিতে পড়লো। এখনো আমি কাজ করে যাই। ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠি এবং রাত্রি সাড়ে দশটায় শুই। কখনো এক মিনিট বসে থাকি না।

আবুল আহসান : আপনার জ্যাঠামশাই জে.এন. ঘোষের পরে আপনি মেগাফোনের এই যে দায়িত্ব পালন করছেন, এর যে প্রস্তুতি বা শিক্ষা সেটি কি আপনি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন?

কমল ঘোষ : আমি ওঁর সঙ্গেই আসতাম এবং এসে আমি আবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধরমতলার দোকানে চলে যেতাম। কিন্তু এই রেকর্ড-ব্যবসা, রেকর্ড-করা এটা আমি কমই দেখেছি। কিন্তু আমি ঐ গানটান শুনে যেভাবে দেখেছি সেইভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। আজকে পঞ্চাশ বছর তো হতে চললো!

আবুল আহসান : মেগাফোনের সব রেকর্ডিং কি এই বাড়িতেই হতো?

কমল ঘোষ : এখানেও হতো, দমদমেও হতো, আবার বালিগঞ্জে আমাদের মেগাফোন স্টুডিওতেও হতো।

আবুল আহসান : বালিগঞ্জের মেগাফোন স্টুডিও এখন কী অবস্থায় আছে?

কমল ঘোষ : সেভাবেই আছে। মনোরেকর্ড বলে সেখানে আর রেকর্ডিং হয় না। এখন ডিজিটাল রেকর্ড হয় বলে — অন্য পদ্ধতিতে রেকর্ড হয় বলে ঐ স্টুডিও বন্ধই আছে।

আবুল আহসান : আপনি নিজে মেগাফোনের এই রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে জড়িত আছেন সেই ১৯৫৮ সাল থেকে। এখন তো ক্রমশ প্রযুক্তির বিবর্তনের পথ ধরে ডিস্‌ক রেকর্ডের যুগ পেরিয়ে ক্যাসেট এবং তারপর হালে সিডিতে পৌঁছে গেছে। এই যে বিবর্তন — রেকর্ড থেকে সিডি — এই বিষয়ে মেগাফোনের ভূমিকা এবং মেগাফোনের উদ্যোগ, সে সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাচ্ছি।

কমল ঘোষ : আমরা যুগের সঙ্গে চলি। তখন ডিস্‌ক রেকর্ড ছিল — তাই আমরা জানতুম। পরে যখন লংপ্লেইং রেকর্ড এলো সেই ভালো। তারপরে ক্যাসেট এলো, সেটা লোকের পছন্দ হলো মানে আমাদেরও পছন্দ হলো, সেটাও ভালো। এখন রেকর্ডের সিডি এসে গেছে, সে-ও ভালো। এরপরে আর কী আসবে — আমি আর কতোদিন দেখতে পাবো আমি জানি না। তবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেগুলো সকলে ভালো বলছে, আমিও সেটাকে ভালো বলি। আমার আলাদা মতামতের কোনো দাম নেই।

আবুল আহসান : মেগাফোনের লেবেলে যে হরিণের ছবি থাকতো এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনোগ্রাম সম্পর্কে আমাদের একটু জানতে আগ্রহ হয়। হরিণের ছবি কেন এলো?

কমল ঘোষ : এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারবো না। কারণ আমি জন্মাবার আগেই রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক চলে আসছে এই হরিণের। সেই ট্রেডমার্ক এখনো চলছে।

আবুল আহসান : বনিবনা না হওয়ায় মঞ্চজগতের বিখ্যাত মানুষ শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে একসময় এইচ.এম.ভি.-র সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং তিনি মেগাফোনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি এইচ.এম.ভি.-র কুকুর মার্কা এবং মেগাফোনের হরিণ মার্কা প্রতীক সম্পর্কে মনে হয় কিছু একটা মন্তব্য করেছিলেন আপনার কাছে — এ-রকম শোনা যায়। সে কি আপনার মনে পড়ে?

কমল ঘোষ : আমরা এগুলো শুনেছি। উনি পণ্ডিত লোক ছিলেন, অসাধারণ শিক্ষিত লোক ছিলেন। কিন্তু আমি জানি একমাত্র মেগাফোনেই ওঁর পালা-রেকর্ড রয়েছে।

আবুল আহসান : মেগাফোন কোম্পানির সেই পুরনো যুগের কথা, পুরনো দিনের কথা — আপনি কিছু জেনেছেন, কিছু শুনেছেন। আপনার সেই স্মৃতি থেকে সেকালের সংগীতশিল্পী যাঁরা এখানে গান রেকর্ড করেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিখ্যাত দু'একজনের বৈশিষ্ট্য ও গায়কী সম্পর্কে যদি কিছু বলেন!

কমল ঘোষ : বলতে হয় আখতারী বাইয়ের কথা। জ্যাঠামশাই একবার কোথায় যেন গেছিলেন। পাশের বাড়িতে উনি রেওয়াজ করছিলেন। ওঁর গান শোনার পরে রেকর্ডিংয়ের জন্য — এখানে যিনি ম্যানেজার ছিলেন — তাঁকে পাঠিয়ে ওঁকে নিয়ে আসেন। বহুদিন উনি এখানে তালিম নিয়েছেন। অনেক জায়গায় দেখেছি, যখন উনি জলসায় গান করতেন, যে কোনো জায়গায়, জ্যাঠামশাইয়ের ছবি বের করে নমস্কার করে তারপর গান করতেন। যখন জ্যাঠামশাই মারা গেছেন উনি এসেছেন। এরকম সব শিল্পীকেই মেগাফোনে আমি দেখেছি সকাল থেকে উঠে রেওয়াজ করতেন। [illegible]াদ এনায়েত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খাঁকেও দেখেছি, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকেও দেখেছি। সকাল থেকে ওরা মানে যেটা আমাদের নাশ্‌তা বলে সেটা খেয়ে রেওয়াজ আরম্ভ করতেন। তারপরে যতোক্ষণ না কমপ্লিট হতো কেউ খেতেন না। এবং আমি যখন ছোটোবেলায় ছুটিতে এখানে আসতাম আমিও তখন আর কিছু খেতে পেতাম না।

আবুল আহসান : কানন দেবী সম্পর্কে —

কমল ঘোষ : কানন দেবীও এখানে রেওয়াজ করতেন এবং অনেকদিন এখানে ছিলেনও উনি। শিল্পীদের থাকবার এখানে জায়গা ছিল। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর ছিল। একটা বিরাট ঘর ছিল, সেখানে সকলের রান্নাটান্না হতো — মনে পড়ে আর কি! এ সমস্ত এখন আর নেই।

আবুল আহসান : মেগাফোনের শিল্পীদের মধ্যে কাদের রেকর্ডের কাটতি ভালো ছিল?

কমল ঘোষ : সকলেরই ভালো বিক্রি হতো। তার ভিতরে খুব নাম করেছিলেন কানন দেবী। কানন দেবীর গানের রেকর্ড অসাধারণ বিক্রি হতো। বেগম আখতারের কতগুলো রেকর্ড তো সুপারহিট, সকলেই জানেন। তার মধ্যে 'দিওয়ানা বানানা হ্যায় তো দিওয়ানা বানা দো' লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। যেমন কানন দেবীর 'আমি বনফুল গো' ও আরো অনেক গানের কথা মনে পড়ে।

আবুল আহসান : কমলা ঝরিয়ার বিখ্যাত যেসব গান তার মধ্যে আপনার মনে পড়ে কোনগুলোর কথা?

কমল ঘোষ : 'কাতরা রাধিকা দেখিয়া অধিকা' বলে একটা গান ছিল — খুব হিট। কমলা ঝরিয়ার প্রচুর গান হিট — আমার ঠিক এখন আর মনে পড়ে না, তবে 'ধিক ধিক তোরে নিঠুর কালিয়া' এবং আরো কিছু গান ছিল ওঁর — 'ময়ঁ দিলকে লাকে' বলে পাঞ্জাবি গান, সেটাও অসাধারণ বিক্রি হয়েছিল।

আবুল আহসান : আর এমনি যে উচ্চাঙ্গসংগীত বা ধ্রুপদীসংগীতের রেকর্ড বা ঠুমরি-খেয়াল — এগুলোর রেকর্ড কাদের বেশি বিক্রি হতো?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কমল ঘোষ : ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী।

আবুল আহসান : ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁও তো এখানে ট্রেনার ছিলেন।

কমল ঘোষ : ট্রেনার ছিলেন কিনা আমার জানা নেই, তবে ওঁর অনেকগুলো গানের মেগাফোনে রেকর্ড আছে।

আবুল আহসান : সেগুলো চলতো কেমন?

কমল ঘোষ : ভালোই চলতো। তার মধ্যে 'সইয়াঁ এক বেরি আজা' খুব ভালো রেকর্ড ছিল।

আবুল আহসান : কাজী নজরুল ইসলামকে কি আপনি দেখেছেন?

কমল ঘোষ : দূর থেকে দেখেছি — আবার সামনাসামনিও দেখেছি। আমার জন্মদিনে উনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমার নাম তো কমল ঘোষ — উনি রেখেছিলেন কামাল ঘোষ। আমার জ্যাঠামশাইয়ের নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, বাবার নাম ছিল দিগেন্দ্রনাথ ঘোষ। আমার নাম রেখেছিলেন ওঁরা খগেন্দ্রনাথ ঘোষ। নজরুল বললেন, 'এর নাম কামাল ঘোষ করে দাও'। রবীন্দ্রনাথ পরে নামটা একটু বদল করে দিয়ে বলেন, 'এর নাম কমল ঘোষ'।

আবুল আহসান : আপনার নামকরণের সঙ্গে তো তাহলে দুই বিখ্যাত কবির স্মৃতি জড়িয়ে আছে! কামাল ঘোষ হয়ে গেলেন কমল ঘোষ! নজরুলকে মেগাফোনের বাড়িতে দেখার স্মৃতি কি কিছু মনে আছে?

কমল ঘোষ : আমি বড়ো হয়ে যখন এখানে এলাম তখন কাজীদাকে দেখেছি বলে আমার মনে নেই। ছোটো বয়সে আমি দেখতাম এখানে এসে ওঁর ঘরে উনি চলে যেতেন এবং ওখানে গিয়ে ওঁর একটা বীণা ছিল সেটা নিয়ে উনি বসতেন। তারপরে কিছুক্ষণ বাদে কখনো কখনো ঐ বীণাটা বাজিয়ে গান লিখতেন। বীণা, না ওটা তানপুরা, ঠিক আমার মনে নেই — তবে লম্বা মতো একটা যন্ত্র ছিল। তারপরে ওঁকে আমি দেখেছি আমাদের বাড়িতে।

আবুল আহসান : নজরুল ইসলাম যেসব যন্ত্রের সাহায্যে এখানে গান করতেন বা শেখাতেন সেসব যন্ত্র কি এখনো আছে — তাঁর ব্যবহারের আসবাবপত্র?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কমল ঘোষ : সেগুলো আছে এখনো। সেসব হারমোনিয়াম আছে আমাদের কাছে। হারমোনিয়াম উনি বাজিয়ে গান রেকর্ড করতেন।

আবুল আহসান : নজরুলের সঙ্গে এই মেগাফোন কোম্পানিতে কোন শিল্পীর বেশি সখ্য এবং সৌহার্দ্য ছিল?

কমল ঘোষ : যতোটুকু খাতাকলমে পাই, তার মধ্যে ভবানী দাসের সঙ্গে সম্পর্ক বেশি ভালো ছিল। সকলের সাথেই ওঁর একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সম্পর্ক খুব ভালোই ছিল। এসব আমার মনে পড়ে।

আবুল আহসান : আর মহিলা শিল্পীদের মধ্যে কার কার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল?

কমল ঘোষ : মনে নেই — এখন আর আমার মনে নেই।

আবুল আহসান : এখানে তো অনেক নামি মহিলা শিল্পী ছিলেন — কানন দেবী, কমলা ঝরিয়া, বেগম আখতার — এরকম আরো দু'চারজন। এঁদের কার সঙ্গে নজরুলের বেশি মিলমিশ ছিল বলে আপনার মনে হয়?

কমল ঘোষ : আমার এখন ঠিক সেগুলো মনে পড়ছে না কিছুতেই। তবে কানন দেবীর সঙ্গে হতে পারে। আমার দুটো গান মনে পড়ে, কানন দেবী করেছিলেন। ছবির নাম *সাপুড়ে*, গল্পটা ওঁরই লেখা। এই গান দুটোও ওঁর লেখা, একটা — 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই', আরেকটা কী যেন — হ্যাঁ-হ্যাঁ, 'কথা কইবে না বউ'।

আবুল আহসান : মেগাফোন কোম্পানিতে আপনি তো ছেলেবেলা থেকেই আসছেন, পরে তো নিজেই দায়িত্ব নিলেন। এখানকার খুব উল্লেখযোগ্য কিছু স্মৃতি — সেটা আনন্দের হোক, বেদনার হোক — দুঃখের হোক — আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।

কমল ঘোষ : জ্যাঠামশাইয়ের চলে যাওয়াটাই আমার কাছে খুব দুঃখের। এর বাইরে আর কিছু নেই। তাঁর যা কাজ — যা স্বপ্ন, সেইটে নিয়েই আমি এখনো কাজ করে যাচ্ছি। এখানে যতো শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁরা সকলে এতো ভালো যে খুব আনন্দ পেয়েছি আজ পর্যন্ত কাজ করে।

আবুল আহসান : মেগাফোনের প্রতিষ্ঠাতা জে.এন. ঘোষ তিনি যে কাজটি শুরু করেছিলেন সেটি দুরূহ ছিল, কিন্তু তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা এবং প্রতিভা-শ্রমের ভিতর দিয়ে। তো জে.এন. ঘোষ সম্মাননা-স্বীকৃতি কেমন পেয়েছিলেন?

কমল ঘোষ : ভালোই পেয়ে গেছেন — যথেষ্টই। তাঁকে তো প্রত্যেকটা শিল্পীই সম্মান করতো।

আবুল আহসান : তা না, বলছি যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো সম্মান-স্বীকৃতি উনি পেয়েছেন কিনা? কোনো প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মান-স্বীকৃতি জানিয়েছে কিনা?

কমল ঘোষ : না, সেরকম কিছু পাননি।

আবুল আহসান : আপনার এই আপিসঘরে একটি ছবি দেখছি — তাতে অনেকগুলো স্মারক সামনে নিয়ে জিতেন ঘোষ বসে আছেন। এগুলো কিসের স্মারক?

কমল ঘোষ : ওঁর ব্যবসা ছিল রেকর্ডের। টুইন রেকর্ডের ডিলার ছিলেন এবং গ্রামোফোন কোম্পানিকে খুব ভালো ব্যবসা দিয়েছিলেন। তার জন্য ওই প্রাইজগুলো উনি পেয়েছিলেন।

আবুল আহসান : কাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন?

কমল ঘোষ : গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে।

আবুল আহসান : জে.এন. ঘোষ তো বরিশালের মানুষ। আর অবিভক্ত বাংলার একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন সেই শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের বাড়িও বরিশালে। শুনেছি ওঁর সঙ্গে জে.এন. ঘোষের বেশ খাতির ছিল। এই বিষয়ে আপনি যদি আমাদের কিছু বলতে পারেন!

কমল ঘোষ : খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল। ভালো সম্পর্ক ছিল। ওঁর একটা ভয়েস মেগাফোনে রেকর্ড করাও আছে — 'বাংলার কৃষি' সম্পর্কে।

আবুল আহসান : 'বাংলার কৃষি' সম্পর্কে ফজলুল হকের ভাষণের যে রেকর্ড বেরিয়েছিল, সেটি কি পরে আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করেছেন?

কমল ঘোষ : না, সেটা আর করা হয়নি।

আবুল আহসান : এই যে ফজলুল হকের সঙ্গে জে.এন. ঘোষের ঘনিষ্ঠতা — সেই সম্পর্কের সূত্রে ফজলুল হক এখানে যখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন — তো ব্যবসায়িক দিক দিয়ে কোনো ধরনের আনুকূল্য বা সুবিধা পাওয়ার কি সুযোগ ঘটেছে?

কমল ঘোষ : জে.এন. ঘোষের সঙ্গে অনেকেরই ভালো সম্পর্ক ছিল। জে.এন. ঘোষ কোনোদিনও কারো কাছে কোনো সুযোগ নেননি, আমি যতোটুকু জানি। নেওয়ার ইচ্ছেও ছিল না। উনি কোনো দরকার মনে করেননি। বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। দু'জনা একই ঘরে এই মেগাফোনের বাড়িতেই একসময়ে থাকতেন। তারপরে উনি অতো বড়ো ডাক্তার হওয়ার পরে কিংবা উনি যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন, তখন ওঁর কাছেও কোনো প্রয়োজনে যাননি।

আবুল আহসান : আপনি বললেন যে, বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক সাহেবের 'বাংলার কৃষি' বিষয়ে একটি ভাষণ মেগাফোন থেকে রেকর্ড হয়েছিল। এই ধরনের আর কারো ভাষণ বা বক্তৃতা কি মেগাফোন রেকর্ডে আপনারা ধরে রেখেছেন?

কমল ঘোষ : শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি রেকর্ড এখানে করা হয়, সেটি 'বাংলার শিক্ষা' সম্বন্ধে। এটা আমরা পরেও বের করেছিলাম।

আবুল আহসান : সেটা কি উনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন — সেই সময়ের?

কমল ঘোষ : হ্যাঁ, সেই সময়কার রেকর্ড।

আবুল আহসান : আর কারো ভয়েস আপনারা রেকর্ড করেছিলেন?

কমল ঘোষ : না, এরকম আর কারো নেই।

আবুল আহসান : সময় তো অনেক পেরিয়ে গেছে। দীর্ঘ সময় পাড়ি দিয়েছে মেগাফোন কোম্পানি। আপনি নিজে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে প্রায় পঞ্চাশ বছর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জড়িত আছেন। এই মেগাফোন কোম্পানিকে কেন্দ্র করে পেছনের দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আপনার কী অনুভূতি জাগে মনে?

কমল ঘোষ : খারাপ লাগে। কেননা পুরনো দিনের সেই সমস্ত গান, সেইসব পালা-রেকর্ড আজ আর তার কোনো চাহিদা নেই। কেন নেই — তার কারণ হচ্ছে এখন ভিসিডির যুগ এসে গেছে। লোকে তো এখন ছবি দেখতে চায়। ওকে আর ধরে রাখা বেশিদিন সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। যতোই নতুন কিছু আসবে ওগুলো আর থাকবে না। পুরনো রেকর্ড সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ হারিয়ে যাবে।

আবুল আহসান : আপনি তো বললেন, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ আখতারী বাইয়ের সঙ্গে এসেছিলেন তবলচি হিসেবে, শেষ পর্যন্ত তো উনি রেকর্ডে কণ্ঠও দিয়েছেন। সেই রূপান্তরটা কেমন করে হলো এবং সাড়াটা কেমন পেয়েছিলেন?

কমল ঘোষ : বড়ে গোলাম আলী খাঁর প্রথম রেকর্ডটাই মেগাফোনে ছিল। ওঁর কণ্ঠটা খুব ভালো ছিল এবং তবলচি হিসেবে এসেছিলেন, না হারমোনিয়াম-বাদক হিসেবে এসেছিলেন সেটা আমার ঠিক এখন মনে পড়ছে না, তবে আমি কয়েকটা রেকর্ডে দেখেছি উনি হারমোনিয়ামও বাজিয়েছিলেন। তবে ওঁর কণ্ঠটা বেশি ভালো বলে জ্যাঠামশাইকে বেগম আখতার অনুরোধ করাতেই ওঁর রেকর্ড করা হয়েছিল। তারপরে উনি অনেক রেকর্ড করেছেন। আপনারা সকলেই তো জানেন যে ওঁর অনেক ভালো ভালো গান রয়েছে।

আবুল আহসান : প্রথম রেকর্ডটা কী ছিল মনে পড়ে?

কমল ঘোষ : না, গানটা মনে নেই।

আবুল আহসান : জগন্ময় মিত্র কি মেগাফোনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কোনো পর্যায়ে?

কমল ঘোষ : না, জড়িত ছিলেন না।

আবুল আহসান : সেকালের গীতিকারদের মধ্যে প্রণব রায়, অজয় ভট্টাচার্য — এঁদের কথা কিন্তু আপনি বলেননি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্যদের নামের সঙ্গে। প্রণব রায়, অজয় ভট্টাচার্যের গানের বাণী সম্পর্কে একটু বলুন — নজরুলের বাণীর একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব এঁদের রচনায় পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন।

কমল ঘোষ : আমি আগে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমাদের এখানে প্রণব রায়ের অনেক গান আছে এবং অজয় ভট্টাচার্যেরও অনেক গান আছে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর অনেক গানই তুলসী লাহিড়ীর লেখা। তখনকার দিনে রেকর্ডে সবসময় গীতিকারের নাম লেখা থাকতো না, তাই কার রচনা তা সহজে জানা সম্ভব হতো না। অনেক গানই যেমন নজরুল সাহেবের লেখা তেমনি আমাদের তুলসী লাহিড়ীর লেখা গানও অনেক আছে।

আবুল আহসান : সুরকার হিসেবে কমল দাশগুপ্ত মেগাফোনেও কাজ করেছেন। তাঁকে তো আপনি দেখেছেনও। কমল দাশগুপ্ত সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনি।

কমল ঘোষ : আমি যখন মেগাফোনে এসেছি তার আগেই উনি এখান থেকে তাঁর কাজ শেষ করে ফেলেছেন। অনেকগুলো ছবিতে এবং অনেকগুলো নন-প্লেয়িং রেকর্ডের গানে উনি সুর দিয়েছেন। সামনাসামনি আমি কমল দাশগুপ্তকে দেখেছি।

আবুল আহসান : কমলদা, প্রথমে ক'দিন আগে মানে ১ অক্টোবর মেগাফোন নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আজ ৫ অক্টোবর সেই আলাপের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করছি। আচ্ছা কমলদা, মেগাফোনের জন্য যাঁরা গান লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে আপনি অনেকের কথাই উল্লেখ করেছেন। কবি জসীমউদ্‌দীনের নাম উল্লেখ করতে হয়তো ভুলে গেছেন।

কমল ঘোষ : জসীমউদ্‌দীন আমার সময়ে কোনো রেকর্ড করেননি। ওঁর লেখা কোনো গান আমি রেকর্ড করিনি। তার আগে হয়ে থাকলে আমার ঠিক মনে নেই বা আমার জানা নেই।

আবুল আহসান : বন্দে আলী মিয়াও তো মেগাফোনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কমল ঘোষ : আমি দেখিনি তাঁর কোনো রেকর্ড।

আবুল আহসান : এক অর্থে নজরুল তো ছিলেন মেগাফোনের প্রাণস্বরূপ — মেগাফোনের সম্পদ। মেগাফোনকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে নজরুলের একটা অবদানও তো ছিল। এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

কমল ঘোষ : নিশ্চয়ই। তাঁর লেখা গানেই তো আমাদের প্রথম রেকর্ড — 'লক্ষ্মীর বন্দনা' 'সরস্বতীর বন্দনা' এবং আরো অনেক গান উনি রচনা করেছেন। অনেকদিন উনি মেগাফোনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আবুল আহসান : মেগাফোনের এই জনপ্রিয়তার মূলে নজরুলের কি কোনো অবদান আছে বলে আপনি মনে করেন?

কমল ঘোষ : নিশ্চয়ই আছে।

আবুল আহসান : নজরুল মেগাফোনের রিহার্সেল রুমে বসে গান লিখেছেন, সুর সৃষ্টি করেছেন, শিল্পীদের গান শিখিয়েছেন। বছর তিনেক আগে নজরুলের নিজের হাতের লেখা দুটি গানের খাতা, মেগাফোনের সঙ্গে চুক্তিপত্রের কাগজ, তাঁর হাতের লেখায় রেকর্ডকৃত গানের তালিকা এসব খাতা ও কাগজপত্র আপনি আমাকে দেখিয়েছিলেন। এগুলো নিয়ে কি আপনার কোনো কিছু করার ইচ্ছে আছে?

কমল ঘোষ : হ্যাঁ, কিন্তু খাতাগুলো কোথায় রেখেছি আমি এখন ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না। নিশ্চয় সব গানই প্রায় রেকর্ড হয়ে গেছে। কোনো গান বাকি নেই। একবার না, অনেকবার করে সেসব গান রেকর্ড হয়ে গেছে।

আবুল আহসান : আমি তা বলছি না, নজরুলের হাতের লেখার যে খাতা এবং তাঁর চুক্তিপত্র কিংবা তিনি যে গানের তালিকা করেছিলেন, সেই জিনিসগুলো নিয়ে আপনার কি নিজের কোনো কিছু করার পরিকল্পনা আছে? এগুলোর তো আর্কাইভাল ভ্যালু আছে।

কমল ঘোষ : ওগুলো তো কোম্পানির অ্যাসেট, ওগুলো নিশ্চয় আমার রাখা দরকার। কিন্তু আমি বোধ হয় কোনো ফাইলের মধ্যে ঢুকিয়েছি। এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।

আবুল আহসান : যদি খুঁজে পান, তাহলে আপনার কোনো ধরনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিকল্পনা আছে নজরুলের এই গান বা হাতের লেখা বা চুক্তিপত্র বা গানের তালিকা সম্পর্কে?

কমল ঘোষ : এগুলো কোম্পানির অ্যাসেট, এগুলো তো কোম্পানিতেই থাকবে, এগুলো নিয়ে আর করবার কিছু নেই। তবে নজরুলের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎবাবুরও অনেক লেখা আমাদের কাছে রয়েছে।

আবুল আহসান : তাঁদের হস্তাক্ষরে — রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের হস্তাক্ষরের লেখা পত্র আছে আপনাদের কাছে?

কমল ঘোষ : হ্যাঁ, আমার কাছে আছে।

আবুল আহসান : মেগাফোনে যেসব গান রেকর্ড হতো তার তালিকার মোটা রেজিস্টার খাতা আপনার সৌজন্যে দেখেছি। সেই তালিকার একটা বড়ো অংশ নজরুলের নিজের হাতে লেখা। এই খাতাগুলো এখন কোথায়?

কমল ঘোষ : খাতাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

আবুল আহসান : মানে প্রাকৃতিক নিয়মে নষ্ট হয়ে গেছে নাকি হারিয়ে গেছে?

কমল ঘোষ : প্রাকৃতিক নিয়মেই নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়িটা অনেক পুরনো, সেখানে উই আর জলটল পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তখন আমি অসুস্থ ছিলাম।

আবুল আহসান : কমলা ঝরিয়া কয়েকটি মাত্র নজরুলের গান রেকর্ড করেছিলেন। সেই তুলনায় তুলসী লাহিড়ীর লেখা গানই তিনি বেশি করেছেন এবং তাঁরা দু'জন একসঙ্গে প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতেনও। আপনার কি মনে হয় না, কমলার নজরুলের গান রেকর্ড না করার পেছনে তুলসী লাহিড়ীর হাত ছিল?

কমল ঘোষ : আমি জানি না, তখন আমি আসিনি এই কোম্পানিতে।

আবুল আহসান : কমলা ঝরিয়া যদি আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালার মতো আরো বেশি করে নজরুলের গান রেকর্ড করতে পারতেন তাহলে তাঁর খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা-সমাদর আরো বেশি হতো বলে কি আপনার মনে হয়?

কমল ঘোষ : আমি এ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবো না।

আবুল আহসান : কমলদা, আমরা নানা বিষয়ে কথা বলছি — কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো কোনো জবাব আপনি সংক্ষেপে দিচ্ছেন বা কখনো একটু এড়িয়েও যাচ্ছেন, আবার কোনো কোনো জবাব আপনি দিতে পারছেন না যেহেতু সে সময়ে আপনি মেগাফোনে আসেননি। এবারে অন্য একটি প্রশ্ন করি। আধুনিক, পল্লিগীতি, নজরুলগীতি, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, ভজন — এই নানা ধরনের গানের পাশাপাশি ধ্রুপদী গানের রেকর্ডও তো হয়েছে মেগাফোনে। এই গানগুলো কেমন সমাদর পেয়েছিল?

কমল ঘোষ : খুব ভালো সমাদর পেয়েছিল। এখনো পাচ্ছে।

আবুল আহসান : কারা মূলত এই ধ্রুপদী গানের প্রধান শিল্পী ছিলেন?

কমল ঘোষ : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি, তারাপদ চক্রবর্তী এবং বেগম আখতারেরও কিছু গান ছিল।

আবুল আহসান : গানের পাশাপাশি যন্ত্রসংগীতের রেকর্ডও তো মেগাফোন কোম্পানি প্রকাশ করেছে। এঁদের মধ্যে কারা বিশিষ্ট ছিলেন? কাদের কথা মনে পড়ে আপনার?

কমল ঘোষ : আমি আগেই বলেছি — ওস্তাদ এনায়েত খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ, ওস্তাদ লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, ওস্তাদ ছোটে খাঁ, ওস্তাদ বাদল খাঁ — এঁদের সকলের কথাই আমার খুব ভালো করে মনে পড়ে। যদিও আমি এনায়েত খাঁকে দেখিনি। আলাউদ্দিন খাঁকে খুব ভালো করেই দেখেছি। এবং আর সকলকেই আমি দেখেছি। খুব ভালোই মনে পড়ে। এসব শিল্পী চিরকালই অমর হয়ে থাকবেন।

আবুল আহসান : ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কি তখন কিছুকালের জন্যে কলকাতায় ছিলেন — না, মাইহার থেকে মাঝে-মধ্যে আসতেন?

কমল ঘোষ : উনি যখন এখানে আসতেন, কলকাতার রাসবিহারী রোডের বাড়িতে থাকতেন।

আবুল আহসান : জে.এন. ঘোষের বাড়িতেই?

কমল ঘোষ : না।

আবুল আহসান : তাহলে রাসবিহারী রোডের কোনো বাড়িতে হয়তো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থাকতেন। কাওয়ালির রেকর্ডও তো বেরিয়েছে এখান থেকে। নামকরা কাওয়ালদের মধ্যে কারা ছিলেন?

কমল ঘোষ : আমার অতো মনে নেই। তবে আমার সামাদ কাওয়ালের নামটা মনে আছে। ওঁর অনেক রেকর্ড এখানে ছিল।

আবুল আহসান : সামাদ কাওয়াল ছাড়া আর অন্য কোনো কাওয়ালকে আপনি না দেখলেও তাঁদের গানের রেকর্ড সম্পর্কে তো আপনার জানা থাকার কথা, সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন!

কমল ঘোষ : আমি কিছুই বলতে পারবো না। কেননা কাওয়ালি সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নেই।

আবুল আহসান : ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ সাহেব তো মেগাফোনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

কমল ঘোষ : হ্যাঁ, আমি আগেই বলেছি — প্রথমেই বলেছি জমিরুদ্দীন খাঁ সাহেবের তিন-চারটে রেকর্ড এখানে ছিল। এখনো আছে। সেগুলো সিডি ফর্মে বেরিয়েছে।

আবুল আহসান : আর আপনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মেগাফোনের প্রতিষ্ঠাতা জে.এন. ঘোষের গভীর সৌহার্দ্য ছিল এবং এই বাড়িতেই একসময় উনি থাকতেন। এই বিষয়টা একটু খোলাসা করে বলবেন?

কমল ঘোষ : আমি শুনেছি। আমি তো তখন এখানে আসিনি। আমি শুনেছি, এখানেই থাকতেন। তো আমি দেখেছি ওঁর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তখন আমার বয়সটা খুবই কম।

আবুল আহসান : কমিক বা রঙ্গগীতির রেকর্ডও তো মেগাফোন বের করেছে। এই বিষয়ে যাঁরা সেই সময়ে নাম করেছিলেন তাঁদের অনেককে হয়তো আপনি দেখে থাকবেন বা তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও থাকতে পারে। এ বিষয়ে কিছু মনে পড়ে?

কমল ঘোষ : ফণী রায়ের রেকর্ড ছিল। তারপর রঞ্জিত রায়ের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনেক রেকর্ড আমিই করেছিলাম।

আবুল আহসান : বাংলা ছাড়াও অসমিয়া, উড়িয়া, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি নানা ভারতীয় ভাষার গানের রেকর্ড মেগাফোন থেকে বেরিয়েছে। এইসব গানের চাহিদা কেমন ছিল?

কমল ঘোষ : বার্মিজ গানও ছিল আমাদের। তখনকার দিনে কী রকম বিক্রি হয়েছে সেটা আমি বলতে পারি না। নেপালি গানও ছিল। পাঞ্জাবি গানও ছিল এবং তার ভিতরে কয়েকটা গান কমলা ঝরিয়া গেয়েছিলেন। অসমিয়া গান অনেকে গেয়েছিলেন — তাঁদের নামগুলো এখন মনে নেই। তবে শেষ রেকর্ডটা আমিই করেছিলাম — পারভীন সুলতানার। তাঁর গান ভালোই বিক্রি হয়েছে।

আবুল আহসান : এই যে যাঁরা পাঞ্জাবি, নেপালি, উড়িয়া, হিন্দি, উর্দু, অসমিয়া গান করতেন — তাঁরা কি ঐ ভাষাভাষীরই শিল্পী ছিলেন, না অন্যরাও এইসব গান করতেন?

কমল ঘোষ : ওই ভাষারও কিছু শিল্পী ছিলেন এবং অন্য ভাষারও। আমাদের এই বাংলাতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কমলা ঝরিয়া কয়েকটা পাঞ্জাবি গান করেছিলেন। অন্য ভাষাভাষী, যেমন উড়িয়া গান উড়িষ্যার লোকেরাই করতেন। আসামি গান ওখানকার লোকই করতেন। এরকমই হতো আর কি!

আবুল আহসান : আপনি বলেছেন মেগাফোনের এই বাড়িতে শিল্পীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে থাকতেনও। মহিলা শিল্পীরাও কি কখনো এখানে রাত্রিবাস করতেন?

কমল ঘোষ : শুনেছি। আমি তো আর দেখিনি কখনো!

আবুল আহসান : না দেখলেও শুনেছেন তো, কে কে এখানে থাকতেন?

কমল ঘোষ : অনন্তবালা বৈষ্ণবী, বেগম আখতার — এঁদের কথাই মনে আছে।

আবুল আহসান : কানন দেবী থাকেননি এখানে? মেগাফোনের এই বাড়িতে?

কমল ঘোষ : আমার ঠিক জানা নেই। তবে শুনেছি এখানে থাকতেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : নজরুলও কি মাঝে-মধ্যে রাত কাটাতেন এখানে?

কমল ঘোষ : জানি না।

আবুল আহসান : শিল্পীদের জন্যে আলাদা আলাদা বিশ্রামের ঘর ছিল, থাকার ঘরও ছিল একথা আপনার মুখেই আমরা শুনেছি — তো এখানে বিশেষ করে কার কার জন্যে এইরকম থাকার ঘর নির্দিষ্ট ছিল?

কমল ঘোষ : এখন আমার ঠিক অতো মনে নেই — কোনটা কার ঘর ছিল!

আবুল আহসান : একটি রেকর্ড প্রকাশের পেছনে অনেক মানুষের শ্রম-নিষ্ঠা জড়িত থাকতো। বাজিয়ে — বাজনদার মানে যন্ত্রশিল্পী — এঁদেরও একটা বড়ো ভূমিকা সবসময়ই ছিল। তবলায়, বাঁশিতে, তানপুরায়, সেতারে, হারমোনিয়ামে — এইসব যন্ত্রানুষঙ্গে যন্ত্রী হিসেবে মেগাফোনে কারা কাজ করেছেন?

কমল ঘোষ : আগে কারা কাজ করেছেন, আমার ঠিক জানা নেই। তবে আমার সময় রাধাকান্ত নন্দী ছিলেন তবলায়, নির্মল বিশ্বাস ছিলেন সেতারে, খোকন ছিল গিটারে এবং পিয়ানো বাজাতো তখন শামু বলে এক ছেলে — তখনকার দিনের এক কমেডিয়ান রঞ্জিত রায় — তার ছেলে। এরাই তখন ছিল। আগের কথা আমার ঠিক জানা নেই।

আবুল আহসান : এবারে অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করি — মেগাফোনের প্রতিষ্ঠাতা জে.এন. ঘোষ তো সেই ১৯১০ সাল থেকে গ্রামোফোন রেকর্ড বিক্রি এবং পরে রেকর্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সূত্রে গানের জগতের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তো জে.এন. ঘোষের গানের কান কেমন ছিল? গানের সমঝদার কেমন ছিলেন তিনি? আর কাদের গান তিনি বিশেষ করে পছন্দ করতেন?

কমল ঘোষ : সকলের গানই পছন্দ করতেন। আর আমি তখন দেখেওছি এবং শুনেওছি অনেক রেকর্ড কোম্পানি তাদের রেকর্ড পুজোর সময় বের করার আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন — জ্যাঠামশাইয়ের কাছে — যে, কোনটা কতো বিক্রি হতে পারে। উনি শুনে বলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিতেন, এটা এমন বিক্রি হবে। সেই হিসেবেই সেইসব কোম্পানি রেকর্ড ছাপাতো।

আবুল আহসান : বিশেষভাবে ওঁর খুব প্রিয় শিল্পী এক-দুইজনের কথা কি বলতে পারেন, যাঁদের গানের কথা উনি বলতেন?

কমল ঘোষ : ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় — খুব পছন্দ করতেন ওঁর গান।

আবুল আহসান : আর মহিলা শিল্পীদের মধ্যে?

কমল ঘোষ : আমার জানা নেই।

আবুল আহসান : আচ্ছা কমলদা, মেগাফোনের রিহার্সেল রুমটা তো ঘুরেফিরে দেখলাম, সেখানে এখন তিনটি ছবি ঝুলছে — ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, বেগম আখতার এবং কমলা ঝরিয়ার। কিন্তু নজরুল কোথায়? নজরুলের একটা ছবি থাকা তো উচিত ছিল। কী বলেন আপনি?

কমল ঘোষ : নিশ্চয়ই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তখন থেকে রাখিনি। তারপরে আরো অনেকগুলো — দশটা রিহার্সেল রুম ছিল। আগে নিশ্চয় কোনো রুমে নজরুলের ছবি ছিল। কিন্তু এখন নেই কেন আমি সেটা বলতে পারবো না। তবে নিশ্চয় রাখা উচিত। আপনি যখন বললেন আমি নিশ্চয় একটা ছবি লাগাবো।

আবুল আহসান : এই স্বীকারোক্তি ও সদিচ্ছার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির সাফল্যের প্রেরণায় জে.এন. ঘোষের কি চলচ্চিত্র নির্মাণের ইচ্ছে কখনো জেগেছিল?

কমল ঘোষ : জানি না।

আবুল আহসান : আপনি তো চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। একসময়ে ফটোগ্রাফার হিসেবেও নাম করেছিলেন। আগে জিজ্ঞেস করি, ফটোগ্রাফার হিসেবে কোথায় কোথায় কাজ করেছেন?

কমল ঘোষ : হবে কোনো নিউজপেপারে এবং আরো কয়েকটা জায়গায়। কোনো কোনো মাসিক পত্রিকায়। তবে সেগুলোর নাম আমি এখন বলতে চাই না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান : সেদিন কিন্তু আলাপে আলাপে মুখ ফস্‌কেই হয়তো বলে ফেলেছিলেন, *আনন্দবাজারে*ও আপনি কাজ করেছেন। যাই হোক, চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন কীভাবে?

কমল ঘোষ : চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত অনেক আগে থেকেই আমি ছিলাম। যুক্ত হওয়াটা কীভাবে সেটা তো আর বলা যায় না। আমি ছবি করেছিলাম এবং অনেকগুলো ছবির কোম্পানির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম ১৯৬৪ সালে। আমি সেটা ভুলে গেছি। তারপরে আমি আর করিনি। সেটা এখন মাথা থেকে বার করে দিয়েছি।

আবুল আহসান : আপনি মূলত তো প্রযোজনা করতেন?

কমল ঘোষ : হ্যাঁ, প্রযোজনা করতাম। ঐ যে গল্প সিলেক্ট করতাম। ঐ যে ডিরেকশনের সাথে হেল্‌প করতাম। সবই করতাম। কিন্তু এখন ও সম্পর্কে কিছু বলতেও চাই না। আমার ভালো লাগে না।

আবুল আহসান : আচ্ছা, কতোগুলো ছবি আপনি করেছিলেন?

কমল ঘোষ : আমি দু'চারটে ছবি করেছিলাম। তার আগে আরো কিছু ছবির সাথে আমি যুক্ত ছিলাম। সেসব নামও এখন আমি বলতে চাই না। অতীত — অতীতই।

আবুল আহসান : না, যে ছবিগুলো আপনি নিজের নামে করেছিলেন, সে তো এখন ইতিহাসের অন্তর্গত। সে নাম আপনি না বললেও কিন্তু লোকে জানে, জানতে পারবে। তো আপনার মুখ থেকে সেই ছবিগুলোর নাম আমরা একটু শুনি না কেন!

কমল ঘোষ : আমি বলবো না।

আবুল আহসান : *হস্‌পিটাল, কিনু গোয়ালার গলি, রজনীগন্ধা* — এইসব ছবি কেমন ব্যবসা পেয়েছিল?

কমল ঘোষ : জানি না। তবে শুনেছিলাম ভালোই হয়েছিল।

আবুল আহসান : সংগীত এবং সিনেমার সঙ্গে জড়িত হয়ে অনেক খ্যাতিমান মানুষের সাহচর্য-সান্নিধ্য-সঙ্গ আপনি লাভ করেছেন। এই দুই জগতের যাঁদের সঙ্গে আপনার উঠবস হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কাদের স্মৃতি আপনার মনে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে?

কমল ঘোষ : কারুর কথা আমি আর বলতে চাই না, মনেও রাখি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না। ষাট বছর হয়ে গেল, এই জগতের সঙ্গে যুক্ত। রেকর্ড, ফিল্ম আর ঐ কলাকুশলীদের নিয়ে কাজ করেছি। কিন্তু এখন আর কারো কথাই আমার ভালো লাগে না বলতে। এখন আমি যাবার পথে।

আবুল আহসান : এই যে এক ধরনের নীরবতা এবং অভিমান এবং নির্লিপ্ততা আপনার মধ্যে কাজ করছে, এর কারণটা কী?

কমল ঘোষ : আমার এখন আর ভালো লাগে না। আমার নিজের কথা নিজে বলতে ভালো লাগে না।

আবুল আহসান : জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের হাতে যে মেগাফোন কোম্পানির সূচনা ও সমৃদ্ধি, কমল ঘোষের হাতে যার স্থিতি ও রূপান্তর, কিন্তু তারপর? তারপরের পরিণতিটা কী হবে? মেগাফোনের গৌরবের প্রদীপ কি তারপরেও জ্বলতেই থাকবে, নাকি নিভে যাবে?

কমল ঘোষ : নিশ্চয়ই জ্বলতে থাকবে। এরপর যারা আসবেন, তারা আরো বড়ো করে চালাবেন। ভাইপো আছে — ভাইঝি আছে — তারা নিশ্চয় চালাবে। তারা আজকের যুগের ছেলেমেয়ে।

আবুল আহসান : কমলদা, আমরা আলাপের শেষপর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আর মাত্র দু'বছর পর মেগাফোন কোম্পানির শতবর্ষ পূর্ণ হবে। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রতীক এই প্রতিষ্ঠানটির একশো বছর উপলক্ষে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান বা কোনো স্মারকগ্রন্থ-জাতীয় কিছু প্রকাশের পরিকল্পনা কি মেগাফোন কোম্পানির তরফ থেকে আছে?

কমল ঘোষ : আমি বলতে পারবো না। এখন আমার বয়স সেভেনটি এইট হয়ে সেভেনটি নাইনে পড়বে। তখন যদি থাকি, তখন আমি বলতে পারবো কী করতে পারবো, কী করতে পারবো না। তখন যদি থাকি বেঁচে, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু করবো এবং পরে যারা আসবে তারা নিশ্চয় কিছু করবে।

আবুল আহসান : মেগাফোন কোম্পানির এই আসন্ন শতবর্ষে আমাদের তরফ থেকে, বাইরে থেকে আমরা যদি এর ইতিহাস, এর সাফল্যের কথা তুলে ধরি তাতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আপনার সহযোগিতা, আপনার সহায়তা আমরা পাব তো?

কমল ঘোষ : যদি আমাকে দেখিয়ে বের করেন, তবে নিশ্চয় আমার সহযোগিতা পাবেন। আর যদি আমাকে না দেখিয়ে করেন তবে আর সহযোগিতা কী করে করবো?

আবুল আহসান : কমলদা, আমরা আজকের এই বিদ্যুৎ-বেহালের দিনে আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাই না। প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই করছে আপনার বয়স এবং যে কোনো কারণেই হোক আপনার মেজাজটাও আজ প্রসন্ন নয়। তো আমরা শেষ কথাটি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই — মেগাফোন কোম্পানি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? এই যে প্রায় একশো বছর ধরে মেগাফোন কোম্পানি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? এই কথা দিয়েই আমাদের এই আলাপ শেষ করবো।

কমল ঘোষ : মূল্যায়ন কিছু করা সম্ভব নয়। এতো রকম সম্পদ আছে মেগাফোন কোম্পানিতে যে এক কথায় বলা যায় না। প্রচুর সম্পদ মেগাফোন কোম্পানিতে রয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি

ঐতিহ্যের বহমান ধারা

রবীন্দ্রনাথ ৭ চৈত্র ১৩৩৮-এ শান্তিনিকেতন থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী বাসন্তী দেবীকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন : 'একজন ভদ্রলোক গ্রামোফোনের সুর ধরবার বিদ্যা য়ুরোপে শিখে এসেছেন। তিনি এখানে এসেছেন আমার কণ্ঠ থেকে কিছু আদায় করবার প্রস্তাব নিয়ে।' রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই 'ভদ্রলোক' চণ্ডীচরণ সাহা — যিনি সি.সি. সাহা নামেও পরিচিত ছিলেন। চণ্ডীচরণ জার্মানি ও বিলেতে গিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের সৌজন্যে রেকর্ডিং-বিদ্যা শিখে কলকাতায় ফিরে এসে ১৯৩১-এ (১৪ জুলাই ১৯৩২-এ রেজিস্ট্রিকৃত) ৬/১ অক্রুর দত্ত লেনে জার্মান রেকর্ডিং-যন্ত্র বসিয়ে 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস অ্যা ভ্যারাইটিস্ সিন্ডিকেট লিমিটেড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' নামে গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশের সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য লাভের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এ ঘটনারই আভাস আছে। শেষ পর্যন্ত চণ্ডীচরণ সফল হন — রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কবিতা ও গান ধারণে তাঁর সম্মতি মেলে।

৫ এপ্রিল ১৯৩২ 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস'-এর নিজস্ব স্টুডিওতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা ও গান রেকর্ড করেন, তা দিয়েই 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র যাত্রা শুরু। কবিকণ্ঠের 'H-1' সংখ্যা-চিহ্নিত রেকর্ডটির এক পিঠে কবিতা 'আমি যখন বাবার মত হব' এবং অপর পিঠে 'তবু মনে রেখো' এই গানটি ছিল। জানা যায়, এর পরেও — ১৯৩৬ ও ১৯৩৯-এ 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসে'র পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও গান রেকর্ড করা হয়। অবশ্য 'হিন্দুস্থানে'ই কবিকণ্ঠের আবৃত্তি ও গানের রেকর্ড প্রথম বের হয়নি, এর বহু আগেই হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ. বোস) 'প্যাথি-এইচ. বোসেজ রেকর্ড'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেবেলে রবীন্দ্রকণ্ঠ ধরে রাখেন। এই প্রসঙ্গে 'গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড'সহ আরো কোনো কোনো কোম্পানির উদ্‌যোগের কথাও বলতে হয়। তবে 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র প্রয়াস নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় আদিযুগের সংগীতগ্রাহক-যন্ত্রবিদ নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচর্চায় ১৯৩৯-এ রবীন্দ্রনাথের শেষ রেকর্ডিংয়ের যে বিবরণ মেলে তা বিশেষ কৌতূহল-জাগানো ঘটনা। একটু দীর্ঘ হলেও তার উদ্ধৃতি পাঠককে হয়তো ক্লান্ত করবে না। নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন : 'আমার কর্মজীবনে অত্যন্ত বরণীয় এবং স্মরণীয় ঘটনা হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড করা। আমার জীবনে সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর শেষ দুটি আবৃত্তি রেকর্ড করার। এই দুটি আবৃত্তির মধ্যে আমার যত দূর মনে পড়ছে, একটি হল 'সোনার তরী' আর একটি বোধ হয় ছোট্ট বীরপুরুষের কাহিনী। ... ১৩৩৯ সালের নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি। আমাদের এই স্টুডিওতে (হিন্দুস্থান) কবি পদধূলি দিলেন। হেমন্তকালের বিষণ্ন সময়। তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত পরিচালকবর্গ ছিলেন। আর রেকর্ড করবার জন্য আমিও ছিলাম। ...'

'কবি এলেন। শরীর অত্যন্ত অশক্ত। ... তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং আমরা যখন রেকর্ডিং করি তখন একটা অদ্ভুত রকম ঘটনা ঘটেছিল ...। তখনকার দিনে তো টেপরেকর্ডার ছিল না এবং যেটা ফাইনাল রেকর্ড করা হত সেটাকে কোনরকমভাবে বাজানো আর সম্ভবপর ছিল না। সমস্তটা কবি আবৃত্তি করলেন এবং আমরা তাঁকে আবার বাজিয়ে শোনালাম। শোনাবার পর কবি বলেছিলেন, 'বাঃ বড় সুন্দর হয়েছে তো।'

'তা শুনে বুলাদা [প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ] কবিকে বললেন, 'আপনাকে ওটা আর একবার বলতে হবে।' কবি বললেন, 'কেন, ভালই হয়েছে ত।' তখন কবিকে বুলাদা বললেন, 'না ওটা আমরা টেস্ট করেছি, এবার আমরা ফাইনাল রেকর্ড করব।' তারপর কবি একটুখানি কপট ক্রোধের সঙ্গে বললেন, 'বুলা, আমার আজ প্রায় আশি বছর বয়স হল। তা এই আশি বছর বয়সে আমাকে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে আবার ফাইনালে বসতে হবে। এ তুই কী করলি! বুড়োর ওপর এতখানি অবিচার করছিস কেন?'

' ... আমাদের কাজ আবার আরম্ভ করলাম। কবি ঐদিন দুটি কবিতা রেকর্ড করেছিলেন। একটি হচ্ছে 'বীরপুরুষ' — যেটি আমাদের রেকর্ডে ছোট্ট বীরপুরুষের কাহিনী বলে উল্লেখ করা আছে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর একটি হচ্ছে 'সোনার তরী'। 'সোনার তরী'র আবৃত্তি আমি আজও যেন আমার কানে শুনতে পাচ্ছি। এই দুটি রেকর্ড যে আমি করতে পেরেছিলাম তার জন্য আজও আমি কৃতজ্ঞ।'

১৯৩২-এ প্রথম যেবার রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র স্টুডিওতে যান, এঁদের ব্যবস্থাপনা ও কর্ম-পরিকল্পনা দেখে খুশি হন এবং এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য লিখে দেন এই বলে : 'হিন্দুস্থান ম্যুজিকাল প্রডাক্টস ভেরাইটি সিন্ডিকেট জয়যুক্ত হৌক, — এরূপ প্রতিষ্ঠান এদেশে এই প্রথম, ইহার সফলতায় আমাদের সকলেরই গৌরব।' সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথ যে আশাবাদ প্রকাশ করেন, চণ্ডীচরণের যোগ্য পরিচালনায় উত্তরকালে এই প্রতিষ্ঠান তার 'সফলতায়' যথার্থই 'আমাদের সকলেরই গৌরবে'র দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে 'হিন্দুস্থানে'র ব্যবসায়িক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকদিন পর্যন্ত 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ লিমিটেডে'র পরিচালনা-পর্ষদের সভাপতি ছিলেন।

দুই

চণ্ডীচরণ সাহা ছিলেন শিক্ষিত ও উদ্যমী পুরুষ। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়। বিশেষ করে সংগীত-সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে অন্যতম আদি স্বদেশি প্রতিষ্ঠানের দাবি এই সাহা-পরিবার করতে পারেন। চণ্ডীচরণের পিতা মতিলাল সাহা ১৮৯৫-এ এম.এল. সাহা (M.L. Shaw) নামে হারমোনিয়াম তৈরির ব্যবসায়ে নামেন কলকাতার ধর্মতলায়। এরপর ১৯০৫-এর দিকে এম.এল. সাহা নিকোল কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে 'নিকোল রেকর্ড' এবং 'নিকোলফোন'-যন্ত্র বিক্রির একমাত্র পরিবেশক নিযুক্ত হন। ব্যবসায়ে সাফল্য আসতে দেরি হয়নি। গ্রামোফোন-সামগ্রী বিক্রির অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এম.এল. সাহা নিজের স্থান করে নেন। ১৯১১ সাল নাগাদ মতিলাল সাহা ব্যবসার জায়গা সরিয়ে নেন, তবে তারও অবস্থান হয় ধর্মতলা অঞ্চলেই। এই সময় থেকে M.L. Shaw শুধু নিজেদের তৈরি 'বীণা' হারমোনিয়াম এবং 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'-সামগ্রী বিক্রির ভেতরেই নিজেদের ব্যবসা সীমাবদ্ধ রাখে। ১৯২২ সালের দিকে চণ্ডীচরণ পিতার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে ব্যবসায়ের পরিধি বাড়ান। এই বছরের শেষের দিকে 'প্যাথি-বেবি' হোম-সিনেমার পরিবেশক নিযুক্ত হন এবং ৬/১ অক্রুর দত্ত লেনে স্থাপিত হয় ফ্যাক্টরি। এরপর তাঁর মনে স্বপ্ন জাগে গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠার। সেই স্বপ্ন নিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পিতার সমর্থনে রেকর্ডিং-বিদ্যা শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং উদ্দেশ্য-পূরণের জন্যে ইউরোপে পাড়ি জমান। তাই চণ্ডীচরণের আকাঙ্ক্ষা, উদ্‌যোগ ও সাফল্যের পেছনে পারিবারিক প্রেরণার দান যে অনেকখানি তা স্বীকার করতেই হয়।

চণ্ডীচরণ সাহা মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সেনোলা রেকর্ড কোম্পানির বিভূতিভূষণ সেনের সহযোগে কলকাতায় ডিস্‌ক রেকর্ড তৈরির প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্‌যোগ নেন। এ-জন্যে চণ্ডীচরণ ইউরোপে গিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করেন। কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের ভারতে কর্মরত ম্যানেজিং ডিরেক্টর জর্জ কুপার তাঁদের কোম্পানির কোনো স্বদেশি প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে গড়ে না ওঠে সে-ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠেন। চণ্ডীচরণকে তিনি নানাভাবে বুঝিয়ে এই উদ্‌যোগ থেকে দূরে সরিয়ে নেন। এর বদলে উদার শর্তে গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের দমদমের ফ্যাক্টরি থেকে রেকর্ড ছাপার প্রস্তাব দেন। পরে অবশ্য সেই ব্যবস্থা মোতাবেকেই কাজ চলতে থাকে। অবশ্য চণ্ডীচরণ বেঁচে থাকতেই তাঁর ছেলেরা খিদিরপুর এলাকার সোনাপুরে ডিস্‌ক রেকর্ড প্রকাশের কারখানা খোলেন। ১৯৩২-এ চণ্ডীচরণ 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ধর্মতলায় 'সি.সি. সাহা লিমিটেড' নামে সিনেমা-সামগ্রী ও রেডিও বিক্রির একটি বড়ো দোকানও খোলেন। বছর দুয়েক পরে চণ্ডীচরণ আবারও তাঁর পিতৃ-প্রতিষ্ঠান M.L. Shaw-এর হাল ধরেন এবং সেকালের বার্মা মুলুক পর্যন্ত এর ব্যবসা বিস্তার করেন। তবে চণ্ডীচরণের মূল মনোযোগ ছিল 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'র প্রতিই।

তিন

চণ্ডীচরণ সাহা বিদেশ থেকে রেকর্ডিং সম্পর্কে যে শিক্ষালাভ করেন, তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে 'হিন্দুস্থান'-এর গান-বাদ্য-আবৃত্তি-নাটক রেকর্ডে ধারণের ক্ষেত্রে। এই প্রশিক্ষণের জ্ঞান ও তাঁর নিজের উদ্ভাবনী চিন্তার সমন্বয়ে যে নিরীক্ষার কাজ তিনি করেন, তা সবার প্রশংসা পায়। এ-প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে পঙ্কজকুমার মল্লিক যে-সাক্ষ্য দিয়েছেন তা উল্লেখ করা যায় : 'বাংলা সঙ্গীত রেকর্ডিং-এর জগতে এই উদ্যোগী ও নিরলস মানুষটি [চণ্ডীচরণ সাহা] স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি অক্রুর দত্ত লেনে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শব্দযন্ত্রের আধুনিক কলাকৌশল — যা তিনি জার্মানী থেকে শিক্ষা করে এসেছিলেন —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করে এদেশে সঙ্গীত রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে গ্রামোফোন কোম্পানীর সমকক্ষতা অর্জন করা। ... প্রভূত সতর্কতা সহকারে তিনি নানা ঢঙের, নানা যন্ত্রের ও নানা কণ্ঠের রেকর্ডিং করার উদ্যোগ করেছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও বিভিন্ন লঘু সঙ্গীতের সার্থক রেকর্ডিং করার প্রতিজ্ঞা তিনি নিয়েছিলেন। ... আমি রাইচাঁদের তবলাসঙ্গতসহ নানা কবি রচিত নানান ধরনের গান গাইতাম। প্রত্যেক গান চার-পাঁচবার করে গাইতাম। প্রত্যেক রেকর্ডিং-এর শেষে চণ্ডীবাবু গানটি প্লেব্যাক করতেন ত্রুটি সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে।' এইভাবে দিনের পর দিন চেষ্টার ফলে 'রেকর্ডিং-বিষয়ে ... তাঁর অভিজ্ঞতা সার্থক হয়ে উঠল।' দেশি কোম্পানির মধ্যে 'মেগাফোন' বা 'সেনোলা'র নিজস্ব রেকর্ডিং স্টুডিও ছিল, কিন্তু 'হিন্দুস্থানে'র সঙ্গে এদের রেকর্ডের একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য, তা একান্তই রেকর্ডিং বৈশিষ্ট্যের, সচেতন শ্রোতার কানে ধরা পড়বেই। এই কৃতিত্ব যে চণ্ডীচরণের, তা নির্দ্বিধায় কবুল করতে হয়।

চার

হিন্দুস্থান রেকর্ডকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজে এক সমৃদ্ধ সংগীত-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি ও গান রেকর্ড করে উদ্বোধন করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের। তার পরের ইতিহাস শুধুই সাফল্য, অর্জন ও গৌরবের। রবীন্দ্রনাথের পরপরই 'হিন্দুস্থান' থেকে বের হয় অতুলপ্রসাদের কণ্ঠের গানের রেকর্ড ('মিছে তুই ভাবিস মন' ও 'জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী')।

নজরুল তখন ছিলেন 'মেগাফোন কোম্পানি'র চুক্তিবদ্ধ শিল্পী-গীতিকার-প্রশিক্ষক। নিয়ম-অনুসারে তাই অন্য কোনো রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ছিল না। তবুও 'হিন্দুস্থান' নজরুলের শুভকামনা থেকে বঞ্চিত হয়নি। পরোক্ষভাবে তিনি সহায়তা করেছেন এই স্বদেশি রেকর্ড কোম্পানিকে। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাঁর লেখা চারটি গানের দুটি রেকর্ড বের হয় শচীন দেববর্মনের কণ্ঠে : 'কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া', 'মেঘলা নিশিভোরে মন যে কেমন করে', 'চোখ গেল চোখ গেল পাখীরে কেন ডাকিস রে' এবং 'পদ্মার ঢেউরে তোর শূন্য হৃদয় নিয়ে যা রে'।

একে একে সেকালের অনেক নামি ও প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'তে। এই তালিকা নিঃসন্দেহে দীর্ঘ — এখানে শুধু নির্বাচিত কিছু নাম পেশ করি :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কুন্দনলাল সায়গল, শচীন দেববর্মন, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজকুমার মল্লিক, দিলীপকুমার রায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, অনুপম ঘটক, আঙ্গুরবালা, রেণুকা দাসগুপ্তা, সাবিত্রী দেবী, সাহানা দেবী, সুপ্রভা ঘোষ (সরকার), ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। চল্লিশ দশকের শেষের দিকে আরো অনেক নতুন শিল্পী 'হিন্দুস্থানে' এসে যোগ দেন, তাঁরা পরে নন্দিত শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে' সংগীত-পরিচালক ও প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন তিমিরবরণ, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও অনুপম ঘটক। রাইচাঁদ বড়ালেরও যোগ ছিল 'হিন্দুস্থানে'র সঙ্গে। 'হিন্দুস্থানে'র শিল্পীদের জন্যে গান লিখেছেন অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, হীরেন বসু, প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, মোহিনী চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং আরো কেউ কেউ। এঁদের রচিত কাব্যগীতি ব্যতিক্রমী সুর-যোজনায় বিশেষ বিশেষ গায়কের কণ্ঠে অনন্য আবেদন সৃষ্টির ভেতর দিয়ে শ্রোতাকে সুরের মায়াজালে আবিষ্ট করতো।

পাঁচ

'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র তারকা-শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কুন্দনলাল সায়গলের। তাঁর প্রথম রেকর্ড বের হয় 'হিন্দুস্থান' থেকেই। সায়গল বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবি ও আরো কিছু ভারতীয় ভাষায় গান রেকর্ড করেন। শিল্পী হিসেবে তিনি অসামান্য খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পান এবং তাঁর নাম ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। সায়গল ছিলেন রেমিংটন কোম্পানির একই সঙ্গে সেল্‌সম্যান ও মেকানিক। কোম্পানির কাজে কলকাতায় এসে ফিল্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন — প্রথমে গান, পরে অভিনয়ে। 'নিউ থিয়েটার্স' তাঁকে ফিল্মের জগতে জায়গা করে দেয়। 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'তে তাঁকে নিয়ে আসেন শচীন দেববর্মন। তাঁর কথা স্মৃতি হাতড়ে বলেছেন 'হিন্দুস্থানে'র রেকর্ডিস্ট নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় : '... আমি যখন এখানে এলাম তার দু-তিন দিন পরে প্রথম রেকর্ড করা দেখতে পেলাম কুন্দনলাল সাইগলের। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর-নভেম্বর — এরকম সময় হবে। ... দেখলাম, একজন ভদ্রলোক হিন্দীতে গান করছেন, সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন আমাদের তিমিরবরণ ভট্টাচার্য। এক অবাঙালী ভদ্রলোক দীর্ঘকায়, গায়ের রং একটু কালো — ... রেকর্ড করছেন স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সাহা ...। ... ঐ যে ভদ্রলোকটি গাইছিলেন, তাঁর গানের ভেতর একটা অদ্ভুত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রকম স্বর্গীয় সুরলহরী আমার কানের ভেতর দিয়ে একেবারে মর্মে প্রবেশ করে আমাকে এমনভাবে অভিভূত করল যে, আমি আর থাকতে পারলুম না। ... আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি শুনেছি এটা নিউ থিয়েটার্সের *দেবদাস* ছবির গান আর এর সঙ্গীত পরিচালক তিমিরদা, আপনার নামটা কি?'

'তখন তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, 'আমার নাম হচ্ছে কুন্দনলাল সাইগল।'

'দুটি গান তিনি রেকর্ড করলেন। এত সুদীর্ঘ দিন অতীত হয়ে গেলেও আমার বেশ মনে আছে। একটি গান হচ্ছে, 'বালম আয়ো বসো মেরে মন মে' আর দ্বিতীয় গান, 'দুখ কী অবদিন বিতত নহি'। ...'

সায়গলের রেকর্ড বাজার মাত করলো। 'হিন্দুস্থান' লেবেলে সায়গলের রেকর্ড অবিশ্বাস্য ব্যবসা করেছিল। এক লাহোরেই তাঁর এই রেকর্ডের পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। কলকাতাই ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রধান কেন্দ্র — একদিকে বি.এন. সরকারের 'নিউ থিয়েটার্স', অপরদিকে সি.সি. সাহার 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায় — তিনি হয়ে ওঠেন সিনেমা ও সংগীতজগতের কিংবদন্তির নায়ক। 'যখন রব না আমি দিন হলে অবসান' ('পরিচয়'), 'পাখী আজ কোন কথা কয়' ('পরিচয়'), 'বাঁধিনু মিছে ঘর' ('দেশের মাটি'), 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' ('দেবদাস'), 'এই পেয়েছি অনল জ্বালা' ('জীবনমরণ'), 'এ গান তোমার শেষ করে দাও' ('সাথী'), 'এখনই উঠিবে চাঁদ' (কাব্যগীতি, নন্-ফিল্ম), 'নাই বা ঘুমালে প্রিয়' (কাব্যগীতি, নন্-ফিল্ম), 'বালম আও বসো মেরে মন্ মে' ('দেবদাস'), 'দুখ্ কে অব্ দিন বিতা নহিঁ' ('দেবদাস'), 'প্রেম কহাঁ ইস্ জগ্‌মে', 'আওরি ঝুলন ঝুলায়ে', 'হরি হো ব্রজরাজ দুলারে', 'দিন নিকে বীতে যাতে', 'লাখ সহি আব পীকি', 'লাগ্ গ্যয়ি চোট্', 'উয়ে তো সরফ্ আল্লা আল্লা' — 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে' প্রকাশিত সায়গলের এইসব নন্-ফিল্ম ও ফিল্মের গান আজও মানুষকে উদাস ও স্মৃতি-ভারাতুর করে তোলে।

সায়গল রবীন্দ্রসংগীতও গেয়েছিলেন ফিল্মের জন্যে — সেই রেকর্ডও বেরিয়েছিল 'হিন্দুস্থান' থেকে : 'আজ খেলা ভাঙার খেলা' ('পরিচয়'), 'আমার রাত পোহালো' ('পরিচয়'), 'এ দিন আজি কোন ঘরে গো' ('পরিচয়'), 'একটুকু ছোঁয়া লাগে' ('পরিচয়'), 'তোমার বীণায় গান ছিল' ('জীবনমরণ') ও 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান' ('জীবনমরণ')। এই শেষের গানটির রেকর্ডিংয়ের সময় এক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ করেছেন সেই ঘটনা : 'যতদূর মনে পড়ছে, 'জীবনমরণ' বাণীচিত্রের দুটি গান রেকর্ড হবে। দুটিই রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল। তার মধ্যে একটি গান হচ্ছে 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান' — এই বাণীচিত্রটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন তৎকালের একজন বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন বলে সবাই তাঁকে ঠাট্টা করে মোটাদা বলে ডাকত।'

'... সাইগল গাইছেন ভুল করে, 'আমি আমায় যত শুনিয়েছিলেম গান' — এই স্টুডিওতে বসে তিনি গান করছিলেন। ... ওই হরিদা তখন বললেন, 'সাইগল, তুই ভুল করে 'আমি আমায় যত' গাইচিস কেন রে? পাগলের মত — '; 'কেন মোটাদা? আমি তো ঠিকই গাইচি 'আমি আমায় যত' — 'কি রে — তোকে তো আমি শিখিয়ে দিলাম ভাল করে, 'আমি তোমায় যত' হবে, তুই তো লিখেও নিয়েচিস।' 'হরিপদদা এই 'তুমি'টা কে আমায় বলতে পারো?' 'কেন? 'তুমি'টা হচ্ছে ভগবান ...।' তখন সাইগল হাসতে হাসতে বললেন, 'মোটাদা, একথাটা অস্বীকার করতে পারো যে, সেই যে 'তুমি' — তিনি কি আমার ভেতরে নেই? আমার মধ্যেও তো ভগবান রয়েছেন ...। তা আমি যদি সত্যি সত্যি মন-প্রাণ দিয়ে আমাকেই গান শোনাতে পারি তো সেই গান তো 'তুমি'র কানেতে গিয়ে পৌঁছাবে।'

'তাঁর এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনে আমরা সবাই একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর তিনি হাসতে হাসতে 'আমি তোমায় যত' ঠিকভাবেই গান করতে আরম্ভ করলেন। আজ ভাবি সত্যি সত্যি তিনি ভুল করে গেয়েছিলেন না আমাদের একটু বেকায়দায় ফেলবার জন্যে ওভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সেই কতদিন আগের কথাটি আজকেও কেন যেন কানে শুনতে পাচ্ছি। যে কেউ এই রেকর্ড শুনুন, তিনি এর ভেতর এমন একটা জিনিস খুঁজে পাবেন যেটা সত্যিই সবার মনকে অভিভূত করে। এটা হিন্দুস্থান স্টুডিওতে ১৯৩৮-৩৯ সনে ঘটেছিলো।'

সায়গল ১৯৪৩-এ কলকাতা ছাড়েন আর তার দু'বছর আগে ১৯৪১-এ 'হিন্দুস্থান'-এ শেষ রেকর্ডিং করেন রাইচাঁদ বড়ালের পরিচালনায় *পরিচয়* ও *লগন* ছায়াছবির বেশ কয়েকটি গানের। সুরের সাধক সায়গলকে খেয়েছিল সুরায় — মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে এই অসামান্য শিল্পী চলে যান। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর 'হিন্দুস্থান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রেকর্ড'-প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সংকলিত লেখায় Nalin Shah এই কালজয়ী শিল্পীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে-মন্তব্য করেছিলেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য : 'The fact that even 50 years after his death Saigal is heard, remembered and his memory cherished testifies to his legendary status not enjoyed by any other singer before or ever since. In the short span of 15 years of his film career, he acted in 26 films and sang a little more than 200 songs. Whatever little he did was enough to enable him to leave behind his foot-prints on the sands of time as if they were cast in a imperishable bronze.' নিবন্ধকার বলতে ভুল করেননি, রেকর্ড-সংগীতে সায়গলের এই প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির পেছনে 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র ভূমিকার কথা : 'It was Chandi Babu, the founder/proprietor of Hindusthan Records who became instrumental in Saigal's rise to fame.'

ছয়

সায়গলের সঙ্গে সুধীরলাল চক্রবর্তীর অনেক দিক দিয়েই মিল ছিল। মায়াবী চেহারার অধিকারী দু'জনেরই কণ্ঠ ছিল দরদভরা, জনপ্রিয়তার ব্যাপারেও তুলনা হতে পারে, দুজনেই ছিলেন সুরাসক্ত আর অকাল-প্রয়াণেও সাদৃশ্য আছে — সায়গল বিদায় নেন ৪৩ বছর বয়সে, সুধীরলাল মাত্র ৩৩-এ। যে-কোনো সংবেদনশীল শ্রোতার মনে পড়বে সুধীরলালের 'মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে,/ মা'কে মনে পড়ে' — এই গানটির কথা। অসমাপ্ত শিল্পীজীবনে তিনি যে খুব বেশি গান গেয়েছিলেন, তা নয়। কিন্তু যা করেছিলেন, তাই তাঁকে অমর করে রেখেছে। 'হিন্দুস্থানে'র জন্যে তিনি 'রজনী গো যেও না চলে', 'খেলাঘর মোর ভেসে গেছে হায়, নয়নেরি যমুনায়', 'এ জীবনে মোর', 'এ দুটি নয়ন', 'কেন ডাক পিয়া', 'আঁখি যদি ভোলে', 'সন্ধ্যামালতী বনে', 'শুকনো পাতা ঝরে যায়' — এমন কিছু গান গেয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'র সঙ্গে এককালে যিনি সম্পৃক্ত ছিলেন, সেই শিল্পী বিমান মুখোপাধ্যায় যখন সাক্ষ্য দেন দ্বিতীয় গানটির রেকর্ড 'কয়েক লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছিল', তখন এই সভ্যভাষ্যকেও অবিশ্বাস্য মনে হয়। 'যো প্রীত করে ওহি', 'কোয়েল কাঁহা কু শুনায়', 'হুই ভুল ইয়ে মুঝসে', 'কোই চাঁদ চমক দেখ্‌লায়া' —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমন কিছু মর্মস্পর্শী হিন্দি গানের রেকর্ডও করেছিলেন সুধীরলাল।

সাত

'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'র বাঁধা-শিল্পী শচীন দেববর্মন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের আরেক সম্পদ। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া তখনকার নিয়ম-অনুসারে বেশির ভাগ শিল্পীই কোনো না কোনো কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ বাঁধা-শিল্পী হিসেবে কাজ করতেন। শচীনকর্তা তেমনি বাঁধা পড়লেন 'হিন্দুস্থানে'। যদিও রেকর্ডে গান দেওয়া নিয়ে এর আগে শচীনকর্তার ভারি তিক্ত ও অবমাননাকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'-এ তিনি যখন গান রেকর্ড করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যান, এইচএমভি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাঁর কণ্ঠের কথিত ত্রুটির কারণে — মানে অনুনাসিক স্বরের জন্যে। যদিও উত্তরকালে এই ত্রুটিই শচীনকর্তার গুণ হয়ে উঠেছিল — বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমাদর পেয়েছিল। শচীনকর্তার প্রথম গানের রেকর্ড বের হয় এই 'হিন্দুস্থান' থেকেই। তিনি লোকগানে যেমন, আধুনিক গানেও তেমনি সুর ও গায়কীতে একটি নতুন 'ধরন' সৃষ্টি করেছিলেন। 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র চুক্তিবদ্ধ শিল্পী হিসেবে সব মিলিয়ে তাঁর ৫৫টি গানের রেকর্ডিং হয় এই প্রতিষ্ঠান থেকে। ১৯৩২-এ ১১ নম্বর রেকর্ডে হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শৈলেন রায়ের কথায় প্রথম তাঁর এই গান দুটি প্রকাশ পায় — 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে যাই' ও 'এই পথে আজ এস প্রিয় কর না আর ভুল'।

তিরিশের দশককে বাংলা গানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। গ্রামোফোন রেকর্ডের সৌজন্যে এতো অসাধারণ সব শিল্পী তাঁদের কণ্ঠের সুরের মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছেন তার কোনো তুলনা হয় না। একেকজন শিল্পী আলাদা আলাদা গায়কীর বৈশিষ্ট্যে বাঙালি শ্রোতাকে মুগ্ধ-অভিভূত করেছেন। শচীনকর্তাও এই সংগীত-ভুবনে এক নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিলেন। লোকগান — মূলত ভাটিয়ালি, আধুনিক, রাগপ্রধান, ধর্মগীতির (বিজয়া-আগমনী) পাশাপাশি হিন্দি গান ও ভজনও রেকর্ড করেছিলেন। বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষাতেই ফিল্মের গানও গেয়েছেন। নিজেই তাঁর গানের বিষয়ে বলেছেন : 'এই সময় থেকে আমি নিজে গানের সুর-রচনা করতাম এবং নিজেই গাইতাম। ... এখন থেকেই নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, নিজের স্বতন্ত্র স্টাইলে সুর-রচনা আরম্ভ হল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ-ছ বছরে লোকসঙ্গীত ও ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের সংমিশ্রণে নিজস্ব ধরনে সুর-রচনা করলাম — যা অন্য কারো সঙ্গে মিলল না। এইভাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার নিজস্ব গায়কী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম ... এবং জনসাধারণের নিকট থেকে সমর্থনও পেয়েছিলাম এই প্রচেষ্টায়, তাঁদের নিকট জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করে' ('সরগমের নিখাদ' : ১৩৭৬ সালে *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত)।

সেকালে সব গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানিই মাসে মাসে নিয়মিত তাদের গানের তালিকা-পুস্তিকা বের করতো। তাতে প্রকাশিত রেকর্ডের গানের বিবরণ যেমন থাকতো, তেমনি উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের পরিচিতিও মিলতো। ১৯৩৬-এর অক্টোবর 'শারদীয় আনন্দ নিবেদন' নামে প্রকাশিত 'হিন্দুস্থানে'র রেকর্ড-বিবরণীতে ওই মাসে প্রকাশিত সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সুরে এবং অজয় ভট্টাচার্য ও বিনয় মুখোপাধ্যায়ের কথায় শচীনকর্তার 'মম মন্দিরে এলে কে তুমি' ও 'নতুন ফাগুনে যবে আজি ধরা চঞ্চল' গান দুটি সম্পর্কে বলা হয় : 'কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মণ শুধু বাংলা কেন সারা ভারতের সঙ্গীত রসগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত। তাঁহার এইবারকার গান দুইখানিতে সঙ্গীত-দেবতার আরতি সম্পূর্ণ করিয়া যথার্থই যেন মরুতে মলয়া বহাইয়াছেন।' শচীনকর্তার রেকর্ড সম্পর্কে এ-রকম উচ্ছ্বসিত ভাষার বিজ্ঞাপন মাঝে-মধ্যেই 'হিন্দুস্থানে'র ক্যাটালগে প্রকাশ পেতো।

শিল্পী হিসেবে শচীনকর্তার নাম ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'র। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে তাঁর প্রায় শ'দুই গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল। এইচ.এম.ভি.-ও অনেক পরে তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। বাংলা গানের ভেতরে আধুনিক ও লোকগান যেমন ছিল, তেমনি নজরুলগীতিও ছিল চারটি। প্রায় সব গানই শচীনকর্তা নিজের সুরেই গেয়েছেন, কিছু গানের সুরস্রষ্টা নজরুল ও সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। 'ও কালো মেঘ বলতে পারো', 'স্বপন না ভাঙ্গে যদি', 'যদি দখিনা পবন', 'ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায়', 'ওরে সুজন নাইয়া', 'তুমি নি আমার বন্ধু', 'বন্ধু বাঁশী দাও মোর হাতেতে', 'ফুলের বনে থাকো ভ্রমর', 'পিঞ্জরার পাখীর মত', 'তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে', 'প্রেমযমুনারি পারে মোর হিয়া কেঁদে মরে', 'কাঁদিব না ফাগুন গেলে', 'ছিল মাধবী রাতি গো', 'প্রেমের সমাধি তীরে', 'গোধূলির ছায়াপথে', 'মলয়া চল ধীরে', 'তুই কি শ্যামের বাঁশীরে', 'বঁধু গো এই মধুমাস', 'প্রেমযমুনায় হয়ত কেউ', 'হায় কি যে করি এ মন নিয়া', 'বঁধু এস মধুরাতে', 'এই মহুয়া বনে', 'নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা', 'পোহাল রাতি জাগিয়া', 'কোকিলা রে গেও না গান', 'বাঁশী শুনে আর কাজ নাই' — 'হিন্দুস্থান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রেকর্ডে' ছাপা শচীনকর্তার এইসব গান সংগীতরসিক বাঙালিকে আজও স্মৃতিকাতর করে তোলে। কালজয়ী এই শিল্পী প্রচুর ব্যবসা দিয়েছিলেন 'হিন্দুস্থান'কে। আজও শচীনকর্তার গানের আবেদন নতুন যুগের শ্রোতাদের কাছে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তাঁর গান নিয়ে হালে সেকালের সুরস্মৃতির একটি অনবদ্য সিডি-অ্যালবাম বের করেছে 'হিন্দুস্থান রেকর্ড'।

আট

রবীন্দ্রকণ্ঠ রেকর্ডের ভেতর দিয়ে উদ্বোধন হয়েছিল 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'র। রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড-প্রকাশেও 'হিন্দুস্থান' সবসময়ই সক্রিয় ছিল। খোদ রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে পঙ্কজকুমার মল্লিক, কুন্দনলাল সায়গল, অমিয়া ঠাকুর, অমিতা সেন, সাহানা দেবী, শান্তিদেব ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাসের মতো শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড করেছেন 'হিন্দুস্থান' থেকে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুরু রেকর্ডে, আর তা পূর্ণতা পায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর রবীন্দ্র-কবিতা ('কালি মধুযামিনীতে' ও 'বহুদিন মনে ছিল আশা') আবৃত্তির রেকর্ড-প্রকাশে।

লোকগীতি ও ধর্মীয় সংগীতের রেকর্ডও প্রায় গোড়া থেকেই বের হয়েছে 'হিন্দুস্থান' থেকে। শুরুটা হয়েছিল শচীন দেববর্মনকে দিয়েই। তারপর এসেছিলেন পারুলবালা চৌধুরানী, মুকুন্দলাল দে, গোপালীবালা, কুসুম গোস্বামী, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় এবং দেশভাগের পরে পূর্ণদাস বাউল ও অমর পাল। বিস্ময়-জাগানো খবর হলো, 'কবি জসীমউদ্‌দীন ও পার্টি' লোকগীতির একটি রেকর্ড করেছিলেন (রেকর্ড নং — এইচ-২৭৯ এবং গান দুটি — 'ও প্রাণ সখি' ও 'জনমদুঃখী রাধা লো তোর')। কীর্তন বা ভক্তিগীতিতে নাম করতে হয় রেণুকা সেনগুপ্তা (দাশগুপ্তা), অনুপম ঘটক, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, রাধারানীর। 'হিন্দুস্থান' থেকে ইসলামি গানের রেকর্ডও বের হয়েছিল, শিল্পী ছিলেন গোলাম কাদের — ইনি গেয়েছিলেন 'উঠেছে দিনের রবি' ও 'নবীর মদিনায়'। আবদুল হালিম চৌধুরী বেশকিছু গান রেকর্ড করেন, তার মধ্যে উল্লেখ্য — 'জিন্দেগি তোর আখের', 'ইয়া ইলাহী কবুল কর', 'রসুল নামে কে এল', 'নবী দীনের রসুল'। অনেক নামকরা কাওয়ালের রেকর্ড বেরিয়েছিল। পান্নালাল বসু নামে এক শিল্পী 'পান্না-কাওয়াল' নাম নিয়ে বাংলা কাওয়ালি রেকর্ড করেন এবং তার বেশ সমাদরও হয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয়

বহুকালের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ভারতীয় মার্গসংগীত নবাব-নাজিম, জমিদার-বিত্তবানদের জলসাঘর ও বৈঠকখানায় ছিল বন্দি। গ্রামোফোনের সৌজন্যে তা মুক্তি পেয়ে আমজনতার আস্বাদনের সামগ্রী হয়ে ওঠে। মার্গসংগীতের দিকপালেরাও তশরিফ এনেছিলেন 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র গানের বাড়িতে। উল্লেখ করতে হয় ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, শ্রীকৃষ্ণ রতনঝঙ্কার, পণ্ডিত দিলীপচাঁদ বেদীর পাশাপাশি সুন্দর বাই, মুস্তারি বাই, ওস্তাদ আসফক হোসেন, ওস্তাদ আতা হোসেন খাঁর কথা। ফৈয়াজ খাঁ বা বড়ে গোলাম আলী তিন মিনিট সময়ের মধ্যে কী করে খেয়াল বা ঠুম্‌রি শেষ করতেন সে ছিল এক বিস্ময়। 'হিন্দুস্থানে'ই এঁদের গান প্রথম রেকর্ড হয়। বড়ে গোলাম আলীর গাওয়া 'বাজুবন্দ্ খুলু খুলু যায়' ঠুম্‌রিটি পরে বেগম আখতারসহ আরো কেউ কেউ 'মেগাফোন' বা অন্য কোনো কোম্পানি থেকে রেকর্ড করেছিলেন, কিন্তু কেউই খাঁ সাহেবকে অতিক্রম করতে পারেননি। ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠের রেকর্ড — 'মেরে মন্দির আবহু নঁহী আয়ে', 'কর আই পিয়া সঙ্গ রঙ্গ রলিয়া', 'ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়ল', 'তড়পত হুঁ জৈসে জল বিন মীন' — শ্রোতাকে এক সম্মোহনের ঘোরে আচ্ছন্ন করে রাখে। উত্তরকালের খ্যাতিমান শিল্পী কুমার গন্ধর্ব 'হিন্দুস্থানে' যখন 'শ্যামসুন্দর মদনমোহন' ও 'সখি মেরি রিম্‌ঝিম্' রেকর্ড করেন তখন তিনি একেবারে ছেলেমানুষ — বিজ্ঞাপনে তাই তাঁকে 'ভারত-বিখ্যাত সুর-রসিক বালক' বলে উল্লেখ করা হয়।

যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে সেতারবাদক প্রফেসর ওয়ালিউল্লা খাঁ, সানাইবাদক প্রফেসর নাজির হোসেন, ক্ল্যারিওনেটবাদক গোপালচন্দ্র লাহিড়ী, সরোদবাদক তিমিরবরণ ও রাধিকামোহন মৈত্রের রেকর্ড বেরিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান থেকেই। ওস্তাদ বিসমিল্লাহ্ খাঁর সানাইয়ের প্রথম রেকর্ড প্রকাশের কৃতিত্বও 'হিন্দুস্থানে'র। এ-থেকে বোঝা যায়, মার্গসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের ভারতখ্যাত শিল্পীদের কদরদানি করতে 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' কতোখানি আন্তরিক ও উদ্‌যোগী ছিল।

দশ

'হিন্দুস্থান ও 'মেগাফোনে'র সৌজন্যে ফিল্মের গান বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। 'হিন্দুস্থান' হাতি-মার্কা প্রতীকের নিউ থিয়েটার্সের ফিল্মের গানের রেকর্ড প্রকাশ করে বাংলা গানের ভুবনে নতুন এক স্বাদ এনে দেয়। অবশ্য 'মেগাফোন কোম্পানি'র ভূমিকার কথাও স্মরণ করতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়। 'মেগাফোন' মূলত কানন দেবীর গাওয়া ফিল্মের গানই রেকর্ড করার অনুমতি পায়, কেননা কানন ছিলেন 'মেগাফোনে'র নিজস্ব শিল্পী। পাহাড়ী সান্যাল চলচ্চিত্রের শিল্পী হিসেবেই পরিচিত, কিন্তু তিনি যে গায়কও ছিলেন — ফিল্মেও গান করেছেন, তার স্বাক্ষর মিলবে 'হিন্দুস্থানে'র সৌজন্যে। নিউ থিয়েটার্সের পাশাপাশি 'হিন্দুস্থান' থেকে 'ইস্ট ইন্ডিয়া' ও 'কালী ফিল্মে'র রেকর্ডও বের হয়। 'হিন্দুস্থানের 'H' চিহ্ন-নম্বরেই আবার আলাদাভাবে 'ভারতবাণী রেকর্ড'ও বেরিয়েছিল।

এগারো

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি' এক ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করেছিল। 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র গৌরবময় অবদান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীদের কণ্ঠে উদ্দীপনামূলক জাগরণী দেশগানের রেকর্ড প্রকাশ। অংশুমান রায় ও করবী নাথের কণ্ঠে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত 'শোন, একটি মজিবরের থেকে/ লক্ষ মজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি,/ আকাশে বাতাসে ওঠে রণি/ বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ' — এই সংগ্রামী-চেতনার আবেগসঞ্চারী গানটির রেকর্ডও বের হয় 'হিন্দুস্থান' থেকে। মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের কয়েকটি রেকর্ড প্রকাশ পায় — তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামল গুপ্তের লেখা 'হাজার বছর পরে আবার' ও 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের' গান নিয়ে বেরুনো রেকর্ডটি। বেরিয়েছিল দেবব্রত বিশ্বাস ও অমর পালের রেকর্ডও। 'হিন্দুস্থান' মুক্তিযুদ্ধের সময়ে 'বিক্ষুব্ধ বাংলা' নামে যে সংগীত-আলেখ্যর একটি রেকর্ড বের করে তা খুবই সমাদর পেয়েছিল।

বারো

'হিন্দুস্থানে'র রেকর্ড-নাট্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় ও পরিচালনায় প্রকাশিত হয় দুই খণ্ডের রেকর্ড-নাট্য 'আলমগীর'। ১৯৩২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বাংলা-হিন্দি-উর্দু-উড়িয়া ভাষার ৩০টি পালা-রেকর্ড বের হয়। সামাজিক-পৌরাণিক-ঐতিহাসিক এই পালাগুলো সেকালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, এর মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় 'ফুল্লরা', 'ভীষ্ম', 'শ্রীরাধা', 'মহুয়া'র। এর বাইরে গুরখালি ('সতী মালাবতী') ও নেপালি ভাষার ('শ্রী স্বস্থানী') পালা-রেকর্ডও প্রকাশিত হয়।

'হিন্দুস্থান' বাংলা ছাড়াও হিন্দি-উর্দু-উড়িয়া-মণিপুরি-গুরখালি-নেপালি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষায় রেকর্ড প্রকাশের ভেতর দিয়ে সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও পরিচিতি লাভ করে। রেকর্ডের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের নামে গ্রামোফোন-যন্ত্র, রেডিও সেট, বৈদ্যুতিক পাখাও তৈরি হতো। নানা কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ লিমিটেড' বাঙালির একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

তেরো

গান রেকর্ড করার সুবাদে অতুলপ্রসাদ সেন 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র বাড়িতে এসেছিলেন ১৯৩২-এর ২৭ মার্চ। ওই দিন তিনি এই নবীন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দেখে যে-মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন একই সঙ্গে তা প্রেরণাদায়ক ও ভবিষ্যতের জন্যে দিক্-নির্দেশক। তিনি বলেছিলেন : 'হিন্দুস্থান রেকর্ড গৃহে যাইয়া সেখানকার যন্ত্রাদি ও গানের ছাপ তুলিবার সুনিপুণ প্রণালী দেখিয়া বড় প্রীত ও আশান্বিত হইয়াছি। এ দেশের এ নবীন উদ্যমের আমি পূর্ণ সফলতা কামনা করি। যে আদর্শ ও উৎসাহ লইয়া এ প্রতিষ্ঠানের শিল্পী ও কর্তৃপক্ষীয়েরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন আমি ভরসা রাখি যে প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের চেষ্টা প্রতিহত হইবে না, বরঞ্চ দেশবাসীগণের সহানুভূতি ও পোষকতা লাভ করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।' দুর্ভাগ্যের বিষয় অতুলপ্রসাদ এর দু-বছর পরেই প্রয়াত হন, ফলে 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে'র সূচনাটুকুই দেখেছিলেন, পূর্ণ বিকাশ দেখে যেতে পারেননি।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গসংগীতের এক মহান কলাকার অমিয়নাথ সান্যাল ৭ জানুয়ারি ১৯৩৩ এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষেপে যে অভিমত জানান তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ : 'হিন্দুস্থান সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও তাঁহাদের কীর্ত্তি দেখে আশা হয় বাঙ্গালী বোধ হয় বাঙ্গলা গান ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। তাঁদের বাঙ্গলা রেকর্ড শুনে বাঙ্গলা গান হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে ভাল লেগেছে অন্ততঃ আমার নিজের।' শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিবেশনার যে ঢঙ ও মেজাজ তা-যে তিন মিনিট সময়ের মধ্যে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা ভারি কঠিন, এই মন্তব্যে তার ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়।

সরলা দেবী ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ তারিখে 'হিন্দুস্থানে'র অক্রুর দত্ত লেনের বাড়িতে আসেন। আসার সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান করা চলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে জড়িত ছিলেন, তাই হয়তো পরিদর্শনের আমন্ত্রণ এসেছিল। 'হিন্দুস্থানে'র গান রেকর্ডের পদ্ধতি দেখে তিনি খুশি ও আশান্বিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণে এর যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে তা এইরকম : 'হিন্দুস্থান রেকর্ড আপিসে আসিয়া ও হিন্দুস্থান রেকর্ড শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। বিজ্ঞানের আবিষ্কার স্বায়ত্ত করিয়া বাঙ্গালী তার দ্বারা নিজের ধন ... বৃদ্ধি করিবে ইহা সুখের কথা, কিন্তু তার চেয়েও আশার কথা এই যে ইহাতে দেশী সঙ্গীতের আদর ও তদ্বির বাড়িবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গান শেষ করা, গানে কর্ডের অলঙ্কার বসান, শুধু বহুকণ্ঠের নয় — বহুস্বরিক গানেরও প্রবর্ত্তন করা, গানের স্বর কখনো প্রবল কখনো মৃদু করিয়া গানে ভাবের সমাবেশ করা প্রভৃতি নানাদিকে বিস্তৃতির পথ যে খোলা আছে তার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে; ঐক্যতানিক যন্ত্রসঙ্গীতের উন্নতি করা সম্ভব হইবে।'

'হিন্দুস্থান'এর কর্ত্তৃপক্ষদের আমি তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি [।]'

বহুকাল পরে, 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি' যখন প্রতিষ্ঠার ৩৫ বছর অতিক্রম করেছে, কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বলেছিলেন : 'বাংলা দেশে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস — আমাদের সাহিত্যসংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে সেবা করে আসছেন — তার মধ্যে ব্যবসায় বোধ ও বুদ্ধি থেকে সাহিত্যসংস্কৃতির শ্রদ্ধা বড় — এই সত্য নিজে অন্তরে উপলব্ধি করেই সকলকে বলতে আনন্দ বোধ করছি। এর মধ্যে একটি শুভবুদ্ধি ও প্রেরণা আছে। ব্যবসায়ের সার্থকতা নিশ্চয়ই কাম্যবস্তু — কারণ ব্যবসায় সফল না-হলে পরমায়ু হারায় কিন্তু এই সেবার শুভবুদ্ধি ও প্রেরণা আরও বড়। ব্যবসায়ের পরমায়ুকে সে আশীর্ব্বাদযুক্ত করে। সেই আশীর্ব্বাদে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস জয়যুক্ত হোক' (১ বৈশাখ ১৩৭৪)। এই মূল্যায়ন ও শুভকামনা ছিল বাংলার সাহিত্য-শিল্প ও সংগীত-সংস্কৃতির ভুবনের খ্যাতকীর্তি মানুষদেরই মনের কথার প্রতিধ্বনি।

চোদ্দ

১৮৯৫ সালে মতিলাল সাহা সংগীত-বাদ্যসামগ্রীর ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর পুত্র চণ্ডীচরণ সাহা ১৯২২-এ নিজের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান খোলেন। বিদেশ ঘুরে এসে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'। তাঁর রুচি, শ্রম, নিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি 'হিন্দুস্থান'কে একটি মর্যাদাবান প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। ২৮ আগস্ট ১৯৭৫ তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানের হাল ধরেন তাঁর দুই পুত্র — মোহনলাল সাহা ও শোভনলাল সাহা। ডিস্‌ক রেকর্ডের পর ক্রমে ক্যাসেট, সিডি, তারপর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডিভিডি — প্রযুক্তি-বিবর্তনের এই ধারাকে অনুসরণ করেই এগিয়ে চলেছে 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড'। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবের মুকুটে আরো একটি পালক যুক্ত হয়েছে ১৯৭৭-এ 'দ্য ইন্ডিয়ান রেকর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড' — 'ইন্‌রেকো' (INRECO) প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে। 'ইন্‌রেকো' 'হিন্দুস্থানে'র সহযোগী কিংবা পরিপূরক প্রতিষ্ঠান। চণ্ডীচরণ সাহা যেখানে শেষ করেছিলেন, তাঁর পুত্ররা সেখান থেকে শুরু করেছেন। 'ইন্‌রেকো' আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশের বছর দুই আগেই ডিস্‌ক রেকর্ড ছাপার কারখানা স্থাপন করে কলকাতার হাইড রোডের কাছে ১ নম্বর সোনাপুর রোডে। 'হিন্দুস্থান' প্রায় দশটি ভাষায় রেকর্ড প্রকাশ করেছিল, 'ইন্‌রেকো' তার সঙ্গে যুক্ত করেছে অন্তত আরো আটটি ভাষার শিল্পীদের। কালের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শক্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে 'ইন্‌রেকো'। এই সাফল্যের মূলে 'হিন্দুস্থানে'র প্রেরণা ও আদর্শ জড়িয়ে আছে। 'ইন্‌রেকো' 'হিন্দুস্থানে'র রেকর্ড লেবেলের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার সেই রাখাল বালকের বাঁশি-বাজানোর ছবিটি তার অস্তিত্বের সঙ্গী করেই সামনের পথে এগুচ্ছে। 'ইন্‌রেকো' গড়ে তুলে সংগীত-স্বাপ্নিক সাহা-পরিবারের তৃতীয় পুরুষেরা শতবর্ষের পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন।

গ্রন্থঋণ

সন্তোষকুমার দে : *কবিকণ্ঠ ও কলের গান*। বিশ্বভারতী, ১৩৯৯।
পঙ্কজকুমার মল্লিক : *আমার যুগ আমার গান*। কলকাতা, ১৯৮০।
সিতাংশুশেখর ঘোষ : *বিমানে বিমানে আলোকের গানে*। কলকাতা, ২০০৩।
দেশ (সাপ্তাহিক, কলকাতা) : ১৬ পৌষ ১৩৮৯।
কালি ও কলম (মাসিক, ঢাকা) : ফাল্গুন ১৪১৬।
*হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি*র ক্যাটালগ ও অন্যান্য কাগজপত্র।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কে. মল্লিক

বাংলা গানের বিস্মৃত যুবরাজ

বাংলা গানের এককালের যুবরাজ কে. মল্লিক সম্পর্কে কিছু কথা বলতে গিয়ে বারবার রবীন্দ্রনাথের এই বিষণ্ণ পঙ্‌ক্তিমালা স্মরণে আসে :

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥

কে. মল্লিক গত শতকের প্রায় গোড়া থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত বাংলা গানের জগতে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠের সুরধারায় মাতিয়েছিলেন সংগীতপ্রিয় বাঙালি সমাজকে — উঠেছিলেন লোকপ্রিয়তার শিখরে। তারপর একসময় তিনি হারিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অন্তরালে, রইলেন কেবল স্বল্পজনের শ্রুতিতে। তাঁর গান সম্পর্কে হয়তো এই কথাই সত্য হলো, — 'বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে জানি'।

দুই

কে. মল্লিকের জীবন, তাঁর সুরের তৃষ্ণা আর শিল্পী হয়ে ওঠার কাহিনি যেন একটি উপন্যাসের বিন্যাসেই রচিত। জন্মেছিলেন কুসুমগ্রামে, এক সামন্ত পরিবারের দরিদ্র শাখায়। পৃষ্ঠপোষক জ্ঞাতির অকালমৃত্যুতে তাঁর উদার আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার তেমন সুযোগ হয়নি। অতি কৈশোরেই জীবন এসে দাঁড়ায় কঠোর-কঠিন দারিদ্র্যের মুখোমুখি। সুরের নেশা বুকে নিয়ে জীবিকার প্রয়োজনে একসময়ে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন কলকাতা মহানগরীর উদ্দেশে। সেখান থেকে আবার পশ্চিমে। কলকাতা-কানপুর-ঝরিয়া তাঁর জীবিকার পাশাপাশি সুরের পিপাসাও মিটিয়েছে।

অসাধারণ সংগীতপ্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। সেই গুণে বনফুলের মতোই বেড়ে উঠেছিলেন গ্রামে। পরে যখন গ্রাম ছাড়লেন, কলকাতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে গেলেন বাংলা মুলুকের বাইরে, তখন পেশাদার ওস্তাদের কাছে তালিমের সুযোগ মিললো। তারপর আবার কলকাতায় ফিরে চামড়ার যাচনদারির মাঝখানে, বলতে গেলে প্রায় আকস্মিকভাবেই আমন্ত্রণ পেয়ে যান গ্রামোফোন কোম্পানির। অনায়াসেই জয় করে নিলেন সুরের আসনখানি। আর এই সূত্রেই মুন্সী মহাম্মদ কাসেম রূপান্তরিত হলেন কে. মল্লিকে। এর পরের ইতিহাস শুধু সামনে এগোনোর। পেছন ফিরে আর তাকাতে হয়নি। অর্থ-খ্যাতি, সম্মান-স্বীকৃতি এসে সহজেই ধরা দিয়েছে তাঁর সুরলোকের ঝাঁপিতে।

তাঁর রেকর্ডে গান দেওয়ার ইতিহাস বেশ চমক-জাগানো। তাঁর স্মৃতিকথায় সেই ঘটনার যে অন্তরঙ্গ বিবরণ মেলে, তা দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতিযোগ্য :

> আমার কলিকাতা আসার পর বাবু গোরাচাঁদ মল্লিকের বৈঠকখানায় সকাল-সন্ধ্যায় প্রায় যাইয়া গান করিতাম গোরাচাঁদবাবু আমায় খুব ভালবাসিতেন। গোরাচাঁদবাবু খুব ধনি লোক কাশিনাথ মল্লিকের নাতি, বাঙ্গুর বিলডিং ইহাদের ঠাকুরের প্রপার্টি। কলিকাতা আসিবার ৮/১০ দিন গত হইলে পট্টীর সমস্ত লোকে একদিন ধরিল মানু মিয়া কেহ বলে কাসেম সাহেব ৩/৪ বৎসর কানপুরে গান শিক্ষা করে আসিলেন আজ আমাদের একটু গান সোনাইতে হইবে। কেহ তবলা কেহ বা হারমোনিয়ম যোগাড় করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম ভাই আমার মন মেজাজ ভাল নাই হাতে তেমন পয়সাকড়ি নাই কলিকাতায় আসিয়াছি একটী কাজকর্ম্মের সন্ধ্যানে আছি একটি কাজ পাইলেই আনন্দের সহিত গান শোনাইব। খোদার এমনি মর্জ্জি ২/১ দিনের মধ্যে নসরুদ্দিন সাহেব মস্ত ধনি লোক চীনাপাড়ায় তাঁহার বাড়ি ও গুদাম সেইখানে তাঁহার কাছে ২০ টাকা বেতনে কাজ অর্থাৎ সেই মোসের চামড়ার যাচনদারি কাজ করিতে লাগিলাম। এইরূপভাবে কিছুদিন গত হইলে পট্টীর সকলে গানের জন্য ধরিল কি করিব হারমোনিয়ম লইয়া তুলাপট্টীর মোড়ের নিকট চিৎপুর রোডের উপর মোনসেফ আলির দোকানে একটী বাংলা গান গাইতেছিলাম ১৫/২০ জন পথিক গান শুনিতেছিল এমন সময় যে কাপড়ের দোকানে পূর্ব্বে ২/১ মাস পেটভাতায় কাজ করেছিলাম সেই দোকানদারের একজন আত্মীয় ও আরও ২/১ জন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, একেবারে দোকানে উঠিয়া আরে কাসেম ভাই আচ্ছা গানা শিখা তো একঠো হিন্দি ভজন হাম লোক কো শোনা দোও গানা বহুত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা লাগতা হ্যায়। এদিকে চীৎপুর রোড ঐখানে খুব সংকীর্ণ এত লোক জমে গেছে গাড়ি ও ট্রাম প্রায় বন্ধ হইয়াছে। এমন সময় ২/৩ জন পুলিস আসিয়া গান বন্ধ করাইলেন, অনেক লোক ক্রমে ক্রমে যাইতেছে হঠাৎ একটী মটরে বেকা কোম্পানির ম্যানাজার একটী সাহেব বাবু শান্তি মল্লিককে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিলেন। তখন শান্তিবাবু বলিলেন ওহে ছোকরা তুমি বেকা কোম্পানি রেকর্ডে গান দিবে। সাহেব তোমার গান শুনে খুব মোহিত হইয়াছেন। আমি তখন বলিলাম আমার গান যদি সাহেব রেকর্ড করে গান দিব। এই কথা শুনে শান্তিবাবু বলিলেন কাল বেলা ১২টার সময় এই দোকানে গাড়ি আসিবে তুমি তৈয়ার হয়ে থাকিবে মটর আসিলে সেই মটরে বেন্টিং ষ্ট্রীটে সাহেবের আপিস যাইয়া রেকর্ডে গান দিবে বলে দুইজনেই চলে গেলেন। আমি আনন্দে ছুটিয়া যাইয়া বাবু গোরাচাঁদ মল্লিককে বলিলাম বাবু কাল আমি বেকা কোম্পানির রেকর্ডে গান দিব সাহেব নিজে বলে গেলেন। গোরাচাঁদবাবু [বলিলেন] আমরাও শুনিব, আমি বলিলাম আপনারা খেয়ে যাবেন আমি রেকর্ডে গান দিয়া এসে খাইব, ভাত খাইয়া গান গাইতে কষ্ট হবে। ... রাত্রিতে আমার ঘুম নাই কতক্ষণে সকাল হয় রেকর্ডে গান দিব খালি এই আনন্দ টাকাপয়সার কোন কথা নাই। যাহা হউক পরদিন ঠিক বেলা ১২টার সময় একটী মটর আসিল ড্রাইভার বলিল কোন বাবু রেকর্ডে গান দিবেন আসুন। আমি তো বর সেজে বসে আছি কতক্ষণে গাড়ি আসে, আমি যাইয়া গাড়িতে বসিলাম বেন্টিং ষ্ট্রীটে বেকা কোম্পানির আপিসে যাইয়া একটি সিগারেট খাইতেছি এমন সময় সাহেব এসে বলিলেন বাবু চলুন গান রেকর্ড করুন আমি গান দিতে আরম্ভ করিলাম ৫/৭ খানা গান হইয়াছে এমন সময় বাবু গোরাচাঁদ ২/১ জন আত্মীয়সহ উপস্থিত হইয়া বাবু গানগুলি শুনে বলিলেন পূর্ব্বে যে কয়খানি গান দিয়াছ এই রকম হবে তো আমি বলিলাম এ চেয়ে ভালই হবে। একজন ক্লার্ক আসিয়া আমায় বলিলেন, সাহেব আপনাকে ১২খানি গানে ৩০০ শত টাকা দিলেন আপনি সন্তোষ আছেন তো। আমি তো অবাক হইয়া বলিলাম আপনি শুনতে ভূল করেন নাই তো, বলিল না মশায়। এ্যাঁ ত্রিশ ৩০ টাকা চোখে দেখি নাই ৩০০ টাকা পাইব। Md. কাসেম এই নাম সহি করিয়া যখন ৩০০ টাকা হাতে পাইলাম, আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল কি ভগবানের দান, পালাই যদি সাহেব বলেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গান খারাব হইয়াছে টাকাটা দাও কাল আবার গান লইব। তবে মারা যাইব এদিকে দেখি গোরাচাঁদ মল্লিক শান্তি মল্লিক ইঁহারা কি যেন কথাবার্ত্তা করিতেছেন, আমি এদিক ওদিক করে একেবারে লালবাজারের মোড়ে ট্রাম আসিলে ট্রামে চড়ে সেই দোকান আমার বাঁশায় আসিলাম। সন্ধ্যার সময় শান্তিবাবু আমায় বলিলেন ওহে কাশেম রেকর্ডে তোমার নাম কে মল্লিক দিয়াছি। কাসেমের কে আর আমরা মল্লিক তোমার সঙ্গে থাকিলাম, তোমার কোন আপত্তি নাই তো। গোরাচাঁদবাবুর সহিত যুক্তি করে কে মল্লিক করা হইয়াছে। বলিলাম শান্তিবাবু যে মল্লিক হয় হোক ৩০০্ টাকা পাইয়াছি প্রাণভরে কাপড় জুতা পরি ও পেট ভরে এখন খাই কে মল্লিক নাম দিয়াছেন ভালই হইয়াছে তবে রেকর্ড বিক্রি হয় তবে তো। যাহা হউক ২/৩ মাস পরে একটী রেকর্ড বাজারে বাহির হইল, কারণ বেকা কোম্পানি জার্ম্মান ফারম রেকর্ড জার্ম্মান হইতে ছেপে আসিতে দেরি হয়। প্রথম গান হরি দিবানিশি ডাকি তাই। আমায় দাও দাও দরশন যাতনা জানাই। দ্বিতীয় গান তোমারি আসে বসে আছি বলে তাই কি দেখা দিলে না দিলে না। এই রেকর্ডখানি বেকা কোম্পানির এজেন্ট বল্লভভাই ভাটিয়া খুব ধনী লোক তিনিই বাজারে বাহির করিলেন দুই মাস পরে পুনরায় আর একখানি রেকর্ড বেকা কোম্পানি যেমন বাজারে বাহির করিলেন, রেকর্ডে গান শুনে অন্য কোম্পানির লোক আমার কাছে একে একে আসিয়া নিজ কোম্পানির জন্য গান লইতে চাহিলেন সেই সময় প্যাথিফোন কোং মেড ইন ফ্রান্স আমার নিকট ৬খানি গান লইলেন। ৫/৬ মাস পরে আর একটী অডিয়ন নামে জার্ম্মান ফারম আমার নিকট ১২/১৪খানি গান লইলেন, ঐ কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন বল্লভভাই ভাটিয়া —

হিজ মাষ্টার কোম্পানির লোক আমার কাছে দুই বৎসরের মধ্যে গান লইলেন না। তাঁহারা কেবল বলেন আমাদের সহিত এগ্রিমেন্ট কর তোমার মাসে একখানি করে গান লইব বৎসরে ১২খানি গান লইব। আমি বলি না এগ্রিমেন্ট আমি বুঝি না, অন্যান্ন কোম্পানি প্রত্যেক গানে ২৫ টাকা করে দিয়া গান লন আপনারা তাহাই করুন বা গান যত ইচ্ছা হয় লইতে পারেন। হিজ মাষ্টার কোং আমার গান রেকর্ড লন না আমিও এগ্রিমেন্টে যাইতে রাজি হই না। এইভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে যায়। ভগবানের এমনি ইচ্ছা হঠাৎ একদিন কেহ কেহ গায়ক আমায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলিলেন মল্লিক সাহেব বকুবাবু বেকা কোম্পানির কাছে একটী সাইকেল পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহার তো এই পরান আমার ইলসা মাছের মূড়াখানি খাও, অভয়বাবু একটী গ্রামোফোন মেশিন পাইলেন আপনার রেকর্ড সকলের চেয়ে শেল হইতেছে আপনি বেকা কোম্পানি আপিসে যাইয়া কিছু পুরস্কার চান, আমি তখন বল্লভভাই ভাটিয়াকে যাইয়া বলিলাম আমায় একটা কিছু পুরস্কার দিন আমার রেকর্ড বাজারে সকলের চেয়ে বেশী শেল হইতেছে। তাহাতে এজেন্ট বল্লভভাই আমায় বলিলেন কে মল্লিক বাবু আপনি প্রত্যেক গানে ২৫ টাকা পান আর সকলে ৫/৭ টাকা করে পান সেই জন্য তাঁহাদের সম্মানের জন্য পুরস্কারস্বরূপ কিছু দেওয়া হইয়াছে। আপনি পাবেন না বকুবাবু অভয়বাবুর সঙ্গে আগে হইতে দিবার কথা ছিল। সেই জন্য দেওয়া হইয়াছে। আমি মনে মনে ভাবিলাম কি উপায়ে বেকা কোম্পানিকে শিক্ষা দেওয়া যায়। ভাবিলাম বেকা কোম্পানিকে যে গান দিয়াছি কোম্পানি বাজারে ৩ টাকায় রেকর্ড বিক্রি হইতেছে সেই গানের মধ্যে ৪খানি গান হিজ মাষ্টারে এমনি দিয়া ২ টাকায় রেকর্ড বাজারে বাইর করাইব। তাহা হইলে বেশ শিক্ষা পাবে। আমার গানের জন্য হিজ মাষ্টারকে যাহা বলিব তাহাই করিবে। এই ভাবিয়া তখনি বেলেঘাটায় — হিজ মাষ্টার কোম্পানির আপিসে চলিয়া গেলাম তখন আপিসের দুই একজন বাবু সাহেবকে যাইয়া যেমন বলিল কে মল্লিক আপিসে আসিয়াছে। সাহেব শুনিবামাত্র আমার নিকট আসিয়া উপরে লইয়া গেলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন মল্লিক কি জন্যে আসিয়াছ কেমন আছ, তখন আমি বলিলাম সাহেব, আমার একটী উপকার আপনাকে করিতে হইবে। সাহেব বলিলেন কি কাজ আমি বলিলাম, বেকা কোম্পানিকে আমি যে গান দিয়াছি সেই গানের মধ্যে ৪খানি গান রেকর্ড করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে দুই টাকায় বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। তখন সাহেব বলিলেন হেঁ আমার দুই টাকায় বিক্রয় করিবার জনফোন রেকর্ড আছে তাহাতেই ছাপাইয়া বাহির করিব। আমি বলিলাম টাকাকড়ি কিছুই লইব না, সাহেব বলিলেন এ গান কি বিক্রয় হইবে, আচ্ছা তোমার অনুরোধ শুনিব, কিন্তু আমাদের কোম্পানিতে এগ্রিমেন্ট আজ করিবে। তুমি যত টাকা বলিবে আমরা তাহাই দিব তুমি চিন্তা করে বল। তারপর সাহেব বলিলেন চল আগে তোমার কাজ করে দি বলে তখনি ৪খানি গান সাহেব জনফোন রেকর্ডে লইলেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং আমায় ১০০ শত টাকা দিলেন। আর বলিলেন তুমি চিন্তা করে দেখ প্রতি গানে তুমি কত টাকা পাইলে সুখী হইবে। আমি বলিলাম আজ আমায় ছেড়ে দিন দুই একজন বন্ধুর সহিত যুক্তি করে কাল এসে এগ্রিমেন্ট লেখাপড়া করিব। একটু ভাবিতে হইবে যখন আর কোনও কোম্পানিতে গান দিতে পারিব না। সাহেব বলিলেন যুক্তি কি করিবে তুমি আধ ঘণ্টা ভেবে দেখ কত টাকা পাইলে তোমার কিছু বলিবার থাকিবে না। লাও এই চেয়ারে বসে ভেবে বল আমি ঘুরে আসি। এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া আমায় বলিলেন প্রত্যেক গান এক হাজার টাকা করে দিতে হবে। আমি বলিলাম তিন মিনিট একটি গানে কি করে হাজার টাকা করে বলিব। খুব চিন্তায় পড়িলাম সাহেব আসিয়া বলেন এখনও ঠিক হয় নাই। তখন বোধ হয় সাহেবের বলায় আরও ২/৪ জন ক্লার্ক আসিয়া বলেন মল্লিক সাহেব আপনি যাহা হয় একটা বলে ফেলুন, আমি তখন ৫০ পঞ্চাশ টাকা করে প্রতি গানে লইব বলায় সাহেব আনন্দে তৎক্ষণাত হুকুম দিলেন যত শীঘ্র পার এগ্রিমেন্ট লিখ, তখন আমি বলিলাম এক বছরের বেশি এগ্রিমেন্ট করিব না। সাহেব বলিলেন এক বছর এগ্রিমেন্ট আর এক বছর অফসনাল থাকিবে। কোম্পানি রাখিতে পারে নাও রাখিতে পারে। ইংরাজি ১৯১১ সালে হিজ মাষ্টার কোম্পানিতে এগ্রিমেন্টে বাঁধা পড়ি। যে ভদ্রলোকটী পূর্ব্বে আমার এক হাজার টাকা প্রতি গানের জন্য বলেছিলেন, সেইটী হইলেই ঠিক হইত, এখন উপায় নাই যাহা ভাগ্যে আছে তাহাই হইবে। দুই বৎসর পরে ১০ টাকা প্রতি গানে বাড়াইয়া নূতন করে এগ্রিমেন্ট হইল। ১৯১৩ সালে ২/৪ মাসের মধ্যে প্রথম জার্ম্মান যুদ্ধ কায়সর আরম্ভ করিলেন। বিলাত হইতে জাহাজ আসে না মেসিনের পাট ইত্যাদি সমস্তই বন্ধ আমারও ঐ ৬০ টাকা করে গান নিতে লাগিলেন। আমার রেকর্ড শুনে রাজা মহারাজ ও বড় বড় লোক গান শুনিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন, তখন টাকা মাসে ৫/৭ শত করে উপায় হতে লাগিল। (*বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা* : ২৯-৩০)।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই, ১৯১৪ সাল নাগাদ, কে. মল্লিক শিল্পী হিসেবে বিশিষ্ট ও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এই সালেই এইচএমভির এক বিজ্ঞাপনে ভারতবিখ্যাত রেকর্ডশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর নামও উচ্চারিত হয় (*দেশ* : ১৯১)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কে. মল্লিক তাঁর শিল্পীজীবনের প্রথম পর্বে মূলত শ্যামাসংগীত, ভক্তিগীতি, আগমনী, কীর্তন, ভজন এইসব গাইতেন। তবে তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গানও রেকর্ড হয়েছে। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের অন্তত তিনখানা গানের হদিস মিলেছে : 'আমার মাথা নত করে দাও হে', 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি' এবং 'নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে' (*কবিকণ্ঠ ও কলের গান* : ১৬২, ১৬৯, ২৫৩)। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গিয়ে বিভ্রাটও ঘটেছিল, কবি প্রথম গানটি অনুমোদন করেননি। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি কে. মল্লিকের আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। একটি পাঁচমিশেলি খাতায় শুরুতেই নিজের হাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের এই গানটি লিখে রেখেছিলেন — 'সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে' (*কাফেলা* : ৩৪)। সম্ভবত বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড বা কবির অনুমোদন-আনুকূল্য না পাওয়ায় তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করা আর সম্ভব হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের গানও রেকর্ড করেছেন কে. মল্লিক — 'ভালবাসি যারে সে যদি না বাসে তবু চিরদিন তারি'। 'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা' — তাঁর রেকর্ডকৃত অতুলপ্রসাদের এই গানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা পায় (*সঙ্গীতকোষ* : ১৫৬)। 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ', 'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে' কিংবা 'স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি' — তাঁর কণ্ঠে রজনীকান্তের এই গানগুলোও বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

তবে নজরুলের গানই তিনি গেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। রেকর্ডে নজরুলের গানের আদি-শিল্পীদের মধ্যে তিনি একজন। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্ নে আজি দোল' — এই গজল গানটি দিয়েই তিনি রেকর্ডে নজরুলের গান গাওয়া শুরু করেন। পরে নজরুলের সব ধরনের গানেই তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। তবে বোধ হয় ইসলামি গানই গেয়েছেন বেশি। কিছু উর্দু-হিন্দি গানও রেকর্ড করেন, ইসলামি গান আর সেইসঙ্গে কাওয়ালিও। এইসব গান গাইতে গিয়ে তাঁকে কখনো কে. মল্লিক, মহাম্মদ কাসেম, কখনো মোহাম্মদ কাসেম কাওয়াল, মানু মিয়া, আবার কখনো বা শঙ্কর মিশ্র নাম ধারণ করতে হয়। হিন্দু ধর্মীয় অনুষঙ্গের গান ভিন্ন ধর্মের শিল্পীর কণ্ঠে গীত হলে তার আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, মূলত সেই আশঙ্কার কারণেই এ নাম-ভাঁড়ানো। আবার গানের ধরন বা বৈশিষ্ট্যের কারণেও কখনো নাম-বদলের প্রয়োজন হয়েছে। গ্রামোফোন কোম্পানির ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল এর মূলে। তবে একাধিক নামের ভেতরে তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিচিতির স্মারক হয়ে ওঠে 'কে. মল্লিক' নামটিই। তিনি বেকা, প্যাথিফোন, অডিয়ন, এইচএমভি, টুইন, শাহেনশাহ — এইসব গ্রামোফোন কোম্পানিতে শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন। রেকর্ডে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গান — 'হরি দিবানিশি ডাকি তাই'। শুধু শিল্পী নন, সুরকারও ছিলেন তিনি, ছিলেন প্রশিক্ষকও। এখানে বলা প্রয়োজন যে, নজরুলকে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করার মূলেও তাঁর একটি ভূমিকা ছিল। প্রখ্যাত গায়িকা কমলা ঝরিয়াও (১৯০৬-১৯৭৯) গানের জগতে আসেন তাঁর হাত ধরেই। কে. মল্লিক বাংলা গানের ভুবনে তাঁর সমকালেই কিংবদন্তির নায়ক হয়ে ওঠেন — অর্জন করেন তুলনাহীন জনপ্রিয়তা। সেই সময়ে রেকর্ড বিক্রির সংখ্যার দিক দিয়ে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেননি। জানা যায়, কে. মল্লিক '১৯০৯/১০ খ্রি. থেকে ১৯৪০ খ্রি. পর্যন্ত অজস্র রেকর্ড করে গায়করূপে খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন। বেশির ভাগ রেকর্ডের কপি ৩০/৪০ হাজার বিক্রী হয়' (*সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান* : ১০৪)। এইভাবেই কলের গানের আদিপর্বে গড়ে উঠেছিল 'কে. মল্লিক যুগ'।

কে. মল্লিকের রেকর্ড-সংগীত প্রসঙ্গে এইচএমভির রেকর্ড-পরিচিতির মাসিক ক্যাটালগে যেসব মন্তব্য প্রকাশিত হতো, তাতে তাঁর সিদ্ধি ও খ্যাতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এখানে তার কিছু নমুনা আমরা পেশ করবো। 'গুণ শুনে যার মন ভুলিল' ও 'জনমাবধি আমি তোরে না ডাকিনু' — কে. মল্লিকের এই ভক্তিগীতির সূত্র ধরে তাঁর প্রসঙ্গে বলা হয় : 'এত লোকের তো গান শোনা যায়, কিন্তু কে. মল্লিকের গানের মত হৃদয়গ্রাহী খুব কম গানই হইয়া থাকে। কি ভাব ও ভক্তির সহিত ভগবদ্বিষয়ক গানগুলি গায়ক গাহিয়া থাকেন, শুনিলে ভক্তের প্রাণের মর্ম্মস্থলে একেবারে আঘাত লাগে এবং হৃদয়-তন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া ওঠে' (ডিসেম্বর ১৯২৬)। 'কত আর ছলনা করিবে বল না' ও 'কত রঙ্গ জানিস্ তারা' — তাঁর শ্যামাসংগীতের এই রেকর্ডের পরিচিতি মেলে এইভাবে : 'কে. মল্লিকের শ্যামাবিষয়ক গানের পরিচয় দিতে যাইয়া নিজেরাই আমরা চিন্তিত হইয়া পড়ি। গানের রেকর্ড শুনিতে শুনিতে হাতের কলম হাতেই থাকিয়া যায়। মা আদ্যাশক্তিকে তাঁহার লীলার কথা ও তাঁহার ভক্ত-সন্তানদের সঙ্গে লুকোচুরি ছলনা করা ইত্যাদি এরূপ প্রাণঢালাভাবে বলিতে এক কে. মল্লিকই পারেন' (জানুয়ারি ১৯২৭)। 'ভাবে ও সুরে শ্রীযুক্ত কে. মল্লিকের গান ... চিরকালই সর্ব্বজনপ্রিয়' (মার্চ ১৯২৭), তাই এ-কথা তো স্বচ্ছন্দেই বলা যায় — 'অধ্যাত্মতত্ত্বের গান গাহিতে আমাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুরাতন গায়ক কে. মল্লিকের সমতুল কে?' (এপ্রিল ১৯২৭)।

হিন্দুধর্মীয় গীতির মতো ইসলামি গান গেয়েও কে. মল্লিক যথেষ্ট সমাদর ও খ্যাতি পেয়েছিলেন। রেকর্ডে ইসলামি গান প্রবর্তনের কৃতিত্ব কাজী নজরুল ইসলামের। কে. মল্লিকের কণ্ঠেই প্রথম তাঁর ইসলামি গানের রেকর্ড বের হয় — পাশাপাশি আব্বাসউদ্দীনের নামও অনিবার্যভাবে এসে যায়। ১৯৩৪-এর গোড়ায় স্বনামে (মহম্মদ কাসেম) কে. মল্লিকের ইসলামি গানের যে রেকর্ডটি বের হয় — 'আল্লাহু আল্লাহু' ও 'নবী মাঝে রবির সম' — এর কথা নজরুলের। এই রেকর্ডের গান সম্পর্কে পরিচিতি-লেখক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন : 'কাসেম সাহেব যাহা কিছু এই রেকর্ডখানিতে গাহিয়াছেন তাহার প্রশংসা আমাদের লেখনীর সাধ্যাতীত। খুদাকে লা শরীকালাহুর জিকির যেরূপ ভাবে ও ভাষায় ফুটাইয়াছেন তাহা বাস্তবিক প্রশংসার উপযুক্ত। প্রত্যেক আহ্‌লেদীনকে আল্লাহুর নারা শুনিতে সাদর নিমন্ত্রণ করিতেছি। যদি আপনি তৌহিদ পরাস্ত হন তবে এই রেকর্ডখানিকে ওয়াজিব ভাবিয়া আপনার সাথী করিতে ভুলিবেন না' (জানুয়ারি ১৯৩৪)। নজরুলের আরো দুটি ইসলামি গানের ('মোহাম্মদ মোস্তাফা সল্লে আলা' ও 'যাবি কে আয় মদিনায় আয় ত্বরা করি') যে রেকর্ড মহম্মদ কাসেমের কণ্ঠে এইচএমভি থেকে বেরিয়েছিল, তার পরিচিতিতে জানা যায় : 'ইসলামী ধর্ম্মবিষয়ক রেকর্ড পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এবং আমাদের মুসলমান অনুগ্রাহকবর্গ তাহাদের সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। কাজী সাহেবের আর দুইখানি ইসলামী গান ভক্ত মহম্মদ কাসেম কর্ত্তৃক রেকর্ড করাইয়া আপনাদের মনোরঞ্জনার্থে প্রকাশ করিলাম। আশা করি এখানিতেও আপনারা পূর্ব্বের ন্যায় তৃপ্ত হইবেন' (জুন ১৯৩৩)।

কে. মল্লিক নজরুলের লেখা গজল, ভজন, আগমনী, স্বদেশ-বন্দনা — নানা ধরনের গান রেকর্ডে গেয়েছেন। ইসলামি গানের মতো নজরুলের গজলেরও জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন কে. মল্লিক। 'করুণ কেন অরুণ আঁখি' ও 'মুসাফির! মোছ রে আঁখি-জল' — নজরুলের এই কালজয়ী গজলের রেকর্ড প্রকাশকে এইচএমভি নববর্ষের 'আনন্দ সংবাদ' হিসেবে ঘোষণা করেছেন (জানুয়ারি ১৯৩১)। নজরুলের দুটি ভজনের ('প্রভু রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন পতি তব পদে মতি' ও 'ঘর ঘোর মেঘ ঘেরা দুর্দ্দিনে ঘনশ্যাম') রেকর্ড বের করেন কে. মল্লিক, — এইচএমভি কর্তৃপক্ষ জানাতে ভোলেননি — 'মল্লিক মহাশয়ের সহিত যন্ত্রসঙ্গীতের [পিয়ানো ও বেহালা] সহযোগীতা এই প্রথম' (মে ১৯৩৩)। 'ভারতলক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে' ও 'জাগো যোগমায়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাগো মৃণ্ময়, চিণ্ময়ীরূপে জাগো' — নজরুল এই যে দুটি আগমনী গান লিখেছিলেন, তার বহিরঙ্গের কাঠামো আগমনীর আর অন্তরঙ্গে দেশমাতৃকারূপে দেবীকে আবাহনের আবহ — কে. মল্লিকের গাওয়া এই গানের রেকর্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'দুর্দ্দিনের এই দারুণ দিনে আর্ত্ত ব্যথাক্লিষ্ট নর-নারীর অন্তরের নীরব আবেদন মল্লিক মহাশয়ের এই দুইটী আগমনী গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। গানের কথাগুলি সকলেরই প্রাণের কথা সেইহেতু গান দুইখানি শুনিলেই অন্তরের অন্তস্থল হইতে আসে প্রতিধ্বনি ও সারা অন্তর বেদনার উল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে' (সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)। নজরুলের 'ভারতমাতার স্তুতি গান' ('স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী তুই যেন রাজ-রাজেশ্বরী' ও 'স্বদেশ আমার জানি না তোমার সুধিব মা কবে ঋণ') কে. মল্লিকের কণ্ঠে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল (জুলাই ১৯৩৩)। রেকর্ড-সংগীতে কে. মল্লিকের নাম সারা বাংলায় ছড়িয়েছিল। এইসব রেকর্ড-পরিচিতির ভাষ্য তাঁর জনপ্রিয়তার স্মারক। প্রচ্ছদে তাঁর ছবি নিয়ে এইচএমভির মাসিক রেকর্ড-পরিচিতি বেশ কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি নমুনা মেলে ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর মাসের পুস্তিকায়।

গ্রামোফোন কোম্পানির পাশাপাশি কে. মল্লিক রেডিও এবং থিয়েটারের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। কলকাতা রেডিওর জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এতে গান করেছেন। স্মৃতিকথায় কে. মল্লিক জানিয়েছেন : 'রেডিও আপিসে প্রথম হইতেই গান দিতাম, বাবু নৃপেন মজুমদার রাইচাঁদ বড়াল ইহারা আপিসের প্রধান ছিলেন তখন মাসে তিন দিন গান গাহিতাম, যখন আবার গবরমেন্টের হাতে কার্য্যভার পড়িল তখন মাসে মাসে দুই দিন করিয়া গান গাহিতাম। আমার গান শুনিয়া সকলেই আমাকে স্নেহ করিতেন এবং ভালবাসিতেন এইরূপভাবে বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল' (*বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা* : ৩৮)। থিয়েটারে কেবল গানই নয়, সংগীত-নির্দেশকের ভূমিকাও পালন করতে হয় তাঁকে। ছিলেন ঝরিয়ার রাজার সভাগায়ক। বাংলা এবং তার বাইরেও নানা মাইফেলে গান করেছেন। এই সূত্রে গওহরজান, আগ্রাওয়ালি মালকাজানের মতো কালজয়ী শিল্পীর সঙ্গেও এক আসরে বসেছেন। তিনি কেবল যে গ্রামোফোন কোম্পানির বাণিজ্যিক চাহিদাই পূরণ করেছেন তা নয়, তাঁর কণ্ঠের শিল্পকাজ প্রখ্যাত সংগীতগুণী ও সুর-সমঝদারেরও মুগ্ধতা অর্জন ও বাহবা কুড়িয়েছে। সংগীত-সমাজে এই কদরদানি তাঁকে বিকশিত হতে প্রেরণা জুগিয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন

কে. মল্লিক তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন। অবশ্য এই প্রয়াস পরিকল্পিত ছিল না। তাঁর এই জীবনস্মৃতি রচিত হয়েছিল কবি-কথাশিল্পী গোলাম কুদ্দুস (১৯২০-২০০৬)-এর অনুরোধে। এই আত্মকথার সহায়তায় গোলাম কুদ্দুস রচনা করেন *সুরের আগুন* (১৯৬১) নামে কে. মল্লিকের জীবনী-উপন্যাস। এই বই লেখার একটি নেপথ্য কাহিনি আছে। কবি গোলাম কুদ্দুসের কাছে শোনা সেই কাহিনি এখানে পেশ করছি।

বর্ধমানের কুরমুন গ্রামের বাসিন্দা কমরেড জাহেদ আলী ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সক্রিয় সদস্য। অত্যন্ত দরাজদিল আর ঐতিহ্যসচেতন মানুষ ছিলেন তিনি। বিশেষ করে বর্ধমানের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও কৃতী পুরুষদের সম্পর্কে তাঁর গৌরব ও দুর্বলতা দুই-ই ছিল। তাঁরই উদ্‌যোগে রেভারেন্ড লালবিহারী দের (১৮২৪-১৮৯৪) সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় বর্ধমানের সোনাপলাশী গ্রামে। নজরুল সম্পর্কেও তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও গভীর অনুরাগ। তিনি কলকাতার গোবরা গোরস্থানে পাশাপাশি তিন খণ্ড কবরের জমি কিনেছিলেন নজরুল, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) আর তাঁর নিজের জন্যে। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়নি। এই জাহেদ আলীদের কলকাতার স্বর্ণপালিশের দোকানেই জীবনের প্রথম পর্বে কে. মল্লিক সাময়িক আশ্রয় পেয়েছিলেন। জাহেদ আলী ছিলেন কে. মল্লিকের বিশেষ গুণগ্রাহী ও অকৃত্রিম সুহৃদ। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কে. মল্লিককে নিয়ে একটি বই লেখার বিষয়ে তিনি কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে আলাপ করেন। মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁকে কবি-কথাশিল্পী গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। মূলত জাহেদ আলীর আগ্রহ ও অনুরোধেই গোলাম কুদ্দুস কে. মল্লিককে নিয়ে রচনা করেন *সুরের আগুন*। এই বই লেখার প্রয়োজনে কে. মল্লিকের সঙ্গে গোলাম কুদ্দুসের যোগাযোগও ঘটিয়ে দেন তিনি। কে. মল্লিককে বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে আলোয় নিয়ে আসার নেপথ্য নায়ক এই জাহেদ আলীকেই গোলাম কুদ্দুস বইটি উৎসর্গ করেন।

চার

এতোকাল কে. মল্লিকের আত্মকথার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটি গোলাম কুদ্দুসের কাছেই রক্ষিত ছিল। লাল মলাটের এক্‌সারাইজ খাতায় লেখা আত্মকথাটি তাঁরই সৌজন্যে ৩০ জানুয়ারি ২০০০ আমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাতে আসে। পাণ্ডুলিপিটির প্রথম দিকের একটি ফাঁকা পৃষ্ঠায় আমার উদ্দেশে তিনি লিখে দেন :

> কে. মল্লিকের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি জনাব আবুল আহসান চৌধুরীকে প্রদত্ত হ'ল। এটা নিয়ে মাননীয় চৌধুরী সাহেব গবেষণামূলক কাজও করতে পারেন। ইতি
>
> গোলাম কুদ্দুস
> ৩০.০১.২০০০
>
> পুঃ মনে হয়, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই খাতাটির রচয়িতা কে. মল্লিক সাহেব আমাকে দিয়েছিলেন। আমারই অনুরোধে তিনি এটি লিখে তাঁর জীবনী রচনায় সাহায্য করেন। তার আগে তিনি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। দু'এক সময় গ্রন্থটির প্রকাশ সম্পর্কে জানতে চেয়ে তিনি পোস্টকার্ড লিখতেন। পুস্তকটি প্রকাশের মাত্র দু'সপ্তাহের আগে তিনি মারা যান, অবশ্য তার আগে তাঁকে জীবনীর final copy বা পাণ্ডুলিপি আমি প'ড়ে শোনাই। বইটি লেখার আগে আমাকে একবার তাঁর কুসুমগ্রাম (বর্ধমান) গ্রামে নিমন্ত্রণ করেন এবং আমি সেখানে তাঁর আতিথ্য লাভ করেছিলাম।
>
> গোলাম কুদ্দুস
> ৩০.০১.২০০০

সামান্য লেখাপড়ার পুঁজি নিয়ে কে. মল্লিক কলম ধরেছিলেন নিজের জীবনের কথা বলতে। অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যগঠন শুদ্ধ হয়নি, বানান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, ক্রিয়াপদের অভিন্নতা রক্ষিত হয়নি, বিরাম-চিহ্নের ব্যবহারেও লক্ষ করা যায় অসতর্কতা। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, নিছক চিঠিপত্র ভিন্ন লেখালেখির অভ্যাস কখনো না থাকলেও বেশ গুছিয়ে ঘটনা-পরম্পরা নিজের জীবনের কথা বলেছেন। এক ধরনের সারল্য ও আন্তরিকতার স্বাদ মেলে তাঁর এই লেখায়। অনেকটাই গল্পের টানে ক্লান্তিহীন পড়ে ফেলা যায় তাঁর এই আত্মকথার পাণ্ডুলিপি। তাঁর সংগীতজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাগুলো একে একে তুলে ধরেছেন গভীর দরদ ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে। এই কাহিনি দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ভাগ্যহীন এক প্রতিভাবান কঠোর লড়াকু মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি, যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে বিস্ময়ের চমক, অলৌকিক শিহরণ আর মানবিক উন্মোচন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

এই আত্মকথায় বলেননি, তাঁর জীবনের এমন অনেক গল্প গোলাম কুদ্দুস আলাপচারিতার ভেতর দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উদ্ধার করেছেন। বিশেষ করে নিষিদ্ধ পল্লীর কথা — তাঁর পরকীয়া প্রণয়ের কথা। কিন্তু তার পরেও পারিবারিক অনেক কাহিনি অনুক্ত থেকে গেছে। নানা কারণে এইসব কথা তিনি বলতে চাননি, অথবা এই বই লেখার জন্যে হয়তো তা প্রয়োজনীয়ও মনে করেননি। কিন্তু এ-তো তাঁর জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে — এ-সব কথা না জানলে তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁর জীবনের এই ছিন্ন সূত্রের সন্ধানে তাই ১০ ডিসেম্বর ২০০০ কে. মল্লিকের কুসুমগ্রামের পথে যাত্রা করি। এই সানন্দভ্রমণে সাহচর্য ও সহায়তা পেয়েছি নদীয়ার জন-ইতিহাসের সুখ্যাত গবেষক কৃষ্ণনগরের মোহিত রায়ের।

কুসুমগ্রামে পৌঁছে আলাপ হয় কে. মল্লিকের পালিত পুত্র মুন্সী তাজ মহাম্মদ (তিনু মিয়া), কাজিবাড়ির কাজি জিয়াউদ্দিন হায়দার, প্রতিবেশী ধ্রুবচরিত্র রেইজ ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে। এই আলাপের সুবাদে কে. মল্লিকের শেষজীবনের খুঁটিনাটি খবর, তাঁর পারিবারিক প্রসঙ্গ ও পূর্বপুরুষের কথা জানার সুযোগ হয়।

কে. মল্লিক জন্মেছিলেন বর্ধমানের কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত কুসুমগ্রামে, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫। তাঁর পোশাকি নাম মুন্সী মহাম্মদ কাসেম, ডাকনাম মানু মিয়া। কুসুমগ্রাম হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত গ্রাম। অবশ্য সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য। গ্রামের জমিদারও ছিলেন মুসলমান। তবে সবসময়ই কুসুমগ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল, আজও আছে। দেখেছি প্রাচীন মন্দির ও মসজিদের পাশাপাশি অবস্থান এবং দুই সম্প্রদায়ের মানুষের অবাধ ধর্মাচারের দৃশ্য। কে. মল্লিকের কণ্ঠে হিন্দু-ধর্মাশ্রিত ভক্তিগীতি আর ইসলামি গানের যুগলচর্চার সঙ্গে একটি প্রতীকী সাদৃশ্য যেন খুঁজে পাই এই দৃশ্যে।

এবারে ফিরে আসি কে. মল্লিকের পরিবারের পরিচয়-পর্বে। মুন্সী ইসমাইল ও সানিজা বিবি তাঁর জনক-জননী। তাঁরা আট ভাই তিন বোন। এঁদের মধ্যে সাত ভাই দুই বোনের নাম জানা যায়, যথাক্রমে তাঁরা : এসহাক, খুলু, তাহের (অকালমৃত), মহাম্মদ কাসেম, সামাই (অকালমৃত), বদরে আলম, জমির (অকালমৃত), হাজেরা ও সাবেরা।

কে. মল্লিকের এক পূর্বপুরুষ মুন্সী মশিয়তুল্লাহ কুসুমগ্রাম-জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় মুন্সী মজফ্ফরকে দত্তক গ্রহণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেন। মজফ্‌ফর এই বংশের বিশিষ্ট পুরুষ। তিনি তিন বিয়ে করেন — তাঁর স্ত্রীরা পরিচিত ছিলেন 'বিবি বউ', 'বাঁদি বউ' ও 'হাবসি বউ' হিসেবে। মজফ্‌ফর সম্পত্তির একটি বড়ো অংশ ওয়াকফ্‌ করে যান। তাঁর সহায়-সম্পদের উত্তরাধিকার বর্তায় 'খান্দানি বিবি বউ'য়ের পুত্র মুন্সী মোদাচ্ছরের ওপর। কুসুমগ্রামে প্রায় দুশো বছরের একটি প্রাচীন মসজিদ মুন্সী মজফ্‌ফরের কীর্তি বহন করছে। মুন্সী মজফ্‌ফরের পুত্র মুন্সী মোদাচ্ছর, আর তাঁর পুত্র মুন্সী ইব্রাহিম। তৈয়বা খাতুন ইব্রাহিমের স্ত্রী। মুন্সী ইব্রাহিম সম্পর্কে কে. মল্লিকের চাচাতো ভাই। ইনি এবং এঁর স্ত্রী ছিলেন কে. মল্লিকের প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষক। কে. মল্লিক তাঁর জীবনস্মৃতিতে এই নিঃসন্তান দম্পতির স্নেহ-আনুকূল্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা তৈয়বা খাতুন তাঁর দূরসম্পর্কের ভাইপো সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে জমিদারি লিখে দেন, সে-ও প্রায় ১৯১০/১২ সালের দিকে। বর্তমানে বদরুদ্দোজার বংশধরেরাই এই সম্পত্তি ভোগদখল করছেন। তাঁরা কলকাতাবাসী, মাঝে-মধ্যে ফসল বিক্রি ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্যে গ্রামে আসেন। বিশাল জমিদারবাড়িটি সংস্কার-সংরক্ষণের অভাবে অযত্ন-অবহেলায় ভেঙে পড়ছে। এই জমিদারবাড়ির সঙ্গে কে. মল্লিকের অনেক স্মৃতিই জড়িয়ে আছে। কুসুমগ্রামের জমিদার-পরিবারের সঙ্গে এই গ্রামেরই প্রসিদ্ধ কাজি-পরিবারের রয়েছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক। নানা সূত্রে কাজিবাড়ির সঙ্গে কে. মল্লিকেরও একটি নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এই পরিবারের কাজি মোহাম্মদ ওজিহ্‌কে এস্‌রাজ শেখাতেন পাশের রাউত গ্রামের সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। কে. মল্লিকের সংগীতের হাতেখড়িও এঁরই কাছে। এই সতীশচন্দ্রের হাত ধরেই কে. মল্লিক ভাগ্যের টানে কলকাতা মহানগরীতে পাড়ি জমান।

কে. মল্লিক বিয়ে করেছিলেন বর্ধমান জেলারই কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার বামুন্দি গ্রামে, আবদুস সুলতানের কন্যা জারিয়াতুল হাফ্‌সা খাতুনকে। স্ত্রী বরাবর গ্রামেই থাকতেন। তবে কলকাতা-জীবনের শেষ-পর্বে স্ত্রী ও পালিত পুত্রকে নিয়ে কিছুকালের জন্যে কে. মল্লিক বাসা বেঁধেছিলেন আপার সারকুলার রোডের মুখে মির্জাপুর স্ট্রিটে। বয়স হয়ে যাওয়ায় কে. মল্লিকের গানের চাহিদা তখন ধীরে ধীরে কমে আসে। জীবিকার প্রয়োজনে এই সময় কলকাতার রাজাবাজারে আফিমের দোকান দিতে হয় তাঁকে। জাঁদরেল আবগারি কর্মকর্তার প্রতিকূল মনোভাব সত্ত্বেও কেবল তাঁর সাংগীতিক খ্যাতি ও পরিচিতির কারণেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন প্রভাবশালী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সদস্যের সুপারিশে এই দোকানের বরাদ্দ মেলে। মাসে ৫০০ গ্রাম আফিম বিক্রির অনুমতি ছিল এবং তাতে পাঁচ-ছয়শো টাকার মতো উপার্জন হতো। অবশ্য কে. মল্লিকের মৃত্যুর আগেই দোকানটি হাতছাড়া হয়ে যায়।

ছয়

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি কলকাতার পাট চুকিয়ে কুসুমগ্রামে পাকাপাকি ফিরে আসেন তিনি। মাঝে-মধ্যে কলকাতায় যেতে হতো — মূলত আফিমের দোকানের হিসেব-নিকেশের প্রয়োজনে, ক্বচিৎ-কখনো হয়তো গ্রামোফোন কোম্পানির আমন্ত্রণে কিংবা কোনো গানের জলসায় যোগ দিতে।

তবে জীবনের এই যে শেষ পর্বে, খ্যাতির সূর্য যখন অস্তমিত প্রায়, গ্রামে ফিরে এসেছিলেন, — এই সময়টাকে তাঁর অজ্ঞাতবাসের কাল বলা যেতে পারে। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোর কথা স্বজন কিংবা গ্রামবাসীর কাছ থেকে বেশ জানা যায়। চলাফেরার জন্যে তিনি একটি টাট্টু ঘোড়া কিনেছিলেন। যাপন করতেন সহজ-সরল আড়ম্বরহীন জীবন। দিলখোলা মজলিশি মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর অখণ্ড অবসর কাটতো কখনো জমিদারবাড়িতে সৈয়দ বদরুদ্দোজার সঙ্গে গল্প-গুজব করে, দাবা খেলে; আবার কখনো বা এঁর ছেলে কামরুদ্দোজাকে গান শিখিয়ে। তাঁর অবসর কাটানোর আরেকটি জায়গা ছিল কাজিবাড়ির বাইশদুয়ারি বৈঠকখানা। এখানেও দাবা-পাশা খেলার পাশাপাশি বসতো হালকা গান-বাজনার আসর। কাজি ওজিহ্‌র দুই ছেলে কাজি মোহাম্মদ মঈন ও কাজি মোহাম্মদ মতিন এবং সৈয়দ মোহাম্মদ হাশেম, চৌধুরী মোহাম্মদ নাফে — এঁরা ছিলেন তাঁর আসর-বাসরের সঙ্গী।

কে. মল্লিকের ছিল সুরা ও আফিমের নেশা। শেষদিকে লিভার অ্যাবসেস্ হয়েছিল। মাস তিনেক খুবই ভুগেছিলেন। চিকিৎসার তেমন সুবিধা ছিল না। নিজের বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়, ২৫ আশ্বিন ১৩৬৮। তাঁকে দাফন করা হয় কুসুমগ্রাম মসজিদসংলগ্ন গোরস্থানে তাঁর বাবা-মার কবরের পাশে। তাঁর বাঁধানো কবরে উৎকীর্ণ আছে এই কথাগুলো : 'মুন্‌সি মহাম্মদ কাসেম/ গায়ক সম্রাট (কে. মল্লিক)/ জন্ম : ১২৯৫, ১২ই জ্যৈষ্ঠ/ মৃত্যু : ১৩৬৮, ২৫ শে আশ্বিন'। কে. মল্লিকের মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বছর পর তাঁর স্ত্রী হাফ্‌সা খাতুনের মৃত্যু হয়। তাঁর অচিহ্নিত কবরটিও আছে এই একই গোরস্থানে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাত

কে. মল্লিক-দম্পতি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁরা একটি অজ্ঞাত-পরিচয় শিশুকে মানুষ করেন। তার নাম রাখেন তাজ মহাম্মদ, ডাকনাম তিনু, নিজের ডাকনাম মানু-র সঙ্গে মিল রেখে। দুজনেই অপার স্নেহে ও আদরে বড়ো করে তোলেন তাজ মহাম্মদকে। এখন তিনিই কে. মল্লিকের উত্তরাধিকারী, স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির মালিক। কে. মল্লিক পারিবারিক জমাজমির ভাগ পেয়েছিলেন ৫/৬ বিঘের মতো, আর নিজেও কিনেছিলেন প্রায় ৩২/৩৩ বিঘে জমি কুসুমগ্রামেই। ১৯৪৫ সালের দিকে কে. মল্লিক পৈতৃক ভিটায় দুই কক্ষের একটি পাকা বাড়ি তৈরি করেন। চিলেকোঠাঅলা এই ছোট্ট দালানের বারান্দায়, আবার কখনো বা ছাদে বসে মাঝে-মধ্যেই তিনি গান গাইতেন। কলকাতা, বর্ধমান বা অন্য জায়গা থেকে কখনো-সখনো অতিথি-বন্ধুরা এলে আসর জমে উঠতো বেশ।

কে. মল্লিকের এই কোঠাবাড়িতে এখন তাঁর পালিত পুত্র মুন্সী তাজ মহাম্মদ ওরফে তিনু মিয়া সপরিবার বাস করেন। স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা নিয়ে ভরা সংসার তাঁর। জমিজমা, বাড়িঘর সবকিছুরই মালিক এখন এঁরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এঁরা কে. মল্লিকের কোনো স্মৃতিই রক্ষা করেননি। আমার যাওয়ার প্রায় কুড়ি বছর আগে একজন উৎসাহী লেখক মহমুদুল হক কুসুমগ্রামে কে. মল্লিকের বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলেন : ' ... কে. মল্লিকের একটা বাঁধানো প্রতিকৃতি, জীর্ণ গানের খাতা, কয়েকটা লেবেল-ছেঁড়া গানের রেকর্ড ও কবি গোলাম কুদ্দুস-এর মলাটবিহীন *সুরের আগুন* বই ছাড়া আর কোন প্রত্যক্ষ স্মৃতি-সম্পদ নেই' (*কাফেলা* : ৩৪)। দুই দশক পরে প্রতিকৃতি ছাড়া আর সব কিছুই উধাও হয়ে গেছে। কে. মল্লিকের হারমোনিয়াম, গ্রামোফোন-যন্ত্র, রেকর্ড, গানের খাতা, পুরনো বইপুস্তক বা পত্রপত্রিকা, গ্রামোফোন কোম্পানি বা রেডিওর সঙ্গে চুক্তির কাগজপত্র, বিভিন্ন জনের লেখা চিঠিপত্র, পদক-পুরস্কার-উপহার-অভিনন্দনপত্র, ব্যবহৃত জিনিসপত্র — না, এসবের কোনো চিহ্নই এখন আর নেই। সব সম্পদের স্বত্বভোগী তাঁর পালিত পুত্র এগুলো সংরক্ষণের কোনোই প্রয়োজন বোধ করেননি এবং এ-জন্যে তাঁর কোনো দুঃখবোধ বা অনুশোচনা আছে বলেও মনে হয়নি। থাকার মধ্যে আছে শুধু দেয়ালে পাশাপাশি টানানো কে. মল্লিক ও তাঁর স্ত্রীর দুটি বাঁধানো ছবি। মল্লিকের ফটোটি কলকাতার ১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারি থেকে তোলা। তাঁর তরুণ বয়সের এই ছবিটিই সবচেয়ে পরিচিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিকৃতি। স্ত্রী হাফ্‌সা খাতুনের ফটোটি তাঁর মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে কুসুমগ্রাম বাজারের একটি ফটো স্টুডিও থেকে তোলা হয়। হ্যাঁ, আর হয়তো দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছে কে. মল্লিকের ব্যবহারের একটি তক্তপোশ। হয়তো কিছুদিন পরে এগুলোও আর দেখতে পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি আরেকটি বেদনার কথা, কুসুমগ্রাম কিংবা বর্ধমান কিংবা কলকাতায় কে. মল্লিকের স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, এমন খবর আমরা পাইনি।

কে. মল্লিকের অপ্রকাশিত আত্মকথা ঢাকা থেকে বের হলে কলকাতার *পরিচয়* পত্রিকার সম্পাদক কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত *সংবাদ প্রতিদিন* পত্রিকায় এই বইটি নিয়ে 'ভাল আছ, কলকাতা' শীর্ষক তাঁর নিয়মিত কলামে *গানের জগতের কিংবদন্তি কে মল্লিককে ভুলে গিয়েছে কলকাতা* শিরোনামে আক্ষেপ করে বলেছিলেন : 'কলকাতার কলের গানের আদিপর্বে সুরশিল্পী কে মল্লিককে কেন্দ্র করে যে — 'কে মল্লিক-যুগ' গড়ে উঠেছিল, সেই অনন্য মানুষটির মৃত্যুর পর ৪০ বছর পার হয়ে গেছে। শুধু গানপাগল বাঙালি শ্রোতারাই নন, এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরাও সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন তাঁকে। ওই বিস্মৃত মানুষটির জন্মের ১১৩ বছর বাদে তাঁর একটি অপ্রকাশিত আত্মকথা প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রহ-সম্পাদনা-ভূমিকা ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরীর। ... যে-কলকাতা কে মল্লিককে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, খ্যাতির শীর্ষে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, এককালে যাঁর বেশিরভাগ রেকর্ডের কপি ৩০/৪০ হাজার বিক্রি হত, সেই কলকাতা তাঁকে সর্বাংশে ভুলে গেছে। অথচ তিনি নজরুলের গান কণ্ঠে ধারণ করে দেশবাসীকে মিনতি জানিয়েছিলেন — 'আমারে ভুলিয়া যেয়ো, মনে রেখো মোর গান।' না, কলকাতা, স্মৃতি সতত সুখের নয়। বিস্মৃতি তো নই-ই' (*সংবাদ প্রতিদিন* : ৪)।

আট

একদিন তাঁর খ্যাতির ডঙ্কা বেজেছিল বাংলা দেশে। তখনো গ্রামোফোন নামের বস্তুটা বাজারে নতুন। ওর ঘুরন্ত চাকতির উপর ভর করেই তাঁর নামটা পৌঁছেছিল লোকের কাছে। সুরু হয়েছিল রেকর্ড-সঙ্গীতে কে-মল্লিকের যুগ। বলা যায়, গানের এই নতুন যন্ত্রের প্রথম পর্বের সবচেয়ে খ্যাতিমান গায়ক তিনি।

— কথাগুলো বলেছিলেন গোলাম কুদ্দুস, তাঁর *সুরের আগুন* বইয়ের প্রাক্‌-কথনে। কে. মল্লিককে চিনতে — তাঁর অসাধারণ লোকপ্রিয়তা আর প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য উপলব্ধিতে এই মন্তব্য একটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সহায়ক ভূমিকা রচনা করে।

কে. মল্লিকের সমকালীন শিল্পীদের কেউ কেউ স্মৃতিকথা লিখেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা প্রায় সকলেই কে. মল্লিক সম্পর্কে একেবারেই নীরব। উত্তরকালের দু-একজন যাঁদের শ্রুতিতে ছিলেন কে. মল্লিক, তাঁরা অবশ্য উল্লেখ করেছেন তাঁর নাম।

আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-১৯৫৯) ছিলেন কে. মল্লিকের কিছু পরের শিল্পী। তবে গ্রামোফোন কোম্পানিতে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। শিল্পীজীবনের উন্মেষপর্বে আব্বাসউদ্দীন এই মহৎ শিল্পীর সহায়তা কীভাবে লাভ করেছিলেন তার অন্তরঙ্গ বিবরণ মেলে তাঁর স্মৃতিকথায় (*আমার শিল্পী জীবনের কথা* : ৫০-৫১) :

> তখনকার দিনে রেকর্ড হত বেলেঘাটায়। আমার সেদিন রেকর্ড হবে। আলাপ হল কে. মল্লিকের সাথে। আমি মুসলমান, এ কথা জানতে পেরে তিনি প্রথম আত্মীয়তার সুরেই আমাকে বললেন, 'কী গান রেকর্ড করবে, গাও দেখি একবার।' আমার গান শুনে তিনি বললেন, 'চমৎকার গলা। কিন্তু ... ও বিমলবাবু, আজ ত' এর রেকর্ড হতে পারে না।' আমি ভড়কে গেলাম। ... 'কী ব্যাপার' বলে বিমলদা এগিয়ে এলেন।
>
> কে. মল্লিক মশায় বললেন, 'একে নতুন আর্টিস্ট মশাই, তাতে আবার মুসলমান। দেখুন না গানের উচ্চারণ; আজ থাক। সারাদিনে আমি ওর উচ্চারণগুলো ঠিক করে দিই — কাল রেকর্ড করবেন।' প্রাণে এতক্ষণে জোর এল। বিমলদা বলে উঠলেন, 'হবে না — জাতের টান ত!'
>
> এ কথার অর্থ আমি বুঝলাম না। জিজ্ঞাসু নয়নে কে. মল্লিক মশায়ের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি হেসে বললেন, 'উনি ঠিকই বলেছেন, আমিও ত' মুসলমান।' আকাশ থেকে ফেরেশ্‌তা নেমে এসে হলফ করে বললেও বিশ্বাস করতাম না। কেমন করে করি? বললাম, 'কিন্তু ছেলেবেলা থেকে ত' শুনে আসছি আপনার গান, ঐ শুধু 'আর কবে দেখা দিবি মা', 'ও মা অন্তে যেন ও চরণ পাই' — এইসব গান।' তিনি হেসে বললেন, 'তাতে কি হয়েছে? গান গান, তাতে হরিই বা কী শ্যামাই বা কী।' মনের সন্দেহ তবু যায় না, যাক্‌গে তাঁর অতি যত্নের রেকর্ডের উচ্চারণভঙ্গীগুলি দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই আয়ত্ত করে ফেললাম। তাঁর এই অযাচিত উপদেশ ও শিক্ষার জন্য আমি এখনও তাঁকে পরম শ্রদ্ধার সাথে নিত্য স্মরণ করি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আঙ্গুরবালা (১৯০৬-১৯৮৪) কে. মল্লিক-যুগের প্রখ্যাত এক শিল্পী। গ্রামোফোন কোম্পানি ও রেডিওতে তিনি কে. মল্লিকের সান্নিধ্য-সাহচর্যও লাভ করেন, এ-সব মাধ্যমে সহশিল্পী হিসেবেও কাজ করেছেন। আঙ্গুরবালা হাতেগোনা কয়েকজন তাঁর প্রিয় শিল্পীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন কে. মল্লিকের নাম (*বাঙ্গলার বুলবুল আঙ্গুরবালা* : ৬১)। পাশাপাশি উত্তরকালের গানের মানুষদের কাছেও কে. মল্লিক ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। তাই তাঁরা যখন শৈশব-কৈশোরের কলের গান শোনার স্মৃতি রোমন্থন করেন, তখন ভালোলাগা গানের শিল্পীদের নাম বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই কে. মল্লিকের নামের উল্লেখ করে থাকেন। যেমন গণসংগীতের নামি শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯২২-১৯৮৭) তাঁর ছেলেবেলার কথা স্মরণ করে বলেছেন : 'আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কে. মল্লিক প্রমুখের গ্রামোফোন রেকর্ড তখন আমাদের মধ্যে খুব চালু' (*উজান গাঙ বাইয়া* : ৮২)। আরেক সুরশিল্পী আবদুল আহাদও (১৯২০-১৯৯৪) উল্লেখ করেছেন : 'আমরা ... রেকর্ড বাজিয়ে বাজিয়ে সে যুগের সব বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীদের গান শুনতাম। কে. সি. দে, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শচীন দেববর্মন, কানন দেবী, কে. মল্লিক — এঁদের গান সময় পেলেই শুনতাম' (*আসা যাওয়ার পথের ধারে* : ১৫)। এসব সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সেকালে বাংলা গানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রেকর্ডসংগীতে, কে. মল্লিকের অবস্থানটা কোথায় ছিল।

নয়

বাংলা গানের জগতে — গ্রামোফোন রেকর্ড-শিল্পের আদি-পর্বে কে. মল্লিক ছিলেন একটি যুগ, একটি অধ্যায়। তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলমান যাঁর গান গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণ করা হয় — রবীন্দ্রসংগীতেরও তিনি প্রথম মুসলমান গায়ক ও রেকর্ড-শিল্পী। বাংলা ভক্তিগীতির ক্ষেত্রে তিনি একটি 'ঘরানা' নির্মাণ করেন। নজরুলের গজল, কাব্যগীতি ও ইসলামি গান তাঁর কণ্ঠে একটি নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। কিন্তু এই যুগন্ধর কণ্ঠশিল্পীর যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি — তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন, এ-কথা বলা যায় না।

তবে অবহেলা-বিস্মৃতি সত্ত্বেও কে. মল্লিক কিছু বিশিষ্ট বিখ্যাত মানুষের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ যে পেয়েছিলেন, সে কথাও মনে রাখা দরকার। গোলাম কুদ্দুস তাঁকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। বরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) [illegible]জন্মশতবর্ষে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের *পোস্টমাস্টার*, *মণিহারা* ও *সমাপ্তি* এই তিনটি ছোটগল্প নিয়ে *তিনকন্যা* (মে ১৯৬১) নামে একটি ছবি তৈরি করেন। এই *তিনকন্যা* ছবির *সমাপ্তি* গল্পের পর্বের একটি দৃশ্যে কে. মল্লিকের গাওয়া নজরুলের একটি গান পুরনো আমলের চোঙাওয়ালা গ্রামোফোনে ব্যবহার করা হয়েছিল নায়কের ঘরে — গানটি ছিল — 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরণে চলো লো গোরী'।

নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) একবার আফসোস্ করে বলেছিলেন, 'দেহপট সনে নট সকলি মিলায়'। কে. মল্লিকের ক্ষেত্রেও এ-কথাই সত্য হয়েছে। দেহাবসানের পর তাঁর কণ্ঠের গানও গেছে হারিয়ে। নতুন প্রযুক্তির প্রভাবে গ্রামোফোনের দিন ফুরিয়েছে। এসেছে ক্যাসেট-সিডি-ডিভিডির যুগ। পুরনো দিনের অনেক শিল্পীরই গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত কণ্ঠের গান নতুন করে ক্যাসেট কিংবা সিডির মাধ্যমে একালের শ্রোতার কাছে এসেছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় কে. মল্লিক। এইচএমভি অজ্ঞাত কারণে এই আগ্রহ দেখায়নি। অবশ্য এইচএমভি ১৯৯৩-এ 'গত শতকের গান' নামে যে সংকলন-ক্যাসেট বের করে তার 'প্রথম পর্বে' কে. মল্লিকের দুটি ভক্তিগীতি — একটি আগমনী ও আরেকটি শ্যামাসংগীত স্থান পায় — 'আয় মা, আয় মা উমা' এবং 'জাল গুটিয়ে নে মা শ্যামা'। বাংলা রেকর্ডসংগীতের 'ভোরের পাখি'দের সম্পর্কে এই ক্যাসেটের পরিচিতিতে বলা হয় : 'এই শান্ত, তৃপ্ত, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় সেদিন এইচএমভি'র 'কলের গান' সঞ্চারিত করেছিল প্রথম রোমাঞ্চের শিহরণ। আশ্চর্য্যময়ীদের গান শোনার জন্য তখন আর ছুটতে হলো না বিশেষ কোনো রঙ্গমঞ্চে। রূপসী গহরজান আর বাঁধা রইলেন না শুধু 'মুজরো'র সংরক্ষিত আসরে। তাঁদের গানের এইচএমভি-র রেকর্ড বেরোলো। সেইসঙ্গে মন্তাবাবু, লালচাঁদ বড়াল, কে. মল্লিক, বেদানা দাসী, কৃষ্ণভামিনীদের রেকর্ডের গানও পৌঁছে গেলো ঘরে ঘরে।' ২০০৭-এ এইচএমভি-র নজরুলের পুরনো গানের সিডি বের করে সা রে গা মা 'Vintage Collection' নামে। আঙ্গুরবালা-ইন্দুবালা-কে. মল্লিকের ১৯টি গান সংকলিত হয় এই সিডিতে। তার মধ্যে কে. মল্লিকের গানের সংখ্যা আট : 'বাগিচায় বুলবুলি তুই', 'আমারে চোখ ইশারায়', 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে', 'পরদেশী বঁধুয়া এলে কি এতদিনে', 'করুণ কেন অরুণ আঁখি' ও 'কেন কাঁদে পরাণ'। বিচ্ছিন্নভাবে এ-রকম আরো দু-চারটে দৃষ্টান্ত হয়তো দেওয়া যেতে পারে। নজরুলগীতির এই মহত্তম আদিশিল্পীর কণ্ঠস্মৃতি রক্ষায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নজরুলচর্চার কোনো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্তব্য সম্পাদিত হতে পারতো।

দশ

পার হয়ে গেছে কে. মল্লিকের জন্মের ১২৪ বছর, মৃত্যুর ৫১ বছর। তাঁর নামের ওপর পড়েছে বিস্মৃতির ধুলোর মোটা আস্তরণ। তাই জন্মশতবর্ষ নীরবে অতিক্রান্ত হয়েছে, কেউ তাঁকে স্মরণ করেনি। একদিন তিনি জ্বেলেছিলেন সুরের আগুন। সে-আগুনে নিজেই পতঙ্গের মতো পুড়েছেন, মরণেও তার শেষ নেই। মনে পড়ছে গালিবের (১৭৯৭-১৮৬৯) একটি গজল, তাই দিয়েই এই সুরের পুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি :

'নহ্ গুল-এ নগ্‌মহ্ হুঁ, নহ্ পরদহ্-এ সাজ,
মৈঁ হুঁ অপনী শিকস্ত্-কী আবাজ ॥'

['রাগিণীর আলাপ নই, সেতারের তার নই;
আমি কেবল একটি আওয়াজ, পরাজয়ে ভেঙে পড়ার আওয়াজ ॥']

গ্রন্থঋণ

১. সন্তোষকুমার দে : *কবিকণ্ঠ ও কলের গান*। বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৯৯।
২. করুণাময় গোস্বামী : *সঙ্গীতকোষ*। ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৯১।
৩. *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*। কলকাতা, মে ১৯৭৬।
৪. গোলাম কুদ্দুস : *সুরের আগুন*। কলকাতা, ১৯৬১।
৫. আব্বাসউদ্দীন আহমদ : *আমার শিল্পী জীবনের কথা*। ঢাকা, দ্বি-স : জুলাই ১৯৬৫।
৬. প্রশান্ত দাঁ : *বাঙ্গলার বুলবুল আঙ্গুরবালা*। কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৯৩।
৭. হেমাঙ্গ বিশ্বাস : *উজান গাঙ বাইয়া*। কলকাতা, মাঘ ১৩৯৬।
৮. আবদুল আহাদ : *আসা যাওয়ার পথের ধারে*। ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৬।
৯. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : *বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা*। ঢাকা, কার্তিক ১৪০৮।
১০. *দেশ* (সাপ্তাহিক, কলকাতা)। বিনোদন সংখ্যা ১৯৮৪।
১১. *কাফেলা* (মাসিক, কলকাতা)। আষাঢ় ১৩৮৮/ জুন-জুলাই ১৯৮১।
১২. *সংবাদ প্রতিদিন* (দৈনিক, কলকাতা)। ৪ সেপ্টেম্বর ২০০২/ ১৮ ভাদ্র ১৪০৯।
১৩. এইচএমভির রেকর্ড-পরিচিতির মাসিক পুস্তিকা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আ ব্বা স উ দ্দী ন

লৌকিক সুরের চারণ

আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯০১-১৯৫৯) বাংলার এক ধ্রুপদী সংগীত-ব্যক্তিত্ব। মৃত্যুর অর্ধশতকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁর গানের আবেদন আজও নিঃশেষিত হয়নি — কালান্তরেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন মানুষের মনে। বাংলা গানের অনেক সংকট ও বিবর্তন সত্ত্বেও সেকালের সামান্য যে-ক'জন শিল্পীর গান মানুষকে এখনো মুগ্ধ ও প্রাণিত করে আব্বাসউদ্দীন তাঁদেরই একজন। তাঁর গান বাঙালিকে আজও স্মৃতিকাতর করে তোলে — নিয়ে যায় গ্রাম-নদী-প্রান্তরের কাছে। তাঁর অর্জন ও সিদ্ধি অসাধারণ। রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায়কে সংগীতমুখী করে তোলার পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ-বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলামের পাশাপাশি তাঁর নামও উল্লেখ করতে হয়। ছিলেন নজরুলের গানের ভাণ্ডারি, — গেয়েছেন আধুনিক কাব্যগীতি, উদ্দীপনামূলক দেশগান, ধর্মীয় চেতনার গান। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতির মূলে রয়েছে লোকগান — বিশেষ করে ভাওয়াইয়া গান। বাংলার প্রান্তিক উত্তর-জনপদের অজ্ঞাত-অনাদৃত এই আঞ্চলিক গানকে তিনি আপন প্রতিভার বলে পাঙ্‌ক্তেয় করে তোলেন — শিক্ষিত নাগরিকজনের মনে সৃষ্টি করেন গভীর আবেগ ও আবেদন। সেই হিসেবে তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো বিদগ্ধ সাহিত্যশিল্পীর কাছে হয়ে ওঠেন 'একজন অসাধারণ লোকসংগীত শিল্পী' (আব্বাসউদ্দিন : ভূমিকা)।

দুই

তাঁর 'আব্বাসউদ্দীন' হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে একটি বড়ো প্রেক্ষাপট। এক রক্ষণশীল সমাজে জন্মগ্রহণ করেও কেবল নিজের প্রতিভা ও সাধনার বলে সমাজের দৃষ্টি ও রুচি বদলে সক্ষম হয়েছিলেন। আব্বাসউদ্দীনের সংগীতের শিক্ষা, চর্চা-সাধনা ও প্রতিষ্ঠা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর জীবন-সংগ্রামেরই অন্তর্গত এক অধ্যায়। নানা পারিবারিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা-সমস্যা-অন্তরায় অতিক্রম করে তাঁকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়েছে।

ছেলেবেলা থেকেই আব্বাস ছিলেন 'গানের পাগল'। শৈশবে মোহররমের জারি কিংবা সত্যপীরের গান শোনার মধ্য দিয়ে গানের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। কিন্তু সুন্নি সম্প্রদায়ের শিয়াবিরোধী আন্দোলনের ফলে আব্বাসউদ্দীনের জন্মগ্রাম কুচবিহারের বলরামপুর ও আশপাশ অঞ্চলে মোহররমকেন্দ্রিক উৎসব ও মর্সিয়া গান বন্ধ হয়ে যায়। তবে প্রচলিত লোকসংগীতের ধারা কখনোই শুকিয়ে যায়নি। কুশান গান অর্থাৎ পালাগান শুনেও ভালো লেগেছে — আনন্দ পেয়েছেন। যাত্রাগানের প্রতিও খুব আকর্ষণ ছিল। সে-সময়ে তাঁকে যে-গান সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল, তা হলো ভাওয়াইয়া। তাঁর স্মৃতি-শ্রুতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে শৈশব-কৈশোরের দিনগুলোয় গ্রামীণ পরিবেশে শোনা সেই গানের সুর। আবেগ-মেশানো স্মৃতিচারণায় ধরা পড়ে সেই সুরধারার ছবি : 'তোরষা নদী — খরস্রোতা ছোট্ট পাহাড়ী নদী তোরষা — কুচবিহারের পাদমূল ধৌত করে তরতর বেগে চলেছে। তারি তীরে তীরে গান গেয়ে চলেছে মোষের পিঠে করে দোতারা বাজিয়ে মোষ-চালক মৈষালের দল। তাদের কণ্ঠের সুর ছেলেবেলায় আমার কণ্ঠে বেঁধেছিল বাসা' (*আমার শিল্পী জীবনের কথা* : ৬৯)। এইভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে থাকা অকৃত্রিম সুরের মোহে আব্বাস গানের বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলেন।

গ্রামোফোনে গান শুনে গানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ আরো তীব্র হয়। কলের গানে গান শোনার অভিজ্ঞতা আর এর প্রভাব তাঁর ওপরে কতোখানি পড়েছিল সে-বিবরণ মেলে তাঁর নিজের জবানিতেই : 'ঐ কলের গান শুনে সেই শৈশব থেকেই প্রাণে-মনে দোলা লেগেছিল, আমি কি কোনোদিন ঐ ভাবে কলের গানে গান দিতে পারব না? আমাদের বাড়ীতে প্রকাণ্ড ইঁদারা, সেই ইঁদারায় পানি তুলতে তুলতে হঠাৎ যেন কার ডাকে সাড়া দিয়ে উঠেছি, ইঁদারার ভিতরে একটি সুন্দর প্রতিধ্বনি হল। মনে হল এ প্রতিধ্বনিটা ঠিক কলের গানেই শুনেছি। ... একখানা গান ধরলাম, গানের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। মনে কী উল্লাস, মাকে ডাকছি, ভাইদের ডাকছি, শোন শোন শুনে যাও কলের গান' (ঐ : ১৬)। আসলে গান তাঁর মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। তাই তিনি শুনতেন 'পাখীর ডাকের ঐকতান', তাঁর কাছে 'ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকটা যেন মনে হত রাত্রির গান'। কোকিল-শ্যামা-দোয়েল-টিয়ার 'মিষ্টি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুর' তাঁকে মুগ্ধ ও প্রাণিত করতো। 'বউ কথা কও' পাখির মিষ্টি সুরে তাঁর 'বুকটা যেন মোচড় দিয়ে উঠত', আর মনে হতো, — 'আহা অমন মিষ্টি করে যদি আমি গাইতে পারতাম'। বর্ষায় ব্যাঙের ডাককে তিনি আবিষ্কার করেছেন, 'হলুদ গায়ে মেখে যেন হল্‌দে পরীর বাচ্চারা আনন্দে গান গেয়ে চলেছে' (ঐ : ১৮-২০)।

তিন

নিজের গ্রাম বলরামপুরে যতোদিন ছিলেন গ্রামীণ মানুষ আর প্রকৃতির কাছে গানের সুর ও শিক্ষা পেয়েছেন, গানের প্রতি আগ্রহ-অনুরাগ জন্মেছে। শুনে শুনে গান গাওয়ার চেষ্টা চলেছে। এই পর্যায় পর্যন্ত ছিলেন স্বশিক্ষিত গায়ক — গান শেখার কোনো সুযোগ মেলেনি। গ্রামের স্কুল থেকে পাস করে পড়তে যান কুচবিহার শহরে। কিন্তু সেখানে 'গলা ছেড়ে গান গাইতে' না পারার কারণে তুফানগঞ্জে এসে স্কুলে ভর্তি হন। প্রকৃতপক্ষে এখানে এসেই তাঁর গানের চর্চার একটা সুযোগ মেলে। এখানে থাকতেই চারণকবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশি যাত্রার সূত্রে স্বদেশি গান ও গণসংগীতের সঙ্গে পরিচিত হন। এ-সব গান তাঁকে অত্যন্ত আলোড়িত করে।

গান শেখার জন্যে আব্বাসউদ্দীন এককভাবে কারো কাছে ঋণী নন, টুকরো টুকরোভাবে এই ঋণ ছড়িয়ে আছে অনেকের কাছে, যেমন — সরকারি চিকিৎসক ডা. মোবারক হোসেন কিংবা জলপাইগুড়ির কুমার সরোজ রায়কত। কুচবিহারের সরকারি উকিল রাজেন রায়, সহপাঠী সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়া, সত্যনারায়ণ শুকুল — এঁদের কথাও উল্লেখ করতে হয়। উত্তরকালে কলকাতার জীবনে নজরুলের পরামর্শে তিনি প্রখ্যাত ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে নাড়া বেঁধে বেশ কিছুকাল উচ্চাঙ্গসংগীতের তালিম নেন।

আব্বাসউদ্দীনের সংগীত-প্রতিভা বিকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র যে কলকাতা, এ-পরামর্শ তাঁকে গ্রামের বৃদ্ধ ব্যবসায়ী রামরতন ঠাকুর ও কুচবিহার কলেজে তাঁর অর্থনীতির অধ্যাপক চুনীলাল মুখোপাধ্যায় বরাবর দিয়ে এসেছেন। এঁরা দু'জনেই তাঁকে কলকাতায় গিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান দেওয়ার জন্যে উৎসাহিত করেন। এই প্রসঙ্গে নজরুলের নামও উল্লেখ করতে হয়। এরপর তিনি কলকাতায় গিয়ে পূর্ব-পরিচিত প্রফেসর বিমল দাশগুপ্তের সহায়তায় হিজ মাস্টার্স ভয়েস্-এ গানের অডিশন দেন। অডিশনে পাস করে রেকর্ডে গান দেওয়ার জন্যে মনোনীত হন। তাঁর প্রথম রেকর্ড — 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং 'কোন বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো'। শৈলেন রায়ের লেখা গান দু'খানায় সুর-যোজনা করেন যথাক্রমে শৈলেন রায় ও ধীরেন দাস।

আব্বাসউদ্দীনের প্রথম রেকর্ডটি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এরপর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। কিছুকালের মধ্যেই তিনি হয়ে ওঠেন গ্রামোফোন রেকর্ডের জনপ্রিয় শিল্পীদের একজন। নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিচয় তাঁর সংগীতজীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হিজ মাস্টার্স ভয়েস্, টুইন, মেগাফোন, রিগ্যাল প্রভৃতি গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদী, মারফতি, মুর্শিদি, আধুনিক, ইসলামি, দেশাত্মবোধক, উর্দু কাওয়ালি, নজরুলগীতির মাধ্যমে তিনি গ্রামোফোনের গানে বৈচিত্র্য আনেন। রেকর্ডসংগীতের কল্যাণে তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি ক্রমশ শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গানের জগতে তিনি হয়ে ওঠেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি।

পেশাসূত্রে আব্বাস যখন কলকাতায় তখন একদিকে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানির ব্যস্ত শিল্পী, অপরদিকে কলকাতার নানা সভা-সমিতি-অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় গায়ক। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ের এক অনুষ্ঠানের বিবরণ থেকে তাঁর সাফল্যের ছবি পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রমুখ সেকালের খ্যাতিমান শিল্পীদের উপস্থিতিতে আব্বাসউদ্দীনের সংগীত-পরিবেশনার অভিজ্ঞতার একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখায় : 'বলির পাঠার মত কাঁপতে কাঁপতে স্টেজে প্রবেশ করে হারমোনিয়ামটা কোলে টেনে নিলাম। ... প্রথমেই গাইলাম, 'আজি শরতের রূপ-দীপালি'। গান শেষে কী করতালি! ভাবলাম গান বুঝি খারাপ হয়েছে, শত চীৎকার উঠল, 'আর একখানা।' গাইলাম, 'কোন বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো।' এ গান শুনেও মহা উল্লাস। আবার, আবার ! আর একখানা' (ঐ : ৫৫)। এরপর আব্বাসউদ্দীনের খ্যাতি ও চাহিদা ক্রমে বাড়তে থাকে। কলকাতার নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি প্রায় অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে গান দেওয়ার পাশাপাশি রেডিওতেও গান করতে শুরু করেন। এই পর্যায়ে তাঁর কবি-বন্ধু জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গ-সান্নিধ্য তাঁকে বিশেষ অনুপ্রেরণা জোগায়।

আব্বাসউদ্দীনের সংগীতজীবনের একটি বড়ো অধ্যায় জুড়ে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত-পরিবেশনা। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে তিনি চারণের বেশে বাংলার নানা জনপদে গান গেয়ে মানুষকে উজ্জীবিত-অনুপ্রাণিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছেন বিশেষ করে তিনি অবহেলিত-পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে জাগরণের গান শুনিয়েছেন — অশিক্ষা-কুসংস্কারের বিবর থেকে আলোয় নিয়ে এসেছেন। নতুন উদ্দীপনা জেগেছে বাংলার মুসলমানের মনে। আর এই কর্মকাণ্ডে আব্বাসউদ্দীন অবতীর্ণ হয়েছেন 'সভা-গায়কের ভূমিকায়'। বাঙালি মুসলমানের উত্থান ও নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে আব্বাসউদ্দীনের গানের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজে এক নীরব সাংস্কৃতিক বিপ্লব, সামাজিক উত্থান ও রাজনৈতিক সচেতনতা সূচিত হয়েছে। দেশবিভাগ নিয়ে রচিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৃহৎ ক্যানভাসের এক উপন্যাসে (*পূর্ব-পশ্চিম* : ৯৮) প্রসঙ্গক্রমে এসেছেন আব্বাসউদ্দীন। শিল্পী হিসেবে আব্বাসের খ্যাতি ও জনমানসে তাঁর প্রবল প্রভাবের পরিচয় মেলে একটি রাজনৈতিক সভার বিবরণে — মুর্শিদাবাদে মুসলিম লিগের এক বিশাল জনসভায় আব্বাসউদ্দীনের গান পরিবেশনে জিন্নাহ সাহেবের আপত্তি উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ খারিজ করে দেয়। জিন্নাহ নতি স্বীকার করেন, আব্বাসউদ্দীন গান গেয়ে সভা মাতিয়ে তোলেন। এ-থেকে বোঝা যায়, জনমনে আব্বাসউদ্দীনের কী বিপুল প্রভাব ছিল — গানের ভেতর দিয়ে তিনি কীভাবে জয় করেছিলেন জনচিত্ত। চল্লিশের দশকের তরুণ রাজনীতিক শেখ মুজিবুর রহমান, উত্তরকালে যিনি শোষিত-বঞ্চিত বাঙালি জাতির অনন্য নেতৃপুরুষ ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি — তাঁর আত্মকথায় এক জনসভার সূত্রে আব্বাসউদ্দীন ও তাঁর গান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : '... আব্বাসউদ্দিন সাহেবকে দেখবার জন্য হাজার হাজার লোকসমাগম হয়েছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে আব্বাসউদ্দিন সাহেব জনপ্রিয় ছিলেন। জনসাধারণ তাঁর গান শুনবার জন্য পাগল হয়ে যেত। তাঁর গান ছিল বাংলার জনগণের প্রাণের গান। বাংলার মাটির সাথে ছিল তাঁর নাড়ির সম্বন্ধ' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী* : ১১১)। আব্বাসউদ্দিনের সঙ্গে নৌকা-ভ্রমণের স্মৃতি রোমন্থন করে মুজিব বলেছেন : 'নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে' (ঐ : ১১১)।

চার

শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের কথা উঠলে অনিবার্যভাবেই প্রথমে উচ্চারিত হবে ভাওয়াইয়া গানের কথা। 'ভাওয়াইয়ার রাজপুত্র' — এই অভিধাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আব্বাসউদ্দীনের যোগ্য পরিচিতি। তোরষা-ধরলা–মানসাই-কালজানি-দুধকুমার-তিস্তা-বিধৌত উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সাংগীতিক ঐতিহ্য প্রতিফলিত মৈষাল-মাহুত-গাড়িয়ালের ভাওয়াইয়া গানে। এই ভাওয়াইয়ার উৎপত্তির যে ভৌগোলিক সীমারেখা, তার কেন্দ্রভূমিতেই আব্বাসউদ্দীনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাই তাঁর স্মৃতি-শ্রুতি, মন-মনন, চিন্তা-চেতনা, অভিজ্ঞতা-অস্তিত্বের সঙ্গে ভাওয়াইয়া গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল। আব্বাসউদ্দীন ছিলেন ভাওয়াইয়া গানের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম শিল্পী। তিনি এই লোকগানকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেন তাঁর অসামান্য কণ্ঠ-বৈশিষ্ট্যের গুণে।

লোকসংগীত সম্পর্কে শিক্ষিত নগরবাসীর অনুরাগ তখনো গড়ে ওঠেনি। আর ভাওয়াইয়া তো প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকগান, নাগরিক সমাজে একেবারেই বেগানা। আঞ্চলিক শব্দের দুর্বোধ্যতা এর রসগ্রহণে প্রধান বাধা। শিক্ষিত নাগরিক সমাজের কাছে লোকসংগীত, বিশেষ করে ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া-মুর্শিদি-মারফতি গানকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার পেছনে আব্বাসউদ্দীন ও কবি জসীমউদ্‌দীনের ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। এতে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্তের মতো লোকসংস্কৃতিপ্রেমীর প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। লোকসংগীত সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের আলোচনা আর আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠের গান কলকাতা মহানগরীর মানুষকে গ্রামীণ গীতি সম্পর্কে আগ্রহী ও অনুরাগী করে তোলে। জসীমউদ্‌দীন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁর আলোচনার সহযোগে আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠের ভাওয়াইয়া গান 'নাক ড্যাঙারার বেটাডা', 'ও কি গাড়িয়াল ভাই' ও আরো কয়েকটি লোকগান সবাইকে মোহিত-মুগ্ধ করে (*স্মৃতির পট* : ৪৩-৪৪)। এইভাবে ধীরে ধীরে অজ পল্লীগ্রামের অজ্ঞাত ভাওয়াইয়া গান নাগরিক রুচিকে তৃপ্ত করে শিক্ষিত সমাজে স্থান করে নেয়।

নানা অনুষ্ঠানে ভাওয়াইয়া গান পরিবেশনের মাধ্যমে এই গানের পরিচিতি ও সমাদর বাড়লেও, প্রথম পর্যায়ে গ্রামোফোন কোম্পানি ভাওয়াইয়ার রেকর্ড প্রকাশে সম্মত হননি। আঞ্চলিক বুলির অপরিচিত লোকগান সুধীসমাজে গৃহীত ও সমাদৃত হবে, এমন ধারণা তাঁদের ছিল না। সঙ্গত কারণেই আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি তখন তাঁরা নিতে চাননি। কিন্তু আধুনিক, ভাটিয়ালি ও নজরুলের নানা অনুষঙ্গের গান রেকর্ড করে আব্বাসউদ্দীন যখন যথেষ্টই নাম করেছেন, তখন লোকগান, বিশেষ করে ভাওয়াইয়া গানের রেকর্ড প্রকাশে গ্রামোফোন কোম্পানি আর তেমন আপত্তি করেনি। কিন্তু আব্বাসউদ্দীন জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাওয়াইয়া গানের ভাষাকে কিছুটা মার্জিত করে তবে তাঁর কণ্ঠে গান রেকর্ড করা হয়। পরে অবশ্য 'ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে', 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে' — এইসব গান 'মাতৃভাষাকে অবিকৃত রেখে'ই তিনি রেকর্ডে গেয়েছিলেন এবং তা 'শুধু উত্তরবঙ্গে নয়, সারা বাংলায় জাগিয়েছিল বিপুল আলোড়ন' (*আমার শিল্পী জীবনের কথা* : ৬৮-৬৯)। বিশিষ্ট লোকসংগীত-বিশেষজ্ঞ হেমাঙ্গ বিশ্বাস আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া ভাটিয়ালি গানের প্রশংসা করতে পারেননি — তাঁর বিবেচনায় 'সত্যিকারের ভাটিয়ালী তাঁর গলায় খেলে না মোটেই' — এই কারণে; কিন্তু তাঁকে 'ভাওয়াইয়ার জাদুকর' (*গানের বাহিরানা* : ৪৪) এই শিরোপা দিতে আদৌ কুণ্ঠিত হননি।

নজরুল আব্বাসউদ্দীনের ভাওয়াইয়া গানের খুবই অনুরাগী ছিলেন। আব্বাসের অপূর্ব গায়ন-পদ্ধতির কারণে ভাওয়াইয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ জাগে। 'তোরষা নদীর পারে পারে দিদি লো' ও 'নদীর নাম সই কচুয়া, মাছ মারে মাছুয়া' — আব্বাসের গাওয়া এই দুটি বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গানের সুর ও কথার ভাব নিয়ে নজরুল রচনা করেন — 'পদ্মদীঘির ধারে ধারে' এবং 'নদীর নাম সই অঞ্জনা, নাচে তীরে খঞ্জনা'।

ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল ও চটকা মিলিয়ে আব্বাসউদ্দীন প্রায় চল্লিশখানা গান রেকর্ড করেন। আবেদন-সৃজনে সক্ষম আব্বাসের কণ্ঠের 'ও কি গাড়িয়াল ভাই', 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে', 'কিসের মোর রাঁধন কিসের মোর বাড়ন', 'কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে', 'তোরষা নদী উতালপাতাল কার বা চলে নাও', 'আজি নদী না যাইও রে বৈদ', 'ওরে আগা নাওয়ে ডুবু ডুবু', 'একবার আসিয়া সোনার চাঁদ মোর', 'বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে', 'পতিধন, প্রাণ বাঁচে না যৈবন জ্বালায় মরি', 'ওরে বাবার দেশের ওরে কুড়ুয়া' — এইসব গানের কথা উল্লেখ করতে হয়। আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া ভাওয়াইয়া-ক্ষীরোল-চটকা গানগুলোর বাণী কিছু প্রচলিত, আবার কিছু বা তাঁর অনুজ আবদুল করীমের রচিত। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় আবদুল করীম-রচিত 'মধুমালা', 'মরুচমতি কন্যা', 'রূপধন কন্যা', 'হলদী-শানাই' ও 'মহুয়া সুন্দরী' — এই পাঁচটি লোকনাট্য-পালাও আব্বাসউদ্দীন রেকর্ড করেন।

সারাজীবনের সাধনায় আব্বাসউদ্দীন লোকগান — বিশেষ করে ভাওয়াইয়া গানকে কি গ্রামীণ কি নাগরিক উভয় সমাজেই জনপ্রিয় ও সমাদৃত করেছেন। ভাওয়াইয়া গান তাঁর সৌজন্যেই উত্তরবঙ্গের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আঞ্চলিক গানের স্তর থেকে জাতীয় পর্যায়ে উঠে এসেছে — এ-গান এখন বাঙালির গৌরব-গর্বের সাংস্কৃতিক সম্পদ।

পাঁচ

ভাটিয়ালি নদীকেন্দ্রিক পূর্ব-বাংলার বিশিষ্ট লোকগান। এই গানের সঙ্গে নদী-খাল-বিল-হাওরের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। করুণ সুরের এই গান ধ্বনিত হয় নৌকার মাঝি-মাল্লার কণ্ঠে। উদাস করা সুরের এই গানের মূল ভাব-ভাবনার বিষয় হলো প্রেম। সেই প্রেম লৌকিক থেকে কখনো কখনো অধ্যাত্মপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়। সারিগানের সঙ্গে ভাটিয়ালির একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। তবে পার্থক্য এই যে, সারি যৌথ কণ্ঠের দ্রুতলয়ের এবং ভাটিয়ালি একক কণ্ঠের মন্থর গতির গান। এই ভাটিয়ালি গান দিয়েই গ্রামোফোন কোম্পানিতে আব্বাসউদ্দীনের লোকসংগীতের রেকর্ডের সূচনা। ভাটিয়ালি গানের প্রতি আব্বাসের অনুরাগের মূলে রয়েছে নজরুল ও জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গ-সান্নিধ্য-প্রেরণা। ভাটিয়ালি ও পূর্ববঙ্গের নানা লোকগান সম্পর্কে আব্বাসউদ্দীনের মনে আগ্রহ জাগানোর মূলে ছিলেন জসীমউদ্‌দীন। তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি ভাটিয়ালি-বিচ্ছেদী গানের রেকর্ড আব্বাসউদ্দীন করেছিলেন। এর মধ্যে 'ও মাঝিরে — আজি ঝড়তুফানে চালাও তরী', 'ও আমার দরদী আগে জানলে', 'ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি', 'আমার গহীন গাঙ্গের নাইয়া', 'নদীর কূল নাই কিনার নাই রে', 'ও বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে', 'ও তুই যারে আঘাত হানলি রে মনে', 'মনই যদি নিবি রে বন্ধু কেন মন করিলি খালি', 'ও কি গাঙ্গের কূল রে গেল ভাঙ্গিয়া', 'পেটের জ্বালায় জুইলা মইলাম রে', 'ও তোরা কে কে যাবি লো জল আন্‌তে', 'আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে' — এই গানগুলো সেই সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

নজরুল-রচিত কয়েকটি ভাটিয়ালি গান আব্বাসের কণ্ঠে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায়। এর মধ্যে 'কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘবরণ কেশ', 'বন্ধু আজো মনে রে পড়ে আমকুড়ানা খেলা', 'গাঙ্গে জোয়ার এল ফিরে তুমি এলে কই' — এ-ক'টি গানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া জনপ্রিয় ভাটিয়ালি গানের তালিকায় গিরীন চক্রবর্তীর লেখা 'নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া দে', আশুতোষ চৌধুরী-রচিত 'ওরে ও পরাণের মাঝি', তুলসী লাহিড়ী-রচিত 'ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে' ও 'হায় পরাণ আমার কাঁদে' এবং জালালউদ্দীনের 'আরে ও ভাটিয়াল গাঙ্গের নাইয়া'-র নাম অনায়াসে এসে যায়। কানাইলাল শীল-সংগৃহীত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাটিয়ালি গানের মধ্যে কয়েকটি খুবই সমাদর লাভ করে, এ-ক্ষেত্রে 'আল্লা মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই', 'মাঝি বায়া যাও রে', 'ও ঢেউ খেলে রে', 'থাকতে পারঘাটাতে তুমি পারের নায়া', 'আমি ভাবি যারে পাই না গো তারে', 'কোন্‌খানে যাও বইয়া রে নদী'-র নাম করতে হয়।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস থেকে প্রকাশিত গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ড-পরিচিতির বুলেটিনে আব্বাসউদ্দীনের 'সোনা বন্ধু রে' ও 'আমি ভাবি যারে' (এন ১৭৩৬৫) — ভাটিয়ালি গানের এই রেকর্ডটি সম্পর্কে যে-মন্তব্য করা হয় তাতে শিল্পীর পরিবেশনা যে কতো আন্তরিক ও হৃদয়স্পর্শী সেই সত্যটি ফুটে উঠেছে : 'পল্লীদুলাল আব্বাস সাহেবের বহু গ্রাম্য গান আপনাদের ঘরে সযত্নে সঞ্চিত আছে জানি, তাই এ মাসে তাঁর নতুন রেকর্ডখানি শুনতে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। নদীতীরে হিজল গাছের ছায়াতলে উদাসী রাখালিয়া বাঁশীর মতো এই দু'টি পল্লীগীতি মরমী কণ্ঠে যে অপরূপ অভিব্যক্তি লাভ করেছে, তার বুঝি তুলনা নেই।'

আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে ভাওয়াইয়া কিংবা ভাটিয়ালি কিংবা মারফতি-মুর্শিদি এতোটাই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে প্রকাশিত হতো, শ্রোতা এই গানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন, তার চোখে ভেসে উঠতো গানের বাণীর সেই দৃশ্যাবলি। এমনি এক অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। আব্বাসউদ্দীনের গান তাঁর ছবি আঁকার প্রেরণা হতে পেরেছে। তাঁর গাওয়া একটি ভাটিয়ালি গানে নদীপারের যে দৃশ্যপট ভেসে উঠেছে, তা জয়নুলকে মুগ্ধ ও প্রাণিত করেছে, জন্ম নিয়েছে একটি অসাধারণ চিত্রকর্ম। জয়নুল বলেছেন : 'কোন আঙ্গিকের চর্চা করতে গিয়ে বস্তু-জ্ঞান শেখা যায় না। নদীর বাঁকের ছবি আঁকার সময় আমার তুলি আমার দৃষ্টির চাইতে আব্বাসউদ্দীনের গানের অনুকরণ করেছে বোধ হয় বেশী। 'ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে, কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে, দেখা যায় যে ঘরখানি, সেথায় বঁধূ থাকে লো'। নদীর বাঁকে বসে কাশের বনের ওপারে যদিও ফাঁকা এক বিরাট মাঠ তবুও তার মাঝে আমার চোখে বঁধুর ঘর ভেসে উঠত। আর তাই নিয়ে ছবি আঁকার যে আনন্দ তা বলে শেষ করা যায় না। এ গান আগেও শুনেছি, এ বাঁক আগেও দেখেছি। কিন্তু আব্বাসউদ্দীনের গলায় শুনবার আগে আমি তার ছবি আঁকতে পারিনি' ('আব্বাসউদ্দীন ও সংস্কৃতি-চেতনা', *উত্তরণ*, পৌষ-মাঘ ১৩৬৬; পৃ. ১২৮)। — শিল্পাচার্যের এই বক্তব্য আব্বাসউদ্দীনের গানের এক পরম স্বীকৃতি। আব্বাসের ভাটিয়ালি গানের অনুষঙ্গে আঁকা নদী ও নৌকার একটি তৈলচিত্র জয়নুল আবেদীন আব্বাস-পুত্র কণ্ঠশিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসীকে উপহার দেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জয়নুল বলেন, আব্বাসউদ্দীনের গান তাঁকে বারবার নৌকার জলজীবনের ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করে।

আব্বাসউদ্দীনের নদী ও নারীর গান — ভাটিয়ালির রূপ ধরে রূপসী বাংলার এক অপূর্ব দৃশ্য উন্মোচিত করে দেয়। কেবল শ্রুতি নয়, গহিন গাঙের অনুষঙ্গে উদাস-করা বেদনা-বিরহের চালচিত্রও সেখানে প্রকাশিত।

ছয়

দেহতত্ত্ব-বিচ্ছেদী-মুর্শিদি-মারফতি গানের ভেতর দিয়ে আব্বাসউদ্দীন লোকসংগীতের আরেকটি দিগন্ত উন্মোচিত করেন। ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া গানে তিনি নিসর্গ ও নারীর সৌন্দর্য ও বিরহের আবহ রচনা করেছিলেন, আর এবারে আত্ম-অন্বেষণের মরমি ভুবন নির্মাণ করলেন দেহতত্ত্ব-বিচ্ছেদী-মুর্শিদি-মারফতি গানের সুরে।

এই মরমি গানের জগতের সন্ধান তাঁকে দিয়েছিলেন জসীমউদ্‌দীন। একসময়ে তাঁর সঙ্গে মনোবিবাদ ঘটলে কানাইলাল শীল মরমি লোকগানের সংগ্রহ, সুরারোপ ও প্রশিক্ষণে আব্বাসউদ্দীনের সহায় হন। এই কানাইলালও জসীমউদ্‌দীনের হাত ধরেই কলকাতায় এসে গানের জগতের সঙ্গে যুক্ত হন — আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ঘটে জসীমউদ্‌দীনের মাধ্যমেই।

বিচ্ছেদী গান পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। নারীর বিরহ-বেদনার গভীর প্রকাশ ঘটেছে এই গানে। আব্বাসের কণ্ঠে গ্রাম্য সুরে যখন ধ্বনিত হয় :

আমি না জানি পিরীতের এত জ্বালা
সই জ্বইলা পুইড়া মইলাম গো পরাণ গেল
কী যেন মোহিনী জানে পাগলিনী হইলাম গো
ঘরের বাহির করিল॥

কিংবা,

আমার কার জন্যে প্রাণ এমন করে
কি বল তো গো প্রাণ সখি
আমার হৃদয়ের মাঝে তুষের অনল
জ্বলছে সদাই ধিকি রে ধিকি ॥

আবার,

ঐ না মাধবী বনেতে বন্ধু ছিল
সই গো বন্ধু আমার কোন্ বনে লুকাইল॥

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

— তখন প্রণয়ী-বিচ্ছেদ কাতর রমণীর গভীর হতাশা ও মনোবেদনাকে গভীরভাবে অনুভব করা যায়। প্রেম-বঞ্চিতা নারীর দুঃখ-যন্ত্রণা আব্বাসের কণ্ঠে আন্তরিক মমতায় ফুটে উঠেছে। শ্রোতার মনে সেই বেদনার আবেগ তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছেন — এখানেই তাঁর শিল্পী হিসেবে সার্থকতা।

মারফতি-মুর্শিদি গানে মরমি ভাবের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। পরম পুরুষের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা এই গানে প্রকাশিত। ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালির মতো আব্বাসউদ্দীনের মারফতি-মুর্শিদি গানও সমাদর পেয়েছে। এ-পর্যায়ে মোটের ওপর প্রচলিত গানই তিনি গেয়েছেন বেশি। এই গানগুলো সংগ্রহ করেন কানাইলাল শীল। কিছু গান জসীমউদ্‌দীন-রচিত, সুরও তাঁরই। আব্বাসউদ্দীনের 'আমার হাড় কালা করলাম রে', 'নৈরাশা হইও না রে দরগায়ে আল্লার', 'ও মন গুরু ভজ রে ওরে সোনার চাঁদ', 'গুরুর পদে প্রেমভক্তি হলো না মন হবার কালে', 'দিনার দিন দিন ফুরাইল শুক্‌নাতে তরণী', 'কোন রঙ্গে বাইন্ধ্যাছ ঘরখানা মিছা দুনিয়ার মাঝে গোঁসাইজি' — কখনো আত্মানুসন্ধানের পথে দেহজরিপ, গুরুবন্দনা, — কখনো পরম পুরুষের কাছে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে এইসব গানে। তাঁর ভক্তিমিশ্রিত আত্মনিবেদনের ফসল এই গানগুলো কেবল জনপ্রিয়তাই নয়, স্থায়িত্বও পেয়েছে।

আব্বাসউদ্দীন উত্তরবঙ্গের কুচবিহার-রংপুরের ভাওয়াইয়া, পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ-ফরিদপুর-ঢাকার ভাটিয়ালি, ফরিদপুর-ঢাকার মারফতি-মুর্শিদি-বিচ্ছেদী গান যেমন গেয়েছেন, তেমনি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গীতিও পরিবেশন করেছেন। আব্বাসউদ্দীন গ্রামীণ মানুষের এই ব্রাত্যসংগীতকে পরিবেশনের ভেতর দিয়ে নাগরিকজনের কাছে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁদের গর্ব-গৌরবের বস্তু করে তুলেছেন। আর যে লোকসমাজে এই গানের সৃষ্টি, তাঁদের শিল্প-সামর্থ্যের পরিচয় আব্বাস তুলে ধরে তাঁদের নতুন মহিমা দিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় করে তুলেছেন শিক্ষিত নগরবাসীর কাছে।

সাত

বাংলা গানের কথা, সুর ও মেজাজে কাজী নজরুল ইসলাম একটি স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব আরোপ করেছিলেন। গজল, কাব্যগীতি, শ্যামাসংগীত, ইসলামি ও উদ্দীপনামূলক জাগরণী সংগীতের ভেতর দিয়ে বাংলা গানের ভূগোলকে সম্প্রসারিত করেছিলেন তিনি। তাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলা গানে আলাদা এক নজরুল-যুগের সৃষ্টি হয়েছিল। কে. মল্লিক, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া, ধীরেন দাস, যূথিকা রায় — নজরুলের গানের এই স্মরণীয় রূপকারদের পাশাপাশি আব্বাসউদ্দীনের নামও ভিন্ন তাৎপর্য ও মহিমায় উল্লেখযোগ্য। তিনি নজরুলের প্রায় সবধরনের গানই গেয়েছেন। তবে এর মধ্যে কাব্যগীতি ও ইসলামি গানের ক্ষেত্রেই আব্বাস বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

নজরুলের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভের বিশেষ সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল আব্বাসউদ্দীনের। আব্বাস যখন দূর-মফস্বলের এক অখ্যাত শখের শিল্পী, তখনি নজরুল তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছিলেন। তাঁকে দিয়ে নিজের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানেও গান গাইয়েছেন। ঘরোয়া সংগীতবাসরে আব্বাসের গান শুনে উচ্ছ্বসিত নজরুল গ্রামোফোনে গান রেকর্ডের আমন্ত্রণ জানান তাঁকে। পরে যখন রেকর্ডে গান দেওয়ার সুযোগ এসেছে, তখন তিনি নজরুলের আরো কাছে আসার সুযোগ পান। একের পর এক নজরুলের গানের রেকর্ড করেছেন। তাঁর অনুরোধে নজরুল নতুন নতুন গানও লিখেছেন।

কে. মল্লিক ছিলেন নজরুলের গানের প্রথম পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী। আব্বাসের মতো তিনিও নজরুলের সব ধরনের গানই গেয়েছেন। কে. মল্লিক, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা — এঁরা যখন নজরুলের গান গেয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে, তখনই নজরুলের গান কণ্ঠে নিয়ে আব্বাসউদ্দীনের আবির্ভাব।

কি কাব্যগীতি, কি ইসলামি, কি লোকগান — নজরুলের সব ধরনের গানই আব্বাসের কণ্ঠে ভালো মানাতো। তাই নজরুলও তাঁর কোনো গান আব্বাস গাইলে খুশি হতেন। আব্বাস প্রথম পর্যায়ে গ্রামোফোনে নজরুলের কাব্যগীতি রেকর্ডের মাধ্যমেই নাম করেন। সুর ও বাণীর বৈচিত্র্যে মণ্ডিত নজরুলের বেশকিছু নির্বাচিত গজল ও কাব্যগীতি রেকর্ড করেছিলেন। এর প্রায় সবগুলোই প্রেম-বিরহের অনুষঙ্গে রচিত। গভীর প্রেমানুরাগ ও বিরহচেতনা রোম্যান্টিক বিধুরতায় প্রকাশিত হয়েছে এইসব গানে। নজরুলের প্রণয়-বিরহের গানে তাঁর ব্যক্তিজীবনের স্মৃতির ছাপ কখনো কখনো স্পষ্ট। এইসব গান আব্বাসউদ্দীন পরম আন্তরিকতায় পরিবেশন করেছেন। অধিকাংশ গজল ও কাব্যগীতিতে নজরুল নিজেই সুর-যোজনা করেন। কয়েকটি গানের সুরকার ছিলেন কমল দাশগুপ্ত ও ধীরেন দাস।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ, ডুবিয়া যাই এখন
দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন ॥

কিংবা,

বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর
সে আমারি গান, প্রিয় যে আমারি সুর ॥

আবার,

বিরহের গুলবাগে মোর ভুল ক'রে আজ
ফুটলো কি বকুল
অবেলায় কুঞ্জবীথি মুঞ্জরিছে
এল কি বুলবুল ॥

— আব্বাসউদ্দীনের দরদভরা কণ্ঠে গাওয়া এইসব গানের ভেতর দিয়ে নজরুলের প্রেম-বিরহের শিল্পভুবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আট

আব্বাসউদ্দীন আধুনিক, দেশাত্মবোধক, লোকসংগীত, ইসলামি — নানা ধরনের গান গাইলেও তিনি মূলত ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি এবং ইসলামি গানের জন্যেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানে একটি নতুন ধারার সংযোজন করেন ইসলামি গান রচনার মাধ্যমে। তাঁর এই ধর্মীয় চেতনার গান রচনার পেছনে ছিল আব্বাসউদ্দীনের তাগিদ, অনুরোধ ও প্রেরণা। এর আগে তিনি নজরুলের কাব্যগীতি রেকর্ড করে কবির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলেন। নজরুলের ইসলামি গান রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আব্বাসউদ্দীন বলেছেন : 'একদিন কাজিদাকে বললাম, 'কাজিদা, একটা কথা মনে হয়। এই যে পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গায়, এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রী হয়, এই ধরনের বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না? তারপর আপনি তো জানেন, কিভাবে কাফের-কুফর ইত্যাদি বলে বাংলার মুসলমান সমাজের কাছে আপনাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে একদল ধর্মান্ধ। আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন তা হলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার জয়গান' (*আমার শিল্পী জীবনের কথা* : ৫৭-৫৮)। আব্বাসের প্রস্তাবে নজরুল সম্মত হলেও, গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হলেন না। সম্ভবত ইসলামি গান বাজার পাবে কিনা এই সন্দেহ থেকেই গ্রামোফোন কোম্পানি ঝুঁকি নিতে চাননি। কিন্তু বেশ কাঠখড় পুড়িয়ে আব্বাস এইচএমভির এদেশীয় কর্তা ভগবতীচরণ ভট্টাচার্যের মত আদায় করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এরপর আব্বাসের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল রুমে বসে লিখে ফেললেন, — 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'। পরের দিন রচিত হলো এর জোড়ের গান — 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর'। নজরুলই গান দুটির সুরযোজনা করেন। রচনার দিন-চারেক পর গান দুটি রেকর্ড করা হয় আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে। আব্বাসের বক্তব্য — এই গান দুটিই নজরুলের লেখা প্রথম ইসলামি গান, আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া প্রথম ইসলামি গান এবং বাংলা সংগীত-সাহিত্যের প্রথম ইসলামি গান। অবশ্য কে. মল্লিকের অপ্রকাশিত আত্মকথায় ভিন্ন মতের সাক্ষাৎ মেলে (*বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা* : ৩৭-৩৮)।

আব্বাসের গাওয়া নজরুলের এই ইসলামি গান দুটির রেকর্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। ইসলামি গানের এই অসামান্য জনপ্রিয়তা ও সমাদরে আব্বাসউদ্দীন অত্যন্ত অনুপ্রাণিত, নজরুল খুবই আনন্দিত এবং গ্রামোফোন কোম্পানি বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এখান থেকেই শুরু হলো ইসলামি গানের যুগ। মানুষের অপরিসীম চাহিদার প্রেরণায় নজরুলের ইসলামি গান রচনায় হাত খুলে গেলো। আর আব্বাসউদ্দীন এই গানের জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে পরিচিত হলেন।

নজরুল-রচিত ইসলামি সংগীত প্রচারের মাধ্যমে আব্বাসউদ্দীন বাংলার মুসলিম সমাজে সংগীতকে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। যে-রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে সংগীত ছিল নিষিদ্ধ এবং তা শোনা ও গাওয়া পাপকর্ম হিসেবে বিবেচিত হতো, সেই সমাজে ধর্মীয় প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গে রচিত সংগীত সাদরে গৃহীত ও সমাদৃত হয়। এই কৃতিত্ব নজরুল, কে. মল্লিক ও আব্বাসউদ্দীন — মূলত এই তিনজনের।

নজরুলের ইসলামি গানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো কেউ কেউ ইসলামি গান রচনায় মন দেন। এঁদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা, আজিজুর রহমান, সাঈদ সিদ্দিকী, কাজী গোলাম আকবর প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। সবারই লক্ষ ছিল আব্বাসউদ্দীনকে দিয়ে তাঁদের গান রেকর্ড করানো। তবে নজরুলের কাব্য-প্রতিভা ও সংগীত-মেধার সহযোগে ইসলামি গান যে শিল্প-সুষমামণ্ডিত হয়ে সর্বজনের উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল, অন্যদের রচনায় সেই বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি।

হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভক্তিগীতির ঐতিহ্য যথেষ্ট প্রাচীন, সেই তুলনায় ইসলামি গানের উদ্ভব বিশ শতকের তৃতীয় দশকে মাত্র। ধারাবাহিকতার সূত্রহীন ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন এই নিতান্ত নবীন ইসলামি ভক্তিগীতিকে মাত্র এক দশকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, জনপ্রিয় এবং নতুন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধারা সৃষ্টির কৃতিত্ব বাণী-রচয়িতা হিসেবে নজরুল, আর এর রূপকার হিসেবে কে. মল্লিক ও আব্বাসউদ্দীনের।

নয়

আধুনিক গান দিয়েই আব্বাসউদ্দীনের গ্রামোফোন রেকর্ডের ভুবনে যাত্রা শুরু। তাঁর বন্ধু কুচবিহারের সন্তান শৈলেন রায়ের লেখা 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়' তাঁর রেকর্ডকৃত প্রথম গান। রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠায় ধীরেন দাসের সুরে ঐ শৈলেন রায়েরই লেখা 'কোন বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো' গানটি রেকর্ড করেন। রেকর্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সংগীতরসিক সুধীমহলে নবীন শিল্পী সাদরে গৃহীত ও অভিনন্দিত হন। এরপর আব্বাস রেকর্ড করেন 'আজ শরতের রূপ-দীপালি' ও 'প্রিয়া নিতি নিতি আসি তব দ্বারে' — এই গান দুটি। কলকাতার নানা অনুষ্ঠানে এই গানগুলো গেয়ে আব্বাস অতি দ্রুতই খ্যাতি ও পরিচিতি পেয়ে যান।

নজরুল, গোলাম মোস্তফা, শৈলেন রায়, তুলসী লাহিড়ী, জিতেন মৈত্র — এঁদের লেখা কাব্যগীতি গেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন আব্বাসউদ্দীন। কেবল আঞ্চলিক ভাষার লোকসংগীত নয়, ইসলামি গান নয়, কাব্যগীতিরও তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিল্পী। প্রথম পর্যায়ে আধুনিক গানে আব্বাস যে সাফল্য পান, তাতে তিনি আধুনিক গানের শিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর বন্ধু ও গানের সাথী কবি জসীমউদ্‌দীন বলেছেন : 'সে চাহিত আধুনিক গানের গায়ক হইতে। সেই জন্য সে কোনো সঙ্গীত শিক্ষকের নিকট নিয়মিতভাবে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষা করিত। তাহার উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক গানে প্রসিদ্ধ হওয়া' (*স্মৃতির পট* : ৩৭)। অবশ্য পরে যখন ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি ও ইসলামি গানে তিনি অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর এই মানসতার পরিবর্তন ঘটে।

আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া আধুনিক গানগুলোর সঙ্গে পরিচিত হলে তাঁর গীত-নির্বাচনের রুচি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নজরুলের গান সম্পর্কেই তিনি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং নজরুলও আব্বাসকে এ-বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য দেখাতেন। গানের ব্যাপারে বিরহচেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। যেমন, নজরুলের গান — 'তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ ডুবিয়া যাই এখন', 'অনেক ছিল বলার, যদি সেদিন ভালবাসতে', 'বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর', 'ভুলে যেয়ো — ভুলে যেয়ো সেদিন যদি পড়ে আমায় মনে', 'লায়লি তোমার এসেছে ফিরিয়া মজনু গো আঁখি খোলো', 'বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ ফুটলো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কি বকুল' ইত্যাদি। কবি গোলাম মোস্তফার লেখা কাব্যগীতির বিষয়গত মৌল প্রবণতাও অভিন্ন : 'যাও প্রভাত সমীর যাও', 'ফিরে চাও বারেক ফিরে চাও হে চির নিঠুর প্রিয়া', 'সে তো মোর পানে কভু ফিরে চাহে না হায়'। শৈলেন রায়ের 'কোন্ বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো' ও 'আজ শরতের রূপ-দীপালি', তুলসী লাহিড়ীর 'অন্তরে অন্তরে বাজে শুনি' ও 'বরষ বরষ দিবসরজনী', জিতেন মৈত্রের 'আজি ফাগুন রাতের মধুর হাওয়ায় পরাণ মানে না', 'কাহার লাগি রজনী জাগি' ও 'আর কি গো ফিরে আসিবে না প্রিয়' — এই গানগুলোও সেই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

দশ

আব্বাসউদ্দীন ছিলেন বহুমাত্রিক শিল্পী-ব্যক্তিত্ব। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়ার সুরে তিনি বেদনা-বিরহের প্রাকৃত-আবহ রচনা করেছেন, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি-বিচ্ছেদী-মরমি গানের সুরে নির্মাণ করেছেন মন-উদাস করা এক শিল্প-ভুবন, কাব্যগীতির রোম্যান্টিক বিধুরতায় আবিষ্ট করেছেন আধুনিক মনকে, ইসলামি গানের ভেতর দিয়ে ধর্মীয় চেতনায় যুক্ত করেছেন এক ভিন্ন শিল্প-সুরধারাকে। এরই পাশাপাশি তিনি উদ্দীপনামূলক জাগরণী গান গেয়ে স্বদেশপ্রীতি ও সমাজমনস্কতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আব্বাসউদ্দীনের উদ্দীপনামূলক জাগরণী সংগীতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্ব-সম্প্রদায়ের উত্থান-চেতনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-কামনা, সামাজিক সংস্কার, জনহিতব্রত, স্বদেশপ্রীতি। ইসলামি গানের মতো এই উদ্দীপনা-সংগীতের ক্ষেত্রেও নজরুলই ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়।

স্বদেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে বাংলার স্বাধীনতা ব্রিটিশ শক্তির করায়ত্ত হয় — বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিহত হন নির্মমভাবে। ব্রিটিশ শাসনকালে সিরাজউদ্দৌলা বাঙালির স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠেন কাব্য-নাটক-ইতিহাসের সৌজন্যে। আব্বাসউদ্দীনও এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাই মুর্শিদাবাদ সফরকালে 'সিরাজের স্মৃতি' তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কলকাতায় যখন কথিত অন্ধকূপ হত্যার কুখ্যাত স্মারক হলওয়ের মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা ও সিরাজের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্যে একটি রেকর্ড বের করার উদ্‌যোগ নেন। রেকর্ডের একদিকে 'সিরাজ', আর অপরদিকে 'পলাশী'। শৈলেন রায়ের রচনায় সুর-যোজনা করেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্পর্শকাতর এ রেকর্ড প্রকাশে গ্রামোফোন কোম্পানির দ্বিধা ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আব্বাসউদ্দীন নিজে উদ্‌যোগী হয়ে সেই সময়ের বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকের অনুমোদন আদায় করেন এই রেকর্ড প্রকাশের পক্ষে। 'সিরাজ' ও 'পলাশী'র গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এবং মানুষের মনে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

স্ব-সম্প্রদায়ের কল্যাণকামী হয়েও আব্বাসউদ্দীন ছিলেন পর-সম্প্রদায় সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। আজন্ম তিনি সম্প্রদায়-সম্প্রীতির পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন। তাই যখন হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কিংবা দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, তখন আব্বাস তার বিরুদ্ধে কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন নজরুলের গান :

ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু-মুসলমান
দেশ-জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান ॥

আব্বাস ছিলেন উদার, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধির মানুষ। তাই মুসলমান ছাত্রসমাজের আমন্ত্রণে 'মিলাদের সভা'য় যেমন ইসলামি গান পরিবেশন করেছেন সাগ্রহে, তেমনি হিন্দু ছাত্রদের অনুরোধে 'সরস্বতী পূজার জলসা'য়ও গান গাইতে কখনো কুণ্ঠিত হননি। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে বিশুদ্ধ বাঙালি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাঁর এই দুই সত্তার বিরোধ বাধেনি কখনো।

স্বদেশ-বন্দনার পরিচয় আছে তাঁর কোনো কোনো গানে। জন্মভূমির মহিমা ও সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত এইসব গানে। প্রকৃতির স্নিগ্ধ-সরস বর্ণনার ভেতর দিয়ে নতুন উপলব্ধিতে স্বদেশকে আবিষ্কারের প্রয়াস আছে নজরুলের কথায় আব্বাসের কণ্ঠের এই গানে :

নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম
চির-মনোরম চির-মধুর
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর ॥

আবার স্বদেশ মাতৃরূপে চিহ্নিত হয়েছে নজরুল-রচিত আব্বাসউদ্দীনেরই গাওয়া আরেকটি গানে। এখানে মাতৃরূপিণী জন্মভূমির পরাধীনতার বেদনা-গ্লানি প্রচ্ছন্ন :

ভোলো লাজ ভোলো গ্লানি জননী মুক্ত আলোকে জাগো
কবে সে ঘুমালি মরণ ঘুমে মা তো জাগিলি না গো ॥
চরণে কাঁদে মা তেমনি জলধি
বক্ষ আঁকড়ি কাঁদে নদনদী
ত্রিশ কোটি সন্তান কাঁদে নিরবধি
কাঁদে আর ডাকে মা গো ॥

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ-বন্দনার এইসব জাগরণী গান আব্বাসের কণ্ঠে গভীর আবেগ ও মমতায় ধ্বনিত হয়েছে। এ-নিছকই একজন শিল্পীর প্রথামাফিক গতানুগতিক সংগীত পরিবেশন নয়, এর বাণীর মর্মার্থ শিল্পী হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। স্বদেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও একাত্ম হয়েই আন্তরিক প্রেরণার বশে আব্বাস আসরে-বাসরে এইসব গান গেয়েছেন ও রেকর্ড করেছেন।

এগারো

গানের সুবাদেই থিয়েটার ও সিনেমার সঙ্গে যোগ ঘটেছিল আব্বাসউদ্দীনের। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আনুকূল্যে থিয়েটারে কাজ করার সুযোগ আসে। তিনি পরীক্ষামূলকভাবে আব্বাসউদ্দীনকে দিয়ে 'আমার গহীন গাঙের নাইয়া' গানটি মঞ্চে গাওয়ান। থিয়েটারের দর্শক-শ্রোতারা সাদরে গ্রহণ করেন তাঁকে। এতে আনন্দিত হয়ে শিশির ভাদুড়ী আব্বাসকে চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত করতে আগ্রহী হন। নাট্যাচার্য তাঁকে 'সীতা' ছবিতে বৈতালিকের পার্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তিনি নিয়মিত নাট্যাচার্যের বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে মহড়ায় অংশ নিতে থাকেন। নায়িকা কঙ্কাবতীকে কয়েকখানা গানও তুলে দেন। কিন্তু কট্টর সম্প্রদায়বিদ্বেষী ছবির প্রযোজক আব্বাসউদ্দীন মুসলমান বলে তাঁকে ছবিতে নিতে অসম্মত হন। এতে উদারচিত্ত শিশির ভাদুড়ী খুবই বিব্রত বোধ করেন। তিনি প্রযোজকের পরামর্শ-মতো হিন্দু নাম নিয়ে ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন আব্বাসকে। কিন্তু দৃঢ়চেতা আব্বাস এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এই অনুদার সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে কখনোই অনুমোদন করেননি।

এরপর আব্বাসউদ্দীন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিষ্ণুমায়া* ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান। আব্বাস জানাচ্ছেন : 'পার্ট আমার অক্রুরের। কাননবালা কৃষ্ণের ভূমিকায়। বিদুরের ঘরে কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে হবে। তারপর গান' (*আমার শিল্পী জীবনের কথা* : ৭২) এইভাবে তিনি 'প্রথম ছবিতে অবতীর্ণ' হন। তবে এর জন্যে কোনো পারিশ্রমিক বা সম্মানী জোটেনি। এর বেশ কিছুকাল পর চলচ্চিত্রের অঙ্গন থেকে আবার ডাক এলো। এবারের চরিত্রটি আগের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেইসঙ্গে অভিনয়ের জন্যে সম্মানী-প্রাপ্তির সুযোগও মিললো। আব্বাসউদ্দীনের সূত্রে এ-বিষয়ে জানা যায় : 'তুলসী লাহিড়ীর 'ঠিকাদার' বই হবে ছবিতে। চা-বাগানে ছবি নেওয়া হবে। কুচবিহার থেকে উত্তরে ডুয়ার্স চা-বাগানে সেখানকার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গাইতে হবে। আমার কাছে প্রস্তাব করলো শৈলেন রায়, 'তোমাকে এবার ছবিতে নামতে হবে।' সঙ্গীত রচয়িতা শৈলেন রায় নিজে, কাজেই তার কথা সিনেমাওয়ালাদের কেউ উপেক্ষা করতে পারল না। চুক্তিতে সই করলাম। সদলবলে কুচবিহার গেলাম। প্রায় পনর-কুড়ি দিন ধরে আলিপুর দুয়ার থেকে কাছেই দমপুর স্টেশনের এক চা-বাগানে ছবি নেওয়া হতে লাগল। সেখানে গাইতে হল —

'পৌষের পাহাড়ী বায়
কাঁটা যে বিঁধিল গায়
নকরী আর করব কি মরব কি মরব না।'

(*আমার শিল্পী জীবনের কথা* : ৭৫)।

বিষ্ণুমায়া ও *ঠিকাদার* ছাড়াও আব্বাস *মহানিশা* ও *একটি কথা* নামে অপর দুটি ছায়াছবিতেও অভিনয় করেছিলেন। চিত্রজগতের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল, যদিও এই মাধ্যমে যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি এবং সেই কারণে তেমন সাফল্যও আসেনি।

বারো

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর আব্বাসউদ্দীনকে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসতে হয়। তাঁর এই সিদ্ধান্তে সংগীতজগতের অনেকেই ব্যথিত হন, পঙ্কজকুমার তাঁদেরই একজন। স্মৃতিচারণায় তিনি মন্তব্য করেছেন : 'সে যুগের প্রখ্যাত পল্লীগীতি বিশারদ্ আব্বাসউদ্দীন আহমদ মহাশয়ের কথা একবার স্মরণ করা কর্তব্য মনে করি। ... সঙ্গীত-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। বাংলা লোকগীতির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন তিনি। দেশবিভাগের কিছু পরে তিনি যখন অন্য দিকে চলে যান তখন মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছিলাম' (*আমার যুগ আমার গান* : ১৮৫)। নতুন দেশে — নতুন পরিবেশে তাঁর প্রতিভার পূর্ণবিকাশ ও কদরদানি হতে পেরেছে এমন কথা বলা চলে না। যে সমাজ — যে সম্প্রদায়ের জন্যে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে যোগ্য স্বীকৃতি তিনি পাননি। আব্বাসউদ্দীনের জীবনের এই পর্বান্তরে নানা কারণে তাঁর সুরের ধারা ক্রমশ শুকিয়ে আসে। ঢাকায় গ্রামোফোন কোম্পানি না থাকায় রেকর্ডে তাঁর গান দেওয়া একরকম প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। আর পাশাপাশি সরকারি প্রচারমূলক গান ও পাকিস্তানের কওমি সংগীত পরিবেশন করে তাঁর প্রতিভার অপচয় করতে থাকেন। সর্বোপরি কলকাতায় সংগীতচর্চার যে পরিবেশ, সুযোগ ও সমাদর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলেন তা ঢাকায় কখনো পাননি। কলকাতার বৃহত্তর ও অনুকূল পরিবেশ ছেড়ে আসা তাঁর সংগীতজীবনের জন্যে কোনোভাবেই শুভ হয়নি। আব্বাসউদ্দীনের ট্র্যাজেডি এই যে, তাঁর মতো ধ্রুপদী-প্রতিভাকে ধারণ করার সাংস্কৃতিক আবহ ছিল না ঢাকায়, পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যের উন্নত সরকারি রুচিও তৈরি হয়নি। সব থেকে বড়ো সত্য — ঢাকা হয়ে উঠতে পারেনি কলকাতার যোগ্য বিকল্প।'

তেরো

বাংলা গানের ভুবনে আব্বাসউদ্দীনের আবির্ভাবের তাৎপর্য বহুমাত্রিক। তিনি বহমান লোকজীবনের সংগীতধারাকে জনপ্রিয় এবং তাতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। প্রাকৃতজনের গানকে নাগরিক-মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধর্মীয় অনুষঙ্গের গান গেয়ে একটি সংগীতবিমুখ গোঁড়া-রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিতে সক্ষম হয়েছেন। উদ্দীপনামূলক জাগরণী গানের পরিবেশনায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সমাজ ও স্বদেশের সপক্ষে। তাই এই প্রেক্ষাপট স্মরণে রাখলে তাঁকে নিছকই একজন সংগীতশিল্পীর বলয়ে আবদ্ধ রাখা যায় না, মাত্র আটান্ন বছরের জীবনে তার অর্জন অনেক বড়ো — অনেক বেশি। আক্ষরিক অর্থেই তিনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। সেই নিরিখে সব মিলিয়ে আব্বাসউদ্দীন যথার্থই বিবেচিত হবেন একটি 'প্রতিষ্ঠান' হিসেবে।

গ্রন্থঋণ

১. আব্বাসউদ্দীন আহমদ : *আমার শিল্পী জীবনের কথা*। ঢাকা, দ্বি-স : জুলাই ১৯৬৫।

২. জসীমউদ্‌দীন : *স্মৃতির পট*। ঢাকা, প-স : মার্চ ২০০০।

৩. হেমাঙ্গ বিশ্বাস : *গানের বাহিরানা*। কলকাতা, মাঘ ১৪০৪।

৪. পঙ্কজকুমার মল্লিক : *আমার যুগ আমার গান*। কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮।

৫. শেখ মুজিবুর রহমান : *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা, ২০১২।

৬. আবুল আহসান চৌধুরী : আব্বাসউদ্দিন। কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২।

৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : *পূর্ব-পশ্চিম*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা, তৃ-মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৯৭।

৮. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : *বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা*। ঢাকা, কার্তিক ১৪০৮।

৯. *উত্তরণ* (দ্বিমাসিক, ঢাকা) : পৌষ-মাঘ ১৩৬৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শচীন দেববর্মন

গোধূলির ছায়াপথে এক নিঃসঙ্গ পথিক

শচীন দেববর্মন (১৯০৬-১৯৭৫) — এই পোশাকি নামটি 'শচীনকর্তা' নামের আড়ালে অনেকটাই চাপা পড়ে গেছে। আমজনতার কাছে তিনি মোটের ওপর 'শচীনকর্তা' নামেই পরিচিত। সব মিলিয়ে তাঁর যে জীবন, তা যেন অনেকটাই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সিংহাসন-বঞ্চিত শরিকদের সন্তান তিনি। পিতা স্বেচ্ছানির্বাসনে বসতি গড়েন কুমিল্লা শহরে, অনেকটাই ক্ষোভ-অভিমান আর বিবাদ এড়াতে। রাজকীয় মহিমা-মর্যাদা বা উপাধি ছিল না, ঐশ্বর্যও ছিল না তেমন — তবে পরিবারে আভিজাত্যের অহঙ্কার অনেকখানিই ছিল। এ-বিষয়ে শচীনকর্তা স্মরণ করেছেন : 'রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণের থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গুরুজনেরা আমাদের শৈশব থেকেই সচেতন করে দিতেন। তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন যাতে আমরা তাঁদের মতে যারা সাধারণ লোক তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করি। আমি তাঁদের এ আদেশ কোনদিনও মেনে চলতে পারিনি। কেন জানি না — জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির টান অনুভব করে মাটির কোলে থাকতেই ভালবাসতাম। আর বড় আপন লাগত সেই সহজ সরল মাটির মানুষগুলোকে, যাদের গুরুজনেরা বলতেন সাধারণ লোক। যা-ই হোক, অসাধারণের দিকে না ঝুঁকে আমি ওই সাধারণ লোকেদের মাঝেই নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলাম শৈশব থেকেই' (*সরগমের নিখাদ* : ৪১-৪২)। এভাবেই জনবিচ্ছিন্নতার রাজ-ঐতিহ্য ভেঙেছিলেন শচীনকর্তা। মাটির সুরের গানের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ জেগেছিল এই 'সাধারণ মানুষ'দের সাহচর্যে এসেই। তাঁর শৈশবের গানের গুরু ছিল বাড়িরই দুই পরিচারক মাধব আর আনোয়ার — এদের কাছেই তাঁর লোকগানের হাতেখড়ি। গানের কান তৈরিতেও এই দু'জনের কাছে তাঁর ঋণ কম নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশ্য তাঁর রক্তে ছিল গান — ত্রিপুরা রাজ্য যে গানেরই দেশ, লোকের মুখে মুখে ফিরতো এই কথা। শচীনকর্তার সূত্রেই এই জনশ্রুতি সম্পর্কে জানা যায় : '... সেখানকার রাজবাড়িতে রাজা, রানী, কুমার, কুমারী থেকে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই, গান গাইতে পারে না এমন কেউ নাকি সেখানে জন্মায় না। ত্রিপুরার ধানের ক্ষেতে চাষী গান গাইতে গাইতে চাষ করে, নদীর জলে মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকা চালাতে জানে না; জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুররা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়। সেখানকার লোকেদের গানের গলা ভগবৎ প্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মানুষ — তাই বোধ হয় আমার জীবনটাও শুধু গান গেয়ে কেটে গেল' (*সরগমের নিখাদ* : ৪১)। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন, গানের আগে ছিল আরেকটি পর্ব — 'বাঁশি বাজানোর দিনগুলি'। শচীনকর্তা ভালো বাঁশি বাজাতেন — সেই চিরচেনা 'টিপ্‌রাই বাঁশি'।

দুই

উত্তরাধিকারের সূত্রেই নিজেদের পরিবারে সংগীতের আবহ ছিল। এক অগ্রজ — কিরণকুমার ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মন ছিলেন সংগীতগুণী — গানের বড়ো সমঝদার ও পণ্ডিত। তাঁর কাছেই আনুষ্ঠানিক গান-শেখার সূচনা। যদিও সে সময়ে কুমিল্লায় গানের নামকরা ওস্তাদ দু-একজন থাকলেও শচীনকর্তা পিতাকেই যোগ্য শিক্ষক বিবেচনা করেছিলেন। কুমিল্লার স্কুল ও কলেজে পড়ার সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রেরণাও কিছু লাভ করেন শিক্ষক-সতীর্থদের কল্যাণে। আর কুমিল্লা শহরে সেই সময়ে সংগীত ও সাহিত্যের অনুরাগী কয়েকজন কিশোর-তরুণ — অজয় ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ, সুশীল মজুমদার, নারায়ণ চৌধুরী — এঁদের সঙ্গ-সান্নিধ্যও তাঁর ভেতরের গানের মানুষটিকে জাগিয়ে তুলেছিল। উত্তরকালে এঁদের কেউ কবি ও গীতিকার, কেউ লেখক-সমালোচক, কেউ বা চলচ্চিত্রকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কুমিল্লাতেই নজরুলের সঙ্গে পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতার সুযোগ মেলে তাঁর। এইভাবে কুমিল্লার মতো মফস্বল শহর থেকেই গানের প্রতি একটা প্রবল টান তাঁর তৈরি হতে পেরেছিল।

এরপর বিএ পাস করে ১৯২৪-এ কলকাতায় যান এমএ পড়ার জন্যে। ইংরেজি বিষয় নিয়ে ভর্তিও হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম দিকে লেখাপড়ায় কিছু মনোযোগ থাকলেও পরে তা আর বজায় থাকেনি। গান শিখতে শুরু করেন সেকালের লোকপ্রিয় অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছে। শচীনকর্তার প্রবল নেশা ছিল তিনটি : খেলা, মাছ-ধরা আর গান। কিন্তু কলকাতার জীবনে গানের স্বার্থে অপর দুটি শখকে বিসর্জন দিতে হয়। অবশ্য পরে বোম্বাইয়ের (বর্তমান মুম্বাই) প্রবাসজীবনে খেলা-দেখা আর মাছ-ধরার নেশা ফিরে এলেও নিজের খেলার শখটি আর মেটাতে পারেননি। যা-ই হোক, পারিবারিক চাপে কলকাতায় আবার নতুন করে আইন-পড়ার দিকে ঝুঁকলেও সে বিষয়েও অল্পদিনেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। সহায়-সম্পত্তি পরিচালনার প্রয়োজনে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বাবার বিলেতে পাঠানোর প্রবল ইচ্ছা পূরণেও অনাগ্রহ প্রকাশ করেন — সেও ঐ গানের জন্যেই।

উচ্চাঙ্গসংগীতে তালিম নেওয়ার জন্যে কিছুকাল ওস্তাদ বদল খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে নাড়া বাঁধেন। এরপর গান শিখতে শুরু করেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কিন্তু একটা সময়ে গুরু-শিষ্যের সৌহার্দ্যের সম্পর্কে অনেকখানিই চিড় ধরে। কিছু কিছু কারণে ভীষ্মদেব শচীনকর্তার প্রতি অপ্রসন্ন হলেও তিনি গুরুর প্রতি কখনো শ্রদ্ধা হারাননি। অনেকটা স্বাবলম্বী মনোভাবের জন্যে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে শচীনকর্তা গান শিখিয়ে কিংবা নানা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে উপার্জন শুরু করেন। কলকাতার বাড়িতে 'সুরমন্দির' নামে একটি গানের স্কুলও খুলেছিলেন। গানের আড্ডাও বেশ জমতো এখানে। কলকাতায় এক জজসাহেবের নাতনি মীরা ধরকে গান শেখাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে গভীর অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দু'জনের বয়সের ব্যবধান থাকলেও প্রবল প্রণয়ের টানে তাঁদের বিয়ে আটকায়নি। ১৯৩৮-এ শচীনকর্তার সংসারে প্রবেশ করে সংগীতগুণী মীরা তাঁর জীবনকে 'বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে-গীতিতে' ভরিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যথেষ্ট প্রতিভা থাকলেও হয়তো সংসারের সব দায়িত্ব গ্রহণ করায় গানের জগতে মীরা খুব বেশিদূর এগুতে পারেননি। তাঁর একক কয়েকটি এবং শচীনকর্তার সঙ্গে মিলে দু'জনের কণ্ঠে চারটি গান রেকর্ডে বেরিয়েছিল। বিয়ের আগে মীরা বেতারে গান গেয়েছেন ও নানা সংগীত-সম্মেলনেও অংশ নিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বেশ কিছু গানও তিনি লিখেছিলেন। এ-সব গান শচীনকর্তার কণ্ঠে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন

গানে বাঙালি শিল্পীদের বিকশিত হওয়ার একটা বড়ো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে। ১৯০২-এ বিলেত থেকে গেইস্‌বার্গ ও তাঁর সঙ্গীরা এসে সেকালের নামি শিল্পী গওহরজান, লালচাঁদ বড়াল — এঁদের কণ্ঠের গান রেকর্ড করেন। সেই সূত্র ধরে এর পরপরই অনেক বিদেশি রেকর্ড কোম্পানি কলকাতায় এসে জড়ো হয়। পাশাপাশি উদ্যমী বাঙালিদের মধ্যেও কেউ কেউ রেকর্ড তৈরিতে এগিয়ে আসেন। তিরিশের দশকে বাঙালি মালিকানার তিনটি স্বদেশি গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি গড়ে ওঠে : জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের 'মেগাফোন' (১৯৩২), চণ্ডীচরণ সাহার 'হিন্দুস্থান' (১৯৩২) ও বিভূতিভূষণ সেনের 'সেনোলা' (১৯৩৫)। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া তখনকার নিয়ম-অনুসারে বেশির ভাগ শিল্পীই কোনো না কোনো কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ বাঁধা শিল্পী হিসেবে কাজ করতেন। শচীনকর্তাও তেমনি বাঁধা পড়লেন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানিতে। যদিও রেকর্ডে গান দেওয়া নিয়ে এর আগে শচীনকর্তার ভারি তিক্ত ও অপমানসূচক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। হিজ মাস্টার্স ভয়েসে তিনি যখন গান রেকর্ড করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যান, এইচএমভি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাঁর কণ্ঠের কথিত ত্রুটির কারণে — মানে অনুনাসিক স্বরের জন্যে। যদিও উত্তরকালে এই ত্রুটিই শচীনকর্তার গুণ হয়ে উঠেছিল — বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমাদর পেয়েছিল। বিলেত থেকে গান রেকর্ডিংয়ের বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে নামজাদা বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোন রেকর্ড ব্যবসায়ী এম.এল. সাহার পুত্র চণ্ডীচরণ সাহা কলকাতার ৬/১ অক্রুর দত্ত লেনে 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ অ্যান্ড ভ্যারাইটিজ সিন্ডিকেট লিমিটেড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এখান থেকেই বের হতো রাখালবালকের বাঁশি-বাজানো ছবির লেবেল লাগানো 'হিন্দুস্থান রেকর্ড'। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও আনুকূল্য পেয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। ১৯৩২ সালের ৫ এপ্রিল হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসের নিজস্ব স্টুডিওতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা ও গান রেকর্ড করেন 'তা দিয়েই হিন্দুস্থান রেকর্ডের যাত্রা শুরু'। সেকালের অনেক নামি শিল্পী 'হিন্দুস্থানে'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নাম করতে হয় কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুন্দনলাল সায়গল, শচীন দেববর্মন, পঙ্কজকুমার মল্লিক, সুধীরলাল চক্রবর্তী, দিলীপকুমার রায়, রেণুকা দাশগুপ্তা, সাবিত্রী দেবী, আঙ্গুরবালা, সুপ্রভা ঘোষ (সরকার), অনুপম ঘটক, রাজেশ্বরী বাসুদেব (দত্ত), কমিয়া ঠাকুর,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শান্তিদেব ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস এবং আরো অনেকের। মার্গসংগীতের দিক্‌পালেরাও এসেছিলেন অক্রুর দত্ত লেনের 'হিন্দুস্থানে'র গানের বাড়িতে। মনে পড়বে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, শ্রীকৃষ্ণ রতনঝঙ্কার, পণ্ডিত দিলীপচাঁদ বেদী — এঁদের কথা। শচীনকর্তার প্রথম গানের রেকর্ড বের হয় এই 'হিন্দুস্থান' থেকেই। তিনি লোকগানে যেমন, আধুনিক গানেও তেমনি সুর ও গায়কীতে একটি নতুন 'ধরন' সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দুস্থান রেকর্ডের চুক্তিবদ্ধ শিল্পী হিসেবে বাংলা-হিন্দি ফিল্ম-ননফিল্ম সব মিলিয়ে তাঁর ১১৪টি গানের রেকর্ডিং হয় এই প্রতিষ্ঠান থেকে। ১৯৩২-এ এইচ-১১ নম্বর রেকর্ডে যথাক্রমে হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শৈলেন রায়ের কথায় প্রথম তাঁর এই গান দুটি প্রকাশ পায় — 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে যাই' ও 'এই পথে আজ এস প্রিয় কর না আর ভুল'। কালজয়ী এই শিল্পী প্রচুর ব্যবসা দিয়েছিলেন 'হিন্দুস্থান'কে। আজও শচীনকর্তার গানের আবেদন নতুন যুগের শ্রোতাদের কাছে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তাঁর গান নিয়ে হালে সুরস্মৃতির একটি অনবদ্য সিডি-অ্যালবাম বের করেছে 'হিন্দুস্থান রেকর্ড'।

চার

তিরিশের দশককে বাংলা গানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। গ্রামোফোন রেকর্ডের সৌজন্যে এতো অসাধারণ শিল্পী তাঁদের কণ্ঠের সুরের মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছেন তার কোনো তুলনা হয় না। একেকজন শিল্পী আলাদা আলাদা গায়কীর বৈশিষ্ট্যে বাঙালি শ্রোতাকে মুগ্ধ-অভিভূত করেছেন। এসেছেন গানের বাণী নিয়ে নতুন যুগের গীতিকার, তেমনি সুরসৃষ্টিতেও ভিন্ন ধরনের আবেদন তৈরি হয়েছে। শচীনকর্তাও এই সংগীত-ভুবনে এক নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিলেন। লোকগান (মূলত ভাটিয়ালি), আধুনিক, রাগপ্রধান, ধর্মগীতির (বিজয়া-আগমনী) পাশাপাশি হিন্দি গান ও ভজনও রেকর্ড করেছিলেন। বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষাতেই ফিল্মের গানও গেয়েছেন। নিজেই তাঁর গানের বিষয়ে বলেছেন : 'এ সময় থেকে আমি নিজে গানের সুর রচনা করতাম এবং নিজেই গাইতাম। ... এখন থেকেই নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, নিজের স্বতন্ত্র স্টাইলে সুর-রচনা করা আরম্ভ হলো। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ-ছয় বছরে লোকসঙ্গীত ও ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের সংমিশ্রণে নিজস্ব ধরনে সুর-রচনা করলাম —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যা অন্য কারো সঙ্গে মিলল না। এভাবে আমি আমার নিজস্ব গায়কী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ... আমার এক নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং জনসাধারণের নিকট থেকে সমর্থনও পেয়েছিলাম আমার এই প্রচেষ্টায়, তাঁদের নিকট জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করে' (*সরগমের নিখাদ* : ৮৪)।

শিল্পী হিসেবে শচীনকর্তার নাম ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি'র। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে এলপিসহ মোটামুটি তাঁর গানের ৮৭টি রেকর্ড বেরিয়েছিল। বাংলা গানের ভেতরে আধুনিক ও লোকগান যেমন ছিল, তেমনি নজরুলগীতিও ছিল চারটি। কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের তথ্য-অনুসারে সব মিলিয়ে রেকর্ডে তাঁর বাংলা গানের সংখ্যা ১৩১, এর মধ্যে একক ১২৭ ও দ্বৈতকণ্ঠে ৪টি ('শচীনকণ্ঠ', *দেশ*, বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৫)। কিন্তু আমাদের হিসেব মতে তা হবে ১৩২ — একক ১৩০ ও দ্বৈতকণ্ঠে ২। হিন্দিগানের সংখ্যার হিসেব এর বাইরে — সেই সংখ্যা হবে ৪২। রেকর্ডে নজরুল ছাড়া হেমেন্দ্রকুমার রায়, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, জসীমউদ্‌দীন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবি গুহমজুমদার, সুবোধ পুরকায়স্থ, মোহিনী চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মীরা দেববর্মনের লেখা গান তিনি গেয়েছেন। এইসব গীতিকবির মধ্যে অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গেই শচীনকর্তার সবচেয়ে বেশি সখ্য ছিল। এরপর নাম করতে হয় সুবোধ পুরকায়স্থ ও বয়সে বেশ ছোটো হলেও মোহিনী চৌধুরীর। নজরুলের সঙ্গ-সান্নিধ্য ও স্নেহ-প্রীতিলাভের কথাও স্মরণ করেছেন তিনি : 'কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও দীর্ঘকাল ধরে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন এবং আমি তাঁর স্নেহধন্য শিল্পী। ... আমার গান ও সুর খুবই পছন্দ করতেন। ... আমার নিজস্ব ধরনে গানে সুর দিয়ে তাঁকে যখনই শুনিয়েছি, উৎসাহিত করেছেন আমাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। তাঁর রচিত গান রেকর্ড করতে আমাকে আদেশও দিয়েছিলেন। আমার জন্যই বিশেষভাবে সেগুলো রচনা করেছিলেন তিনি। আমি তা রেকর্ডও করেছিলাম এবং সব কটি গানই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কাজীদার রচনার গুণে। ... কাজীদার সঙ্গলাভ আমার জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা' (*সরগমের নিখাদ* : ৫৮)। রবীন্দ্রনাথকে ঘরোয়া পরিবেশে কাছ থেকে দেখেছেন এবং অতুলপ্রসাদ সেনকে গানও শুনিয়েছেন। তবে এঁদের কোনো গান তিনি পরিবেশন কিংবা রেকর্ড করেননি। সম্ভবত তাঁর গলা রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশনের উপযোগী ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেশির ভাগ গানই শচীনকর্তা নিজের সুরেই গেয়েছেন, কিছু গানের সুরস্রষ্টা নজরুল ও সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। সুর-যোজনার পাশাপাশি স্বরলিপিও তৈরি করতেন তিনি। *সুরের লিখন* নামে তাঁর করা পঁচিশটি গানের স্বরলিপি বৈশাখ ১৩৪৫ সনে প্রকাশিত হয় কলকাতার ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে। 'ও কালো মেঘ বলতে পারো', 'স্বপন না ভাঙ্গে যদি', 'যদি দখিনা পবন', 'আলো-ছায়া দোলা', 'ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায়', 'ওরে সুজন নাইয়া', 'তুমি নি আমার বন্ধু', 'বন্ধু বাঁশী দাও মোর হাতেতে', 'ফুলের বনে থাকো ভ্রমর', 'পিঞ্জরার পাখীর মত', 'তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে', 'প্রেমযমুনারি পারে মোর হিয়া কেঁদে মরে', 'কাঁদিব না ফাগুন গেলে', 'ছিল মাধবী রাতি গো', 'প্রেমের সমাধি তীরে', 'গোধূলির ছায়াপথে', 'আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে', 'এই মহুয়া বনে মনের হরিণ হারিয়ে গেছে', 'মলয়া চল ধীরে', 'তুই কি শ্যামের বাঁশীরে', 'বঁধু গো এই মধুমাস', 'প্রেমযমুনায় হয়ত কেউ', 'হায় কি যে করি এ মন নিয়া', 'মালাখানি ছিল হাতে', 'সেই যে দিনগুলি', 'ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে', 'মন দিল না বঁধু', 'বাঁশী শুনে আর কাজ নাই', 'বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে-গীতিতে', 'বিরহ বড় ভাল লাগে', 'ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা', 'রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে', 'তাক্‌দুম তাক্‌দুম বাজাই', 'কে যাস্ রে ভাটি গাঙ্ বাইয়া' — শচীনকর্তার এইসব গান সংগীতরসিক বাঙালিকে আজও স্মৃতিকাতর করে তোলে।

পাঁচ

সেকালে সব গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানিই মাসে মাসে নিয়মিত তাঁদের গানের তালিকা-পুস্তিকা বের করতো। তাতে প্রকাশিত রেকর্ডের গানের বিবরণ যেমন থাকতো, তেমনি উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের পরিচিতিও মিলতো। ১৯৩৬-এর অক্টোবর 'শারদীয় আনন্দ নিবেদন' নামে প্রকাশিত 'হিন্দুস্থানে'র রেকর্ড-বিবরণীতে ওই মাসে প্রকাশিত সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সুরে এবং অজয় ভট্টাচার্য ও বিনয় মুখোপাধ্যায়ের কথায় শচীনকর্তার 'মম মন্দিরে এলে কে তুমি' ও 'নতুন ফাগুনে যবে আজি ধরা চঞ্চল' গান দু'টি সম্পর্কে বলা হয় : 'কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মন শুধু বাংলা কেন সারা ভারতের সঙ্গীত রসগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত। তাঁহার এইবারকার গান দুইখানিতে সঙ্গীতদেবতার আরতি সম্পূর্ণ করিয়া যথার্থই যেন মরুতে মলয়া বহাইয়াছেন।' শচীনকর্তার রেকর্ড সম্পর্কে এ-রকম উচ্ছ্বসিত ভাষার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞাপন মাঝে-মধ্যেই 'হিন্দুস্থানে'র ক্যাটালগে প্রকাশ পেতো। আসলে শচীনকর্তা বাংলা গানের রূপ ও রীতিতে নতুন ব্যঞ্জনা যোগ করেছিলেন — এনেছিলেন ভিন্ন আবহ। এ-কথা সত্য যে : 'শচীন দেবের আবির্ভাবের জন্মলগ্নে ছিল একটি নতুন যুগ-প্রবর্তনার ইঙ্গিত, যা গতানুগতিক নয়, স্বাতন্ত্র্যে এবং স্বকীয়তায় আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এই পূর্বানুবৃত্তি পরিপন্থী-কালের গণ্ডীর অতিক্রম-অন্বিষ্ট সঙ্গীত-চিন্তার মধ্যেই আছে শচীন দেববর্মনের নিজস্ব কৌলীন্য এবং সুর-সৃষ্টিতে নতুন যুগের সূচনা' (কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য : 'শচীনকণ্ঠ', *দেশ*, বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৫)।

নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির প্রথম যুগের রেকর্ডিংয়ের যন্ত্রী। তাঁর এক স্মৃতিচর্চায় এই কোম্পানির পুরনো দিনের অনেক অজানা কথার হদিস মেলে। শিল্পীর পাশাপাশি ব্যক্তি শচীন দেববর্মন সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যায় তাঁর এই স্মৃতিচর্চা থেকে। শচীনকর্তা ছিলেন স্নেহশীল, প্রীতিময়, বন্ধুবৎসল, সমদর্শী একজন মরমি মানুষ। তিনি ছিলেন সবারই 'শুভাকাঙ্ক্ষী'। কর্মক্ষেত্রে একবার বিপন্ন হলে শচীনকর্তা কীভাবে তাঁকে উদ্ধার করেন সেই বিবরণ দিয়েছেন নীরদবরণ। কলকাতায় এসে তখনও তেমন খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেননি, সেই কে.এল. সায়গলকে শচীনকর্তাই হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানিতে নিয়ে আসেন। শিল্পী হিসেবে শচীনকর্তার বৈশিষ্ট্য ও কৃতির ধারণা মেলে নীরদবরণের জবানিতে : 'আমি যখন শচীন দেববর্মণের রেকর্ড করতে আরম্ভ করি সেদিনকার কথা আমার সম্পূর্ণ মনে আছে। সে গান দুটি হচ্ছে, 'তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে' এবং 'প্রেম-যমুনার পারে'। ... বাংলায় বিশেষত পূর্ববাংলায় যেসব লোকগীতি তখন প্রচলিত ছিল যেমন ভাটিয়ালি এবং আরো বিভিন্ন রকম লোকগীতি — সেই লোকগীতির সঙ্গে তিনি যেরকম দক্ষতার সঙ্গে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত মিশিয়ে একটা নতুন জিনিস তৈরি করেছিলেন, সেটা আমাদের সারা ভারতের সঙ্গীতজগতের একটা বিরাট অবদান' (সাপ্তাহিক *দেশ*, ১৬ পৌষ ১৩৮৯)। নীরদবরণ কথা-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন : 'সাঙ্গীতিক নিবেদনের মধ্যে তাঁর দুটো জিনিস ছিল। প্রথম, আমরা দেখেছি লোকসঙ্গীতের সঙ্গে মার্গসঙ্গীত মিশিয়ে তিনি অপূর্ব একটা জিনিস তৈরি করেছিলেন। দ্বিতীয়, আর একটা জিনিস করতে আরম্ভ করলেন, এখন যেটাকে আমরা রাগপ্রধান বলি। সেই রাগপ্রধান গানের প্রথম স্রষ্টাদের মধ্যে তিনিই বিশিষ্ট একজন। আরো পরের দিকে এল আধুনিক গান নিয়ে তাঁর বিশেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা। ... এখন তো আমরা কত আধুনিক গান শুনতে পাচ্ছি। শচীন দেবও পরে অনেক আধুনিক গান নিবেদন করেছেন। কিন্তু যৌবনারম্ভে যখন তাঁর মন সঙ্গীতরসে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, একেবারে গানে গানে মিশে গিয়েছিল, তখন তিনি সঙ্গীত ছাড়া আর কোনো জিনিস চিন্তা করতেন না, সেই সময় তাঁর কাছ থেকে যেসব গান শুনতে পেলাম সেগুলি চিরকালের জন্য অমর হয়ে থাকবে' (সাপ্তাহিক *দেশ*, ঐ)।

শিল্পী হিসেবে শচীনকর্তার মূল্যায়ন অনেকেই করেছেন, নানা আঙ্গিকে নানা অনুষঙ্গে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যে ভিন্ন তাৎপর্যের পরিচয় মেলে : 'For temperament 'mejaj' or 'tabiyat' as it is called, Kumar Sachindra Dev Burman is incomparable among the artists I have heard.'

ছয়

এই যে শচীনকর্তা, গান শেখার জন্যে তিনি অনেক কষ্ট করেছেন — ত্যাগ স্বীকারও কম করেননি। এ-কাজে তাঁর নিষ্ঠা ছিল উল্লেখ করার মতো। তাঁর এই চেষ্টার কথা আর শিল্পী হিসেবে মূল্যায়ন করে আব্বাসউদ্দীন আহমদ তাঁর স্মৃতিচর্চায় বলেছেন : 'আর একটি শিল্পী আমাকে বড়ই মুগ্ধ করেছে। তিনি হচ্ছেন কুমার শচীন দেববর্মন। জানি না তাঁর কণ্ঠে কী যাদু লুকানো আছে, ওঁর গান শুনলেই আমি যেন কোন্ দেশে চলে যেতাম। একবার শচীন দেববর্মনের সাথে দিনাজপুর শহরে একটা বৈঠকে গান গাইতে যাই। দু'দিন একসাথে একই ঘরে ছিলাম। ... আমার ভাওয়াইয়া গান শুনে ভদ্রলোক পাগল। একটা গানের কলি দিনে পঞ্চাশবার বলতেন আমাকে আওড়াবার জন্যে। 'হলো না আব্বাস ভাই, ঐ যে জায়গাটায় কী করে গলাটা ভাঙলেন? হলো না আমার, আর একবার — প্লিজ!' এমনি করে গোসল করার সময়, ঘুমুবার আগে, বেড়াতে গিয়েছি সেখানেও, 'গান আর একবার আব্বাস ভাই — ও মোর কালারে কালা!' গান শেখার কী আন্তরিকতা আর শিল্পীর জন্য কী প্রশংসা, কী দরদ যে তাঁর অন্তরে জমা করে রেখেছেন! সে সময়কার তাঁর গাওয়া 'যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে', 'এই মহুয়া বনে মনের হরিণ হারিয়ে গেছে', 'কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া', 'গোধূলির ছায়াপথে', 'পদ্মার ঢেউ রে' ইত্যাদি গান সঙ্গীত-জগতে এক যুগান্ত সৃষ্টি করেছিল। এক কথায় তিনি বাংলা গানের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন (*আমার শিল্পী জীবনের*

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা : ১২০) — এইভাবেই ত্রিপুরার রাজ্যহারা যুবরাজ অবশেষে সংগীত-সাম্রাজ্যের যুবরাজ হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু লোকগানের শিল্পী হিসেবে আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে শচীনকর্তার এক জায়গায় সামান্য হলেও মৌলিক পার্থক্য আছে। কিছু হেরফের সত্ত্বেও আব্বাসউদ্দীনের ভাওয়াইয়া গান ছিল মৃত্তিকা-সংলগ্ন, কিন্তু শচীনকর্তার লোকগানে সেই তুলনায় কথা ও সুরে আধুনিকতার নাগরিক ছোপ খানিকটা পড়েছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই দু'জন সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন : 'এঁদের পরিবেশনায় শিক্ষিত 'রেওয়াজী গলা'র সচেতন ভঙ্গিমা ছিল, যেজন্য হয়ত তা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তো কোথাও মূল সুরের বিকৃতি করেননি। এবং গ্রাম্য গায়কীও ধরে রাখতে পেরেছিলেন' (*গানের বাহিরানা* : ২৪৯)। কথাটা হয়তো অসত্য নয়, অন্তত নাগরিক সংগীত-বোদ্ধা রাইচাঁদ বড়ালের এই মুগ্ধ-মন্তব্য এর সমর্থন জোগাবে : 'তিনি [শচীন দেববর্মন] যখন তাঁর ... নিজস্ব ঢঙে পল্লীগীতি গাইতেন তখন মনে হত আমি যেন কোন গ্রামেই আছি, আমি সে গ্রামের মাটির গন্ধ পাচ্ছি, নদীর জলোচ্ছ্বাস শুনতে পাচ্ছি' (*কুমার শচীন দেববর্মন জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ* : ১৫২)।

গ্রামোফোনের পাশাপাশি বেতারেও তিনি নিয়মিত গান করতেন। রঙ্গমঞ্চে নাটকের গানেও সুর-যোজনা করে প্রশংসা পেয়েছেন। কলকাতা ও তার বাইরেও নানা সংগীত-জলসায় তাঁর উপস্থিতি প্রায় অনিবার্য ছিল বোম্বাই যাওয়ার আগ পর্যন্ত। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কলকাতার যে-কোনো সংগীতের অনুষ্ঠানে শচীনকর্তা ছিলেন 'হায়েস্ট পেড সিঙ্গার' (*ভাটি গাঙ বাইয়া* : ১৩৩)।

সাত

শচীনকর্তা মানুষটি ছিলেন একটু বিচিত্র ধরনের। খেয়ালি, সরল, রঙ্গপ্রিয়, একগুঁয়ে — সেইসঙ্গে কিছুটা কৃপণ নামও কিনেছিলেন। বেখেয়ালে দশ টাকা মনে করে একশো টাকার নোট দিয়ে এসে মনভোলা মানুষটি স্ত্রীর তিরস্কার সহ্য করেন হাসিমুখে। হিন্দি ফিল্মে যখন কাজ করতেন, পারিশ্রমিক নিয়ে অন্য অনেকের মতো দর-কষাকষি করতে পারতেন না। আবার মোটরের তেল পুড়িয়ে গড়িয়াহাট পর্যন্ত যান এক ফেরিঅলা ছোক্‌রার কাছে দেশি বিস্কুট কিনতে, কষে দরদাম করে তারপর তা কেনেন। বিহারের দুস্থ বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্যে তাঁর কাছে গেলে নানা অজুহাতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিরিয়ে দেন। মাছ ধরতে গিয়ে খালি হাতে ফিরলে সঙ্গীকে অনায়াসে 'অপয়া' সাব্যস্ত করেন। নিজের দল হারলে খেলার মাঠ থেকে ফিরে কথা বন্ধ রাখেন ভিন্ন দলের সমর্থক কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে। শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-অনুরাগ-প্রীতি-স্নেহ-মমতা পোষণ করে এসেছেন চিরকাল। বড়ো গুণগ্রাহী ছিলেন। কতো বাঙালি শিল্পীকে বোম্বাই নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছেন। সহশিল্পীর প্রতি অপরিসীম মমতা ও মনোযোগ ছিল তাঁর। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের তখন উঠতি বয়স, কলকাতার এক জলসায় গাইতে গেছেন — শীতের রাত — ডায়াসে বসে গাইতে কষ্ট হবে ভেবে শচীনকর্তা তাঁর গায়ের দামি শাল ডায়াসের চাদরের উপর পেতে দিতে বলেন। এই গানের মানুষটি কখনো রাজনীতির ধারেকাছেও থাকেননি, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আজীবন ছিন্ন হয়নি। প্রগতিপন্থি সংস্কৃতিকর্মী ছিলেন তা বেশ বোঝা যায় যখন তথ্য মেলে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে একসময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৯-এ তিনি এর লোকসংগীত শাখার সভাপতি ছিলেন। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি বেড়েছিল। স্মৃতিকথায় কবুল করেছেন : 'আইপিটিএ-র সঙ্গে জড়িত থাকাকালে বুঝতে পারলাম, ভারতবর্ষের লোকসঙ্গীত কত বিচিত্র এবং বৃহৎ সঙ্গীতসম্পদে পুষ্ট' (*সরগমের নিখাদ* : ৬২)।

আট

কলকাতায় থাকতে কলের গানের রেকর্ডে শচীনকর্তা সফল ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রেও তাঁর গাওয়া গান সংগীতরসিকদের বেশ মনে ধরেছিল। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীত-পরিচালক হিসেবে তিনি কোনোভাবেই সুবিধা করে উঠতে পারেননি। এ-ক্ষেত্রে রাইচাঁদ বড়াল কিংবা পঙ্কজকুমার মল্লিকের কাছাকাছি পৌঁছানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফিল্মে তাঁর সুরসৃষ্টিতে দু'চারখানা ভালো গান হলেও তিনি কলকাতায় এই মাধ্যমে কেনো যে একেবারেই দাঁড়াতে পারেননি সে-রহস্যের কথা হয়তো বিষয়-অধিকারীরা ভালো জানবেন। অথচ তাঁর প্রতিভা ও প্রয়াসের তো কোনোই কমতি ছিল না! এই অসাফল্যের ফলেই কিছুটা অভিমান নিয়ে ভাগ্যের খোঁজে ১৯৪৪-এ বোম্বাই চলে যান। কলকাতার বাংলা ছবি মুখ ফিরিয়ে নিলেও বোম্বাইয়ের হিন্দি ছবির জগৎ তাঁকে সম্মান-সমাদর-অর্থ-যশ-প্রতিষ্ঠা উজাড় করে দিয়েছিল। বাংলা মুলুক থেকে গিয়ে অহিন্দিভাষী একজনের পক্ষে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোম্বাইয়ে জায়গা করে নেওয়া কিন্তু সহজ ছিল না। তখন বোম্বাইয়ের ফিল্মের জগতে নৌশাদ, ফিরোজ শাহ মিস্ত্রি, কেশব রাও ভোলে, হাফিজ, নাদিম শেরওয়ানি, ও.পি. নায়ার, অনিল বিশ্বাস, মদনমোহন — এঁদের সংগীত-পরিচালক হিসেবে কী দাপট তা সকলেরই জানা। কিন্তু মূলত 'ফিল্মিস্থান' ও 'নবকেতন' — এই দুটি প্রযোজনা-প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিল্মের গানের জগতে নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে হিন্দি গানের এক স্বতন্ত্র ফিল্মি-ঘরানা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এরই অনুষঙ্গে কখনো সুযোগমতো বাংলার লোকগানের সুরকেও মিশিয়ে দেন হিন্দি গানের সঙ্গে। পঙ্কজকুমার মল্লিকের একটি কথা এখানে স্মরণ করতে হয় — বলেছেন তিনি : 'ভারতীয় সঙ্গীত ও সিনেমাকে শচীন যা দিয়ে গেছে, তার পরিমাপ করা কঠিন। বিশেষত বোম্বাইকেন্দ্রিক হিন্দী চিত্রজগৎকে শচীন যে কী পরিমাণে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে গেছে তা বলার নয়' (*কুমার শচীন দেববর্মন জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ* : ১৫২)। মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা রায় (দত্ত) — এমন সব বাঙালি শিল্পীকে বোম্বাইয়ের ফিল্মের জগতে জায়গা করে দিতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। মান্না দে তো স্পষ্টই স্বীকার করেছেন : 'শচীনদার কাছে আমার ঋণ অসীম, শচীনদাই প্রথম আমায় ভাল গান গেয়ে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন' (*জীবনের জলসাঘরে* : ১৩৭)। তিন দশকেরও বেশি সময় প্রতাপের সঙ্গে এই বাঙালি সংগীত-পরিচালক বোম্বাইয়ের হিন্দি ফিল্মের জগৎ শাসন করেছেন। শচীন দেববর্মন — শচীনকর্তা, এখানে এসে রূপান্তরিত হন এস.ডি. বর্মন-এ। কিন্তু জন্মভূমির মাটি থেকে অনেক দূরে গিয়ে তাঁর এই দেশজোড়া খ্যাতি তাঁকে কতোটুকু তৃপ্তি-স্বস্তি-আনন্দ দিয়েছিল, তা যদি জানা যেতো!

বোম্বাইয়ে যাওয়ার পর বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ কমে আসে। বাংলা গানের চর্চা ও রেকর্ড প্রকাশের সুযোগও আর আগের মতো থাকেনি। তবে একটি ব্যাপার ঘটেছিল, সেটি উল্লেখ করার মতো। যে এইচএমভি সংগীতজীবনের সূচনাপর্বে শচীনকর্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই আবার ১৯৪৬-এ তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। এরপর এইচএমভি থেকে শচীনকর্তার বেশকিছু বাংলা ও হিন্দি গানের রেকর্ড বের হয়। শচীনকর্তা পাকাপাকি বোম্বাই চলে যাওয়ার ফলে বাংলা গানের যে কতো বড়ো ক্ষতি হয়ে গেলো, সে-কথা ভাবলে বাংলা গানের অনুরাগী শ্রোতার মন যে বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা সহজেই অনুমান করা চলে। এ-বিষয়ে তাঁর একটা বেদনা ও সেইসঙ্গে কিছুটা অপরাধবোধও অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁর অনুজ-সুহৃদ লেখক ও সংগীতপ্রেমী নারায়ণ চৌধুরীকে একবার একান্তে বলেছিলেন : 'ভাই নারান, তোমরা যে-শচীন 'কর্তা'কে ... জানতে, সেই শচীনকর্তার মৃত্যু ঘটেছে। বম্বের ছবির জগতে গিয়ে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা হয়েছে ঠিক, কিন্তু যে-কণ্ঠশিল্পী শচীনকর্তাকে নিয়ে তোমরা গর্ব করতে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না।' ... 'না না নারান, এ আমার মন-রাখা কথা নয়, একেবারে খাঁটি অন্তরের কথা। আজ যদি কেউ আমাকে কলকাতা থেকে প্রস্তাব করে পাঠাতো, 'তোমাকে পাঁচশো টাকা করে মাসোহারা দেব, তুমি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসো, আমি তম্মুহূর্তে বোম্বাইয়ের তল্পীতল্পা গুটিয়ে কলকাতা চলে আসতুম — আবার সেই পুরনো দিনের মত গানে গানে মেতে উঠতুম। গায়ক শচীন দেবের পাশে সিনেমার মিউজিক ডাইরেক্টর 'এস.ডি. বর্মন' কিছু নয়, কেউ নয়' (*ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও অন্যান্য* : ৪৯-৫০)। তবে তাঁর এই বোধোদয় ও আবেগ নিষ্ফলই থেকে গেছে।

নয়

'তিনি বাংলা গানের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন' — শচীনকর্তা সম্পর্কে আব্বাসউদ্দীনের এই সংক্ষিপ্ততম মন্তব্যের ভেতর দিয়েই বোঝা যায় যে তিনি কতো বড়ো মাপের শিল্পী ছিলেন। তাঁর গান শুনলে হারিয়ে যাওয়া একদা-স্নিগ্ধ সৌরভময় গ্রামের কথা মনে পড়ে যায় — কখনো দেশভাগের বেদনা কাঁটার মতো বেঁধে। যুগন্ধর এই শিল্পী মনেপ্রাণে ছিলেন বাঙালি — আপাদমস্তক ছিলেন 'বাঙাল'। তাই অনেক দূরের বর্ণিল ছটার বিভ্রম-জাগানো কোনো এক বেগানা শহরে বসেও স্বপ্ন দেখতেন তাঁর চিরকালের বাংলার। ফেলে আসা সেই হারানো বাংলার স্মৃতি তাঁকে দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকারে ব্যাকুল করে তুলতো — গানের ভেতর দিয়ে পৌঁছে যেতেন সেই উদার-শ্যামল স্মৃতিময় বাংলার বুকে :

সেই যে দিনগুলি
বাঁশী বাজানোর দিনগুলি
ভাটিয়ালির দিনগুলি
বাউলের দিনগুলি
আজও তারা পিছু ডাকে
কূলভাঙা গাঙের বাঁকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তালসুপারির ফাঁকে ফাঁকে
পিছু ডাকে পিছু ডাকে :
শুনি তাক্‌দুম তাক্‌দুম বাজে বাজে ভাঙা ঢোল!
ও মন যা ভুলে যা কী হারালি ভোল রে ব্যথা ভোল ॥
না না না তেমন তো ঢোল বাজে না,
গাজনে যে লাগতো নাচন মন তো তেমন নাচে না।
কই গেল সে ঢ্যাংকুড়কুড় ঢ্যাংকুড়কুড় বোল
কই গেল সে ড্যাংড্যা ড্যাডাং ড্যাংড্যা ড্যাডাং বোল॥
এই না পারে ঢোল বাজে রে ঐ পারে তার সাড়া,
মাঝখানে বয় থৈ থৈ থৈ নয়নজলের ধারা।
কই গেল সে গাঁয়ের মাটি কই সে মায়ের কোল
কই সে হাসি কই সে খেলা কই সে কলরোল॥
[*মোহিনী চৌধুরী বিরচিত*]

দশ

কুমিল্লা, কলকাতার পর শচীনকর্তার প্রায় সত্তর বছরের জীবনের শেষপর্ব কাটে বোম্বাইয়ে। বছর চল্লিশেক আগে সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় মোট আট কিস্তিতে (২ ফাল্গুন ১৩৭৬, ৯ ফাল্গুন ১৩৭৬, ১৬ ফাল্গুন ১৩৭৬, ২৩ ফাল্গুন ১৩৭৬, ৩০ ফাল্গুন ১৩৭৬, ৭ চৈত্র ১৩৭৬, ১৪ চৈত্র ১৩৭৬, ২১ চৈত্র ১৩৭৬) 'সরগমের নিখাদ' নামে ছোটো করে তার জীবনের এই তিনপর্বের কাহিনি শুনিয়েছেন। এই স্মৃতিকথা লেখার প্রণোদনা জুগিয়েছিলেন শচীনকর্তার কাছের মানুষ বোম্বাই-প্রবাসী সলিল ঘোষ — তারই উদ্‌যোগে পত্রিকায় তা ছাপা হয়। শচীনকর্তার স্মৃতিকথা ছাপার আগে সলিল ঘোষ এর ভূমিকা হিসেবে *দেশ*-এ (২৪ মাঘ ১৩৭৬) একটি লেখা লিখেছিলেন। শচীনকর্তার আলাপচারী গদ্যের এই অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ সহজেই পাঠকের চিত্তহরণ করেছিল। নানাজন *দেশ*-এর পাতায় চিঠিপত্র লিখে তাঁদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছিলেন, কখনো বা স্মৃতিবিভ্রমের ত্রুটিও কেউ কেউ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পত্রিকায় প্রকাশের ৪১ বছর পর *সরগমের নিখাদ* বই হয়ে বের হয় ঢাকার প্রথমা প্রকাশন থেকে।

এগারো

দেশ পত্রিকায় শচীন দেববর্মনের অসমাপ্ত আত্মকথার শেষ কিস্তি প্রকাশ পায় ২১ চৈত্র ১৩৭৬ (৪ এপ্রিল ১৯৭০)। এতে তিনি মোটামুটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৬৬ সাল পর্যন্ত স্মৃতিকথাকে টেনেছেন। *সরগমের নিখাদ* প্রকাশের পরেও তিনি সাড়ে পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। জীবনের সায়াহ্নবেলা যাকে বলা যায় — এই সময়কালেও তিনি সক্রিয় ছিলেন চলচ্চিত্রের সংগীত-পরিচালনায়। এই ক'বছরের কথা আমরা এখানে সংক্ষেপে পেশ করবো। ১৯৬৯-এ শক্তি সামন্তের *আরাধনা* ছবিতে সংগীত-পরিচালনা এবং সেইসঙ্গে কণ্ঠও দেন। এই সালেই তিনি *জ্যোতি* ও *তালাশ* নামে আরো দুটি হিন্দি ছবির সংগীত-পরিচালনা করেন। ১৯৬৯-এই ভারত সরকার তাঁকে *পদ্মশ্রী* সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৭০-এ *ইস্‌ক পর জোর নেঁহি* ও *প্রেমপূজারি* — এই দুটি ছবিতে সুর-যোজনা করেন। ১৯৭১-এ *গ্যাম্বলার, নয়া জমানা, শর্মিলী, তেরে মেরে স্বপ্নে*, ১৯৭২-এ *অনুরাগ, ইয়ে গুলিস্তাঁ হামারা, জিন্দেগি জিন্দেগি*রও সংগীত-পরিচালক ছিলেন তিনি। *জিন্দেগি জিন্দেগি* ছবিতে শচীন দেববর্মন 'জিন্দেগি ইয়ে জিন্দেগি' এবং 'পিয়া তুনে ক্যায়া কিয়ারে' — এই দুটি গানও গেয়েছেন। এই ছবির জন্যে শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালকের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। *অভিমান, ছুপা রুস্তম, জুগনু, ফাগুন* — ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি, যাতে তিনি সুরসৃষ্টি করেন। *অভিমান* ছবির জন্যে *ফিল্ম ফেয়ার* পুরস্কার পান। তাঁর ১৯৭৪-এর ছবির নাম *প্রেমনগর, উসপার* ও *সাগিনা*। ১৯৭৫-এ *চুপকে চুপকে* ও *মিলি* ছবির সংগীত-পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। তবে *মিলি* ছবির কাজ অসম্পূর্ণ থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরে পুত্র রাহুল দেববর্মনের ওপর এর কাজ শেষ করার দায়িত্ব বর্তায়। শচীনকর্তার মৃত্যুর পর ১৯৭৬-এ তাঁর সুরারোপিত ছবি *অর্জুন পণ্ডিত, বারুদ, দিওয়াঙ্গি* ও *ত্যাগ* — এই চারটি ছবি মুক্তি পায়। তাঁর সুর-করা হিন্দি ফিল্মের যেসব গান লোকের মুখে মুখে ফিরতো, তার তালিকা কম দীর্ঘ নয়। ফিল্মের জন্যে হিন্দি গান গাইলেও জীবনের এই শেষপর্বে তিনি কোনো বাংলা গানের রেকর্ড করেননি। তবে দীর্ঘ ২৫ বছর পর *চৈতালী* নামে শেষ বাংলা ছবির সংগীত-পরিচালনা করেন ১৯৭১-এ। কিন্তু মন্দভাগ্য, *চৈতালী*তেও শচীনকর্তা সংগীত-পরিচালক হিসেবে সফল হতে পারেননি।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জির *মিলি* ছবির সংগীত-পরিচালক ছিলেন শচীন দেববর্মন। গীত রচনা করেছিলেন যোগেশ। গান গেয়েছিলেন কিশোরকুমার ও লতা মুঙ্গেশকর। ১৯৭৫-এর মে মাসের দিকে স্টুডিওতে এই *মিলি* ছবির গান রেকর্ডিংয়ের সময় শচীনকর্তা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর আচ্ছন্ন অবস্থায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে কাটে তার কয়েক মাস। তাঁর জীবনের শেষপর্বের দিনগুলোর কথায় জানা যায় : 'মিলি'-র রেকর্ডিং চলাকালে প্যারালিটিক স্ট্রোক হয় শচীন দেববর্মনের। রেকর্ডিং শেষ করার দায়িত্ব নেন রাহুল। কিশোরকুমার যখন গাইছেন 'বড়ি সুনি সুনি হ্যায়', শচীনকর্তা তখন গভীর কোমায়। শুধু পঞ্চম [রাহুল দেববর্মন] নন, স্টুডিও-র সবাই কাজ করবে কী, কান্না চাপতে ব্যস্ত। তারপরেও বেঁচেছিলেন পাঁচ মাস। কোমায় আচ্ছন্ন শচীন দেবকে জাগাতে স্ত্রী মীরা ও পুত্র রাহুলের কত কাতরোক্তি। দুজনে মিলে প্রতিদিন তাঁকে শোনাতেন ত্রিপুরার গল্প, কুমিল্লার কথা, কলকাতার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নাম, হাজার হাজার টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা। একবারই নাকি চোখ একটু মেলেছিলেন শচীনকর্তা। ইষ্টবেঙ্গল যেদিন মোহনবাগানকে হারিয়ে দিল, সেদিন রাহুল চিৎকার করে খবরটা শুনিয়েছিলেন বাবাকে। ইষ্টবেঙ্গলের কট্টর সমর্থক, কাঠবাঙ্গাল রাজকুমার শেষবারের মত চোখ মেলেন। আর চোখ মেলেননি। ১৯৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর গানের রাজপুত্র, রাজ-রাজেশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমারবাহাদুর শচীন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন' (*শচীনকর্তার গানের ভুবন* : ১২৫)। এইভাবে বাংলা ও হিন্দি গানের এক অসামান্য শিল্পী ও সুরস্রষ্টার জীবনের অবসান হলো ৬৯ বছর বয়সে বাংলা মুলুক থেকে বহুদূরে বোম্বাইয়ে। শেষ হলো ধ্রুপদী শচীন-যুগের। শারীরিকভাবে শচীনকর্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও রয়ে গেলো তাঁর গান — যার আবেদন এখনো অক্ষুণ্ন — সেই সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়বে কাল থেকে কালান্তরে।

শচীনকর্তার মৃত্যুতে সংগীত ও চলচ্চিত্রজগতের অনেকেই শোক প্রকাশ করেছিলেন — তাঁকে স্মরণ করেন শ্রদ্ধায় — প্রীতিতে। তার আগেও তাঁর কৃতি-কীর্তি সম্পর্কে অনেকে মন্তব্য করেছেন। এঁদের মধ্যে তাঁর সংগীতগুরু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র, সুরেশ চক্রবর্তী, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার, দেব আনন্দসহ আরো অনেকের নাম করতে হয়। এঁদের স্মৃতিচারণের ভেতর দিয়ে শচীনকর্তার কৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সিদ্ধির অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। আশা ভোঁসলের মন্তব্য দিতে শেষ করি বাংলা ও হিন্দিগানের কালজয়ী শিল্পী ও সুরস্রষ্টা শচীনকর্তার স্মরণ-কথা : 'আর কোনদিনও দাদা [শচীন দেববর্মন] আমাকে গান শেখাবেন না — এ কথাটা যেন মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু তবুও এটা সত্য, ধ্রুব সত্য,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি নেই। আজ শুধু একটাই সান্ত্বনা, তিনি যে সুরের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন তা — মৃত্যুহীন। কোনদিনও স্তব্ধ হবে না সেই সুরস্পন্দন।'

গ্রন্থঋণ

১. শচীন দেববর্মন : *সরগমের নিখাদ*। আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত। ঢাকা, মাঘ ১৪১৭।

২. আব্বাসউদ্দীন আহমদ : *আমার শিল্পীজীবনের কথা*। কলকাতা, সৃষ্টি প্রকাশ সংস্করণ, বইমেলা ২০০১।

৩. হেমাঙ্গ বিশ্বাস : *গানের বাহিরানা*। কলকাতা, মাঘ ১৪০৪।

৪. শ্যামল চক্রবর্তী : *ভাটি গাঙ বাইয়া*। আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০১ (?)।

৫. মান্না দে : *জীবনের জলসাঘরে*। কলকাতা, থি-স : অক্টোবর ২০০৫।

৬. নারায়ণ চৌধুরী : *ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য*। কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৮৮।

৭. খগেশ দেববর্মন : *শচীনকর্তার গানের ভুবন*। কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৬।

৮. *কুমার শচীন দেববর্মন জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ*। ত্রিপুরা সরকার, অক্টোবর ২০০৬।

৯. *দেশ* : বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৫।

১০. সাপ্তাহিক *দেশ* : ১৬ পৌষ ১৩৮৯।

১১. *শারদীয় আনন্দ নিবেদন* [হিন্দুস্থান রেকর্ডের তালিকা পুস্তিকা] : অক্টোবর ১৯৩৬।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক ম লা ঝ রি য়া

স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোছায়ায়

কলের গানের কল্যাণে বিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা গানের যে স্বর্ণযুগ শুরু হয় তার মধ্যপর্বের এক অসামান্য সুরশিল্পীর নাম কমলা ঝরিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ — এই তিনটি দশক তিনি দাপটের সঙ্গে বাংলা গানের ভুবনে নিজেকে সক্রিয় রেখেছিলেন। শ্রোতার মনে সমীহ-জাগানো এই শিল্পীর অর্জন তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল — কিন্নরকণ্ঠী কমলা বাংলা গানের জগতে হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তির নায়িকা। একসময়ে যিনি খ্যাতি-যশ-প্রতিষ্ঠায় লোকনন্দিত শিল্পী ছিলেন, গান ছাড়ার পর দ্রুতই তিনি অন্তরালের বাসিন্দা হয়ে ওঠেন — অনেকখানিই বিস্মৃতির ধূসর জগতে আশ্রয় হয় তাঁর। 'আমায় নহে গো — ভালবাস শুধু ভালবাস মোর গান।/ বনের পাখীরে কে চিনে রাখে গান হ'লে অবসান' — নজরুলের এই গানের কথা কমলা ঝরিয়ার জীবনে যেন অনেকখানিই সত্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যু হয় ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৯। *দেশ* পত্রিকায় (৫ জানুয়ারি ১৯৮০) তাঁর স্মরণে প্রকাশিত একটি ছোটো লেখায় কিছুটা খেদের সঙ্গেই বলা হয় : 'পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু — তবু এই সংবাদ প্রচারিত হবার পরও এযুগের কোনো শিল্পী অথবা কোনো সংগীতসংস্থা প্রয়াত শিল্পীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলিও নিবেদন করতে আসেন নি — তা যেমনই বিস্ময়কর তেমনই বেদনাদায়ক। ব্যতিক্রম মেগাফোন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এবং গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবৃন্দ, যাঁদের সহায়তায় শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।'

দুই

কমলা ঝরিয়া জন্মেছিলেন বাংলা মুলুকের বাইরে বিহারের ঝরিয়ায়। রুক্ষ মাটির ঝরিয়া কয়লাখনির অঞ্চল হিসেবে বিখ্যাত। আগে বিহার রাজ্যের অন্তর্গত থাকলেও এখন ঝরিয়া বিহার ভেঙে জন্ম নেওয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঝাড়খন্দ্ রাজ্যের শামিল — ধানবাদ জেলার একটি মহকুমা হিসেবে। কমলার জন্ম ১৯০৬ সালে। তাঁর বংশ-পদবি 'সিং'। পিতা ঠিকেদারি ব্যবসা করে বেশ পসার করেছিলেন। সে-হিসেবে সিং-পরিবারকে মোটামুটি সচ্ছলই বলা যায়। ঝরিয়ার রাজবাড়ির খুব কাছাকাছিই থাকতেন কমলারা। ঝরিয়ার রাজারাও 'সিং' পদবিধারী — দূর-আত্মীয়তার একটি সম্পর্কও নাকি ছিল। হয়তো এই কারণেই রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁদের একটি সহজ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। অবশ্য তাঁর পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে অন্য কথাও শোনা যায়। কবি-কথাশিল্পী গোলাম কুদ্দুস প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী কে. মল্লিকের একটি জীবনী-উপন্যাস লেখেন *সুরের আগুন* (১৯৬১) নামে। লেখক এখানে কমলার মাকে 'বাজারের' মেয়েলোক ও তাঁর মাসিকে অন্যের 'রক্ষিতা' বলে গল্পচ্ছলে উল্লেখ করেছেন। এই বিবরণ গল্পের খাতিরে, না বাস্তব তথ্যের প্রতিফলন — তার সত্যাসত্য যাচাই আজ আর সম্ভব নয়। অবশ্য মনে রাখা দরকার, সেকালে অবিদ্যা-পাড়া থেকেই তো সংগীত ও থিয়েটারের অসাধারণ প্রতিভাময়ী শিল্পীরা সব আসতেন।

যাই হোক আগের কথায় আবার ফিরে আসি। ঝরিয়ার রাজা গানবাজনার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর দরবারে গানের কদর ছিল। সেকালের নামী শিল্পী কে. মল্লিক প্রায় আট-নয় বছর ঝরিয়ার রাজার সভা-গায়ক ছিলেন (*বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা* : ৪১)। এই কে. মল্লিকই কমলা ঝরিয়ার প্রথম গানের গুরু। একেবারে শিশু-বয়সেই গানের আসরে এসে বসতেন কমলা। গানের প্রতি তাঁর এই ঝোঁক দেখে রাজা তাঁকে কে. মল্লিকের কাছে গান শেখার সুযোগ করে দেন — তখন তাঁর বয়স নয়-দশের বেশি নয়। কে. মল্লিক কমলার গানের ঝোঁক আরো উসকে দেন — তাঁর হাতেই কমলার গানের ভিত রচিত হয়। এরপর তিনি ঝরিয়ার রাজদরবারের আর-এক সংগীতগুণী শ্রীনাথ দাসনন্দীর হাওলায় উচ্চাঙ্গসংগীত শিখতে শুরু করেন। গানের প্রতি কমলার একান্ত অনুরাগ ও তাঁর সংগীত-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তা আরো বিকশিত করার লক্ষ্যে কে. মল্লিক তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বেতার ও গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। কমলার জীবনের মোড় ঘুরে যায় এই ঘটনায়। তিনি প্রথম গান রেকর্ড করেন হিজ মাস্টার্স ভয়েসে। 'প্রিয় যেন প্রেম ভুল না' ও 'নিঠুর নয়ন-বাণ কেন হান' — এই গান দুটি নিয়ে তাঁর প্রথম রেকর্ড বের হয় শারদীয়া পূজা উপলক্ষে সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ। কলের গানের ভুবনে তাঁর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়ে যায়। তাঁর অনুপম গায়কির বৈশিষ্ট্যে গানের বাজার মাত করেন। অবশ্য এই কাজ খুব সহজ ছিল না। কেননা তখন গানের জগতে ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, আশ্চর্য্যময়ী, হরিমতীদের রাজত্ব। গহরজানের গানের রেশ তখনও সংগীতরসিক মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর নামের পদবি নিয়ে ভারি মজার এক গল্প চালু আছে। জানা যায় : 'প্রথম রেকর্ড প্রকাশের সময় কর্তৃপক্ষ তাঁর পদবী জানতেন না তাই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত কাজী নজরুল ইসলাম, তুলসী লাহিড়ী এবং ধীরেন দাসের সিদ্ধান্ত অনুসারে রেকর্ডের লেবেলে তাঁর নামের পাশে পদবীস্থলে বাসস্থান (ঝরিয়া)-এর নাম যুক্ত করে দেন — সেই থেকেই তিনি — মিস্ কমলা ঝরিয়া' (*দেশ*, ৫ জানুয়ারি ১৯৮০)। গল্পটি কতোটুকু সত্যি তা হলফ করে বলা মুশকিল। কমলা ঝরিয়া যখন গ্রামোফোন রেকর্ডে গান দিতে আসেন, তখন রেকর্ড-সংগীতের জগতে বেশ কয়েকজন 'কমলা'র অস্তিত্ব ছিল — কমলা দেবী (হাজরা), কমলা ভট্টাচার্য, কমলা দেবী, কমলা পট্টধর, কমলা চট্টোপাধ্যায়। তাই পরিচয়ের পার্থক্য বোঝানোর জন্যে পদবির উল্লেখের প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, তবে ওপরের কাহিনিতে কিছুটা অসংগতিও নজরে আসে। কোনো শিল্পী গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান রেকর্ড করবেন, আর তাঁর নাম-ঠিকানা ও রেকর্ডিং বিবরণ রেজিস্ট্রারে লেখা থাকবে না, চুক্তি হবে না, এমন ঘটনা অবিশ্বাস্য — বিশেষ করে এইচএমভি-র মতো সাহেব-কোম্পানির ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি উঠতেই পারে।

তিন

কমলা ঝরিয়ার গানের জীবনে বেশ কয়েকজন সংগীতগুণীর বড়ো ভূমিকা আছে, এঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় কে. মল্লিক, ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ, কাজী নজরুল ইসলাম ও তুলসী লাহিড়ীর। কমলার সংগীতজীবনের উন্মেষ ও আত্মপ্রকাশের পর্বে কে. মল্লিক যে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে-কথা আগেই বলেছি। ঝরিয়ার রাজদরবারের সভাগায়ক শ্রীনাথ দাসনন্দীর কাছে কমলার উচ্চাঙ্গসংগীতে যে হাতেখড়ি, তা পূর্ণতা পায় ওস্তাদ উজির খাঁ ও ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর কল্যাণে। গ্রামোফোন কোম্পানির প্রশিক্ষক হিসেবে জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে গান শিখে রেকর্ডও করেছেন কমলা। তাঁর কথা একটু আলাদা করে বলতে হয়।

রেওয়াজে বড়ো নিষ্ঠা ছিল কমলার। তাই পেয়েছিলেন একটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিখুঁত রেওয়াজি গলা। নিজেই বলেছেন তিনি : '... আমাদের সময়ে ট্রেনিং অত্যন্ত কড়া ছিল। সে রকম গুরু এখন আর দেখলাম না। যেমন শাসন করতেন তেমনি যত্ন করে শেখাতেন। এখন যেন কোন রকমে গান করাটাই বড় হয়ে উঠেছে — ভালো করে গান শেখাটা নয়...।' কমলার সৌভাগ্য তিনি পেয়েছিলেন ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর মতো গানের গুরু। খাঁ সাহেবও মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিময়ী তাঁর এই প্রিয় শিষ্যাকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর গানের ঝুলি। আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ মন্তব্য করেছেন : 'আঙ্গুর, ইন্দু, ঝরিয়া এঁরা তো ওঁরই [জমিরুদ্দীন খাঁ] সুরের দৌলতে এত বড় নাম-করা গাইয়ে বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন' (*আমার শিল্পী জীবনের কথা* : ৫৬)। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় এইচএমভি-তে জমিরুদ্দীন খাঁর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের একটি সরস বিবরণ দিয়েছেন :

> চিৎপুরের গরানহাটা এলাকায় ট্রামলাইনের ধারে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সালের বাড়ি ছিল বিষ্ণুভবনে, সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পরিতোষ শীল, ঢুকেই শুনি বামাকণ্ঠের গান হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখি যিনি গাইছেন তিনি হলেন কমলা ঝরিয়া আর এক সৌম্যকান্তি পুরুষ বসে বসে শুনছেন, পাশে বোতল-টোতলও রয়েছে। পরে জেনেছিলাম, না খেয়ে জমিরুদ্দীন খাঁ সাহেব গাইতে পারতেন না। ('শিবাসিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রেকর্ডের গান' প্রবন্ধে উদ্ধৃত : সাপ্তাহিক *দেশ*, ২৩ মে ১৯৯২)।

নজরুলের সান্নিধ্য ও শিক্ষাও কমলাকে সমৃদ্ধ করেছে। নজরুলের কাছে কমলার সংগীত-ঋণ কম নয়। সেসব কথা তিনি কখনো-সখনো স্বীকারও করেছেন। তবে কমলার সংগীত-সতীর্থরা নানাভাবে তার উল্লেখ করেছেন। আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ জানিয়েছেন : 'কাজিদা তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য গান লিখে চলেছেন। আঙুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতি, কানন দেবী, কমলা ঝরিয়া, ধীরেন দাস, কমল দাশগুপ্ত, মৃণালকান্তি ঘোষ সবাই তাঁর গানের জন্য 'কিউ' লাগিয়ে বসে থাকে' (*আমার শিল্পী জীবনের কথা* : ৪৯)। আঙ্গুরবালাও উল্লেখ করেছেন : 'ওনার [নজরুল] রচিত ও সুরারোপিত গান উনি নিজেই শেখাতেন। পরিচয়ের পর আমি নিয়মিত ওনার কাছে শিখতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গে ইন্দুবালা ও কমলা ঝরিয়াও শিখত। প্রত্যেকের জন্যে পৃথক সময় নির্দিষ্ট ছিল' (*বাংলার বুলবুল আঙ্গুরবালা* : ৪৫)। কিন্তু বেশিদিন এই সম্পর্ক বজায় থাকেনি — তুলসী লাহিড়ীর কারণে তা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিন্ন হয়। নজরুলের যে-কটি গান তিনি রেকর্ড করেন তার মধ্যে গোটা দশেক গানের হদিস পাওয়া গেছে — (১. 'পরদেশী বঁধু ঘুম ভাঙ্গায়ো চুমি' : জুন ১৯৩২, ২. 'সেই কথারই জানাজানি' : জুলাই ১৯৩২, ৩. 'রুম ঝুম বাদল আজি বরষে' : আগস্ট ১৯৩২, ৪. 'মন লহ নিতি নাম রাধাশ্যাম' : ডিসেম্বর ১৯৩২, ৫. 'তোমার সৃষ্টি মাঝে হরি' : ডিসেম্বর ১৯৩২, ৬. 'কাহারই তরে কেন ডাকে' : ১৯৩৩, ৭. 'হোরি খেলে নন্দলালা' : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪, ৮. 'কেন করুণ সুরে হৃদয়পুরে' : জুন ১৯৩২, ৯. 'হরি, নাচত নন্দদুলাল' : সেপ্টেম্বর ১৯৩৩, ১০. 'জাগো তন্দ্রামগ্ন জাগো ভাগ্যহত' : ১৯৩৫)। শেষ তিনটি যথাক্রমে 'সাবিত্রী', 'মীরাবাঈ' ও 'প্রতাপাদিত্য' রেকর্ড-নাট্যের গান। নজরুলের গান গেয়ে বেশ নামও করেন তিনি। একবার একজন তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন নজরুলের সুরে গান গাওয়ার বিষয়ে। জবাবে তিনি বলেছিলেন : 'তা গেয়েছি, তবে গোড়ার জীবনে। পরে লাহিড়ী মশাই আমাকে আলাদা করে তালিম দিয়েছেন, কত কী শিখিয়েছেন! পরে তো আমি বেশিরভাগ ওঁর গানই গেয়েছি। তবে কাজীদার দানও ভুলবো না। কত বড়ো মানুষ, কত অফুরন্ত ওঁর গানের ভাণ্ডার। কথায় কথায় মুখে মুখে গান বাঁধতে পারতেন, এমন ক্ষমতা' (*স্মৃতি সত্তা নাট্য* : ১৮৫)। এইচএমভি থেকে বেরিয়ে এসে যখন এঁরা মেগাফোন কোম্পানিতে আবার এক ছাদের তলায় এলেন, তখনও তুলসী লাহিড়ী কমলাকে নজরুলের কাছে ভিড়তে দেননি, সবসময়ই তাঁর কব্জায় রেখেছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর সুরে তাঁর লেখা গানই কমলাকে গাইতে হতো। অথচ কমলা যদি ইন্দুবালা-আঙ্গুরবালা কিংবা যূথিকা রায়ের মতো স্বাধীনভাবে নজরুলের আরো কিছু গান করতেন, প্রশিক্ষণ নিতেন, তাঁর সুরে রেকর্ড করতেন — তাহলে হয়তো তাঁর শিল্পীজীবনে আরেকটু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা যুক্ত হতে পারতো।

তুলসী লাহিড়ীর ভূমিকার কথা না বললে কমলা ঝরিয়ার জীবনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ঝরিয়া থেকে কলকাতায় আসার দু-এক বছরের মধ্যেই কমলার জীবন গেঁথে যায় তুলসী লাহিড়ীর সঙ্গে। তিনি হয়ে ওঠেন কমলার 'কর্তা' এবং সেই সুবাদে অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক। এর ফলাফল কমলার জন্যে মোটের ওপর ভালোই হয়েছিল — বেতার, গ্রামোফোন, মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে তিনি যে যুক্ত হতে পেরেছিলেন তার মূলেও ছিলেন তুলসী লাহিড়ী। কমলার ব্যক্তি ও শিল্পীজীবনে তুলসী লাহিড়ীর প্রভাব ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের গভীরতা কতোটুকু সে-বিষয়টি জানা বিশেষ জরুরি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চার

ঝরিয়া থেকে কলকাতায় গ্রামোফোনে গান দিতে এসে তুলসী লাহিড়ীর সঙ্গে কমলার পরিচয়। সেই পরিচয় ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে তুলসী লাহিড়ী দ্বিতীয় স্ত্রী শান্তিলতা এবং চার পুত্র ও দুই কন্যাকে ছেড়ে কমলার সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। দুজনের এই সম্পর্ক তুলসী লাহিড়ীর পরিবার মেনে নেন — মেনে নিতে বাধ্য হন — প্রকাশ্যে তাঁরা কখনো এই নিয়ে কোনো অভিযোগ তোলেননি। এদিকে-ওদিকে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত লাহিড়ী-পরিবারের ঠাঁই হয় কলকাতার ৩৬ কৃষ্ণপুর রোডের এক বস্তির খোলার ঘরে — দুঃখ-দারিদ্র্য আর অবহেলায় তাঁদের জীবন কাটতে থাকে। অপরদিকে তুলসী লাহিড়ী কমলাকে নিয়ে নানা ভাড়াবাড়িতে থাকার পর শেষে তাঁকে কলকাতার ১৫৮/সি রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের একেবারে সদর রাস্তার পাশে একটি বেশ বড়োসড়ো তিনতলা বাড়ি কিনে দেন। ঝরিয়া থেকে কমলার এক ভাই এসে সপরিবার এই বাড়িতে ওঠেন। এখন এখানে বাস করেন কমলার ভাইঝি মীরা সিং ও তাঁর কন্যা দেবযানী কুণ্ডু। এই বাড়িতেই কমলা ঝরিয়া সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের জন্যে ২০০২-এর ২৪ আগস্ট শনিবার বিকেল চারটের দিকে গিয়ে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। আমার সঙ্গে ছিলেন লাহিড়ী-পরিবারের ঘনিষ্ঠ ও কলকাতায় তুলসী লাহিড়ীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের মূল উদ্‌যোক্তা ডক্টর শুভ জোয়ারদার।

এই বাড়ির নিচতলার সামনের অংশে কয়েকটি ভাড়ার দোকান। এর দোতলায় মীরা সিং তাঁর আত্মীয়স্বজন নিয়ে বাস করেন। সদর দরজায় ঝুলছে একটি লেটার-বক্স — তাতে ইংরেজিতে লেখা : 'কুণ্ডু, সিং অ্যান্ড আদার্স/ ১৫৮-সি, আর. বি. অ্যাভেনিউ, ক্যালকাটা-২৯/ দেবযানী এন্টারপ্রাইজেস্ / কে.পি. কুণ্ডু, এলএলবি (অ্যাডভোকেট)/ দেবযানী সিং (অ্যাডভোকেট) বি.কম. (অনার্স) এলএলবি'। এই বাড়িতে পৌঁছে খবর দিলে বেশ কিছুক্ষণ পর এক মহিলা দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট তড়িঘড়ি কথা বলেন। প্রথমে তিনি মীরা সিংয়ের আত্মীয় এবং পরে ইতস্তত করে মেয়ে বলে জানান। তাঁর নাম বলেন দেবযানী কুণ্ডু এবং নিজেকে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে পরিচয় দেন। আমরা কমলা ঝরিয়া সম্পর্কে মীরা সিংয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে হঠাৎই তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, মীরা সিংয়ের বয়স সত্তরের ওপরে — অসুস্থ, তিনি কারো সঙ্গে দেখা বা কথা বলেন না। আরো জানালেন, কমলা ঝরিয়া সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানেন না —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগ্রহীও নন — এ-বিষয়ে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না। কমলার কোনো ছবি বা স্মৃতিচিহ্ন আছে কি না জানতে চাইলে দেবযানী সাফ জবাব দেন — কিছুই নেই। এই বাড়িটির মালিক কে — এই কথা জিজ্ঞেস করায় তাঁকে প্রথমে কিছুটা বিচলিত দেখায়, তারপর বিষয়টি এড়িয়ে যান। বাড়িটির ছবি তুলতে চাইলে কড়া নিষেধ জারি করে তাঁর জরুরি কাজ আছে বলে ঘরে ঢুকে পড়েন। আমরা হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসি।

আমার সঙ্গী শুভ জোয়ারদার জানালেন, এই বাড়ির দখলদারদের এই আচরণ নতুন কিছু নয়। ১৯৮৫ সালের দিকে তুলসী লাহিড়ীর ছেলে দীনেন্দ্রচন্দ্র (হাবু লাহিড়ী) তাঁকে নিয়ে বাবার সম্পর্কে লেখালেখির প্রয়োজনে কিছু কাগজপত্র ও বইপুস্তকের জন্যে এই বাড়িতে আসেন। কিন্তু তখনও মীরা সিংয়ের আত্মীয়স্বজন হাবু লাহিড়ীকে সহায়তা করা তো দূরে থাক, তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে না দিয়ে রীতিমতো অপমান করে তাড়িয়ে দেন। মীরা সিং ও তাঁর স্বজনদের হয়তো আশঙ্কা জন্মেছিল, হাবু লাহিড়ী বাড়ির মালিকানা দাবি করতে পারেন এবং সেইজন্যে তথ্য সংগ্রহের নামে কৌশলে বাড়ির কাগজপত্র হাতাতে এসেছেন। কিন্তু সংসারনির্লিপ্ত সজ্জন-ভদ্র-বিনয়ী চিরকুমার হাবু লাহিড়ীর পিতার প্রতি সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন ছাড়া এই ধরনের কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না।

দুঃখ হয় এই ভেবে যে, যে কমলা ঝরিয়ার সুবাদে ও তুলসী লাহিড়ীর অনুগ্রহে মীরা সিং ও তাঁর আত্মীয়বর্গ এই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তাঁরা তুলসী ও কমলার সঙ্গে এই বাড়ির সম্পর্কই একরকম অস্বীকার করতে চান। কমলা-তুলসীর আশ্রিত এই পরিবারটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাড়িটি দখল করেই ক্ষান্ত হননি, সেইসঙ্গে তাঁদের সব স্মৃতিচিহ্নও একে একে মুছে ফেলতে শুরু করেছেন।

পাঁচ

তুলসী লাহিড়ী ও কমলা ঝরিয়া সমাজ-সম্পর্কের বাইরে এক কীর্তিময় শিল্পের সংসার গড়ে তুলেছিলেন। তিরিশের যুগের প্রায় গোড়া থেকেই যে সম্পর্কের সূচনা তা তুলসী লাহিড়ীর মৃত্যুকাল অর্থাৎ ১৯৫৯ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল। কমলার শিল্পী ও ব্যক্তিজীবনেও এই গুণী মানুষটি ছায়ার মতো ছিলেন। কমলারও তাঁর প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা। শুভ জোয়ারদার হাবু লাহিড়ীর কাছ থেকে জেনেছিলেন, কমলা-তুলসী লাহিড়ীর একসঙ্গে বাস করা নিয়ে [illegible] প্রতিক্রিয়া ও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্যাসাদও দেখা দিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশীদের কেউ রংপুরে তুলসী লাহিড়ীর পিতা সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীকে জঘন্য ভাষায় চিঠি লিখে জানান : 'আপনার পুত্র একটি বাজারের রাঁড় নিয়ে একসঙ্গে থেকে যা কাণ্ড করছে তা চোখে দেখা যায় না। এতে করে পাড়ায় ভদ্রলোকের বাস করা দায় হয়ে যাচ্ছে।' এই ধরনের চিঠি পেয়েও সুরেন্দ্রনাথ বিচলিত হননি। সতর্ক করার জন্যে চিঠিটি তিনি শুধু পুত্রকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন।

ঘটনা শুধু এখানেই থেমে থাকেনি — তা অচিরেই সহিংস রূপ নেয়। ফলে ১৯৩৬ সালের দিকে কলকাতার চিৎপুরে হিজ মাস্টার্স ভয়েস্-এর যে রিহার্সেল-বাড়ি বিষ্ণু-ভবন — তার সামনেই ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে তুলসী লাহিড়ীকে লাঞ্ছিত হতে হয়। এর পেছনে সেই সময়ের সংস্কৃতিজগতের ঈর্ষাকাতর কারো কারো ইন্ধন ছিল। এই ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা ও আরো কেউ কেউ। তুলসী লাহিড়ীর ছেলে দীনেন্দ্রচন্দ্র ওরফে হাবু লাহিড়ী এ-বিষয়ে বলেছেন : 'কমলা ঝরিয়ার লেবেলটা তারা তুলসীবাবুর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল' (*শব্দ শাব্দিক* : ২৫)। সামাজিক নিন্দা-সমালোচনা, পারিবারিক অশান্তি-অস্বস্তি, দৈহিক লাঞ্ছনা ও মানসিক পীড়ন সত্ত্বেও তুলসী লাহিড়ীর কাছ থেকে কমলাকে কেউ দূরে সরিয়ে নিতে পারেনি।

তুলসী লাহিড়ীর সঙ্গে কমলার যে গাঢ় ও গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় নানা সূত্রে নানা ঘটনায় পাওয়া যায়। তুলসীকে লেখা কমলার একটি তারিখবিহীন অপ্রকাশিত চিঠি শুভ জোয়ারদারের সৌজন্যে আমাদের হাতে এসেছে। অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে বলা যায়, চিঠিটি ১৯৩৬ সালের পরে কোনো একসময়ে লেখা। শীর্ষে 'শ্রী শ্রী হরি', সম্বোধনে 'শ্রীচরণেষু' আর শেষে পত্র-প্রেরকের নামের জায়গায় লেখা আছে 'বাবু'। সবুজ কালিতে লেখা চিঠিটি বিবর্ণ, হস্তাক্ষর অস্পষ্ট, বানান ভুল ও বিরামচিহ্নের বালাই নেই — অবিকল সেইভাবেই চিঠির বয়ান এখানে পেশ করা হলো :

শ্রীচরণেষু–

পরসু তোমার চিঠি পেয়েছি আমার সেই জে [...] সর্দ্দি হয়েছিল তার রেশ এখন আছে দিনজ সিরলিন বন্দ রেখে অর্জ্জুন গাছের ছালের রস ও চুনের জল সকালে খাওয়াতে একেবারে নাক মুখে খুব পাকা পাকা সর্দ্দি বেরুছে তায় অন্য দিক সরির সামান্যই ভাল বোদ করছি জয়ার মার লোকটা নিজের নামে ১টা চিঠি দিয়েছে লিখেছে কাজকর্ম্ম একেবারে বন্দ মে মাস থেকে ভাড়া দিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারব না ইত্তাদি জেমন লিখতে হয় মা বল্লে ও চিঠির উত্তর দিয়ে দরকার নাই কারণ আমি ওকে জানিনা জয়ার মা যদি লেখে তখন তার বেবস্তা করা জাবে জিতেনবাবু এখনও চিঠি বা হিসাব কিছু পাঠায় নাই দিন কয়েক দেখে আবার লিখব বোস চিঠি লিখেছিল তাকে চিঠি দিয়েছিল কিনা না দিয়ে থাকলে অন্তত ১খানা চিঠি দিয়ে দিও জে আমার দারা হবে না জিতেনবাবু চেক পাঠালে আমি ঝরিয়া যাব এখন নয় [...] এসরাজ কি কত দুর হোল পেটের বেথা কেমন খাওয়ার দিকে খুব লখ্য রাখবে লোভ করে মাছ বেসী খাবেনা আমার ত আর এ দেসী রান্না বা তরিতরকারি কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না বেলা ১০ টা থেকে ৪ পর্য্যন্ত ভিসণ গরম ও গরম হাওয়া ঘর থেকে বেরুন জায়না বাকি টাইম বেস্ ঠাণ্ডা অন্য সমস্ত দিক ঠাকুর সইয়ে দিছেন একটা বিসয়ে ঠাকুর কি করবেন তীনিই জানেন [...] আর কি আমি গাইতে পারব দিনরাত জয়া নিয়ে ১ ১ কারণে সঙ্গে চেঁচান বকা আর না চেঁচিওয় কোন মতে থাকা জায়না তারপর রেওয়াজ নাই মা স্বরসতী জানেন কি থাকবে কি জাবে বাবু আর কত দিন বোনে বনমানুসী সেজে থাকবো সবসময় মনে হছে ঠাকুর হয় মিটিয়ে দাও না হয় এই ঝড় পার করে দাও দুয়ের এক হলে নীশ্চীন্ত হই [...] চবনপ্রাস খেয়ে মুখের রং কিছু ইম্প্রুভ মনে হছে পায়ে কিছু উন্নতী হয় নাই আমার মনে হছে কলকাতা চলে জাই কত লোক ত আছে তেমনী আমিও থাকবো অন্য কিছুর জন্য নয় সুধু এইজন্য জে ওখানে রেওয়াজটা হবে সমস্ত লিখলাম যদি বল এখানে রেওয়াজ কর এখানে কোন মতে ওই জিনীসের রেওয়াজ হতে পারেনা এইভাবে থাকলে নিরিবিলি একটা হোত আমি জদি বাইরে চেঞ্জের মত থাকতাম তাহলে সম্ভব হোত জা করেন মা স্বরসতী তারি দেওয়া তিনি রক্ষা করবেন আর কি করবো প্রণাম লিখি আর সমস্ত খবর ভাল

ইতি
বাবু

এইমাত্র জিতেনবাবুর ষ্টেটমেন্ট ও চেক পেলাম [...] কয়েক টাকা মাত্র

কমলা ঝরিয়ার এই চিঠিটি তাঁর শিল্পীজীবনের এক সংকটময় সময়ের বিশ্বস্ত দলিলও। বিশেষ কোনো কারণে এইসময়ে কিছুকালের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য তাঁকে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও থাকতে হয়। চিঠি থেকে বেশ বোঝা যায় তিনি এইচএমভি ছেড়ে মেগাফোন কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। তাই মেগাফোনের মালিক জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন। সচেতন ও নিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন বলে কণ্ঠের যত্ন ও রেওয়াজের প্রয়োজন তিনি খুব বেশি করে অনুভব করেছেন। কিন্তু যেখানে ছিলেন সেখানে রেওয়াজের কোনো পরিবেশ ছিল না। তাই তুলসী লাহিড়ীর কাছে আরজি পেশ করেছেন কলকাতায় যাওয়ার জন্যে। 'বাবু'র সমীপে লেখা এই চিঠিতে কিছু হতাশা, উৎকণ্ঠা ও অভিমানও প্রকাশ পেয়েছে।

কমলা ঝরিয়া ও তুলসী লাহিড়ীর অন্তরঙ্গতা যে কতোখানি গভীর ছিল সে-সম্পর্কে পুত্র হাবু লাহিড়ী খোলামেলা মন্তব্যে জানিয়েছেন : 'কমলা ঝরিয়ার সঙ্গে তাঁর [তুলসী লাহিড়ী] স্বামী-স্ত্রীর থেকেও বেশী সম্পর্ক ছিল। তখনকার দিনে প্রত্যেক গুণী শিল্পীর এ ধরনের গাইয়ে মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক থাকত। নইলে সঙ্গীত জগতের competition-এ অনেক সময় আর্থিক লোক্‌সানের সামনে পড়তে হত' (*শব্দ শাব্দিক :* ২৫)।

কমলা আজীবন তাঁর 'বাবু' তুলসী লাহিড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসেছেন। তিনি যা 'হয়ে উঠেছিলেন', তার পেছনে তাঁর 'বাবু'র অবদানের কথা পাঁচ মুখে বলেছেন। শ্যামল ঘোষের বর্ণনায় জানা যায় :

> কমলা ঝরিয়ার বাড়ি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের উপর। বেশ বড়ো তিনতলা বাড়ি। ঝকঝক তকতক করছে।...
>
> শুনেছি এ বাড়ি তাঁকে বানিয়ে দিয়েছিলেন তুলসী লাহিড়ী মশাই। তিনি খুবই গুণী মানুষ ছিলেন। নট-নাট্যকার-চিত্রপরিচালক-সংগীতজ্ঞ নানান গুণের ভাণ্ডারী। কমলা ঝরিয়া একসময়ে অনেক গান তুলসী লাহিড়ী মশাইয়ের কথায়-সুরে রেকর্ড করেছিলেন। তুলসীবাবুর কাছে অনেক তালিম পেয়েছেন তিনি। ঝরিয়ার কয়লা খাদানের অন্ধকার থেকে উঠে আসা এই হিরের টুকরোটিকে, বলা যায় তুলসীবাবুই আবিষ্কার করেছিলেন। তাতে সযত্নে কাটিংপালিশ লাগিয়ে তিনি জেল্লা ফিরিয়েছিলেন। 'ওর কাছে আমার দেনার কোনো শেষ নেই।' তুলসীবাবু সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে এ কথাই বলেছিলেন কমলা ঝরিয়া।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

... ওঁর কথা থেকে বুঝেছি, তুলসীবাবুর ওপর তিনি বড়োই নির্ভরশীল ছিলেন।

'আমি আর কী বলবো বাবা, কী জানি আমি? উনি যেমন তৈরি করেছেন সেই রকমই হয়েছি।... আমার যা কিছু দেখছো সব ওঁরই দান, ওঁরই দয়া।" (*স্মৃতি সত্তা নাট্য* : ১৮৪)।

১৯৫৯-এর ২২ জুন তুলসী লাহিড়ীর জীবনাবসান হয় কমলা ঝরিয়ার রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের বাড়িতেই। দীর্ঘকালের সঙ্গী ও অভিভাবককে হারিয়ে কমলা শোকে কাতর হয়ে পড়েন। কাছের মানুষ ইন্দুবালা তাঁর ২৩ জুন তারিখের ডায়েরিতে লিখেছেন : 'আজকের পত্রিকায় তুলসী লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদে বড়ই ব্যাথা পেলাম, তিনি আমার বাবু ছিলেন, কত লোকের কাছেই না আমার গানের নিন্দা করতেন। (ঝরিয়া) কমলার আজ বড় মনকষ্ট।' তুলসী লাহিড়ীর মৃত্যুর পর কমলা গানের জগৎ থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নেন। অনেকটাই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন তিনি, বাইরের যোগাযোগও কমে আসে। এরপর তাঁর আর কোনো নতুন রেকর্ড বের হয়েছে বলে জানা যায় না। মৃত্যুর বছর তিনেক আগে শেষ বড়ো কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যখন গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে তাঁকে 'গোল্ডেন ডিস্‌ক' দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

ছয়

সংগীতের জগতে কমলা ঝরিয়া — গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার, থিয়েটার, রাজদরবার, সংগীতবাসর — নানা মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন। এমনকি চলচ্চিত্রও বাদ যায়নি। অবশ্য চলচ্চিত্রে অভিনয়ের চাইতে গানের অংশই প্রধান ছিল।

যতো আঙ্গিকে — যতো ভাষায় কমলা গান করেছেন — তাঁর এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সঙ্গে আর কোনো শিল্পীর তুলনা হতে পারে না। এইচএমভি-র 'গোল্ডেন ডিস্‌ক' সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকপত্রে (৬ এপ্রিল ১৯৭৬) কমলা ঝরিয়া সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়, শিল্পী হিসেবে তা তাঁর চুম্বক-মূল্যায়ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে :

বিহারের ঝরিয়া অঞ্চলের সুধাকণ্ঠী বালিকা কমলা যখন ঝরিয়ার রাজবাড়ির সভাগায়ক প্রসিদ্ধ সংগীতগুরু কে. মল্লিকের কাছে শ্যামাসংগীত শেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র নয়-দশ বৎসর। পরে সভাগায়ক শ্রীনাথ দাসনন্দীর কাছে কমলা দেবী আনুষ্ঠানিকভাবে নাড়া বাঁধেন। তাঁর নামের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে তিনি তাঁর নিজ বাসস্থানকে চিরবন্ধনে স্মরণীয় করে রেখেছেন। এখন বয়সে ছয় দশক পেরিয়ে এসেছেন শিল্পী, সংগীতক্ষেত্র থেকে প্রায় অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অনুপম কণ্ঠমাধুর্য মূর্ছিত হয়ে আছে অগণিত শ্রোতার কানে, তন্ময় হৃদয়ে, বিহ্বল আনন্দিত অভিজ্ঞতায়। চারশোর বেশি রেকর্ডে এই লাবণ্যভঙ্গিম কণ্ঠ চিরবন্দী হয়ে গেছে। বাঙলা ছাড়া হিন্দী উর্দু পাঞ্জাবি মারাঠি ভাষাভাষীর কানেও পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তিনি তাঁর কণ্ঠসুধা — এত বেশি ভারতীয় ভাষায় সেকালের আর কোনো মহিলাশিল্পী বোধহয় গান করেন নি। চলচ্চিত্রেও তিনি সংগীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন গৌরবের সঙ্গে। বেতারকেন্দ্রের শিল্পী হিসাবেও দীর্ঘ তিন দশক ধরে তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে সমগ্র দেশ পরিচিত। কীর্তনের বিনম্র ভক্তিরসাতুর আত্মনিবেদনে, মাথুরের অশ্রুকাতর বিরহ-বেদনায় শ্রীমতী কমলা দেবীর কণ্ঠ শুষ্ক হৃদয় বিগলিত করে।

সারা জীবন কমলা দেবী অবশ্য বিচিত্র ধরনের গান গেয়েছেন। বাঙলা ঠুংরি গানে তাঁর কণ্ঠ ছিল সতেজ সাবলীল, রাগাশ্রিত বাঙলা গানেও তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া গজল ঢপকীর্তন বাউল ভাটিয়ালি নজরুলগীতি — সবক্ষেত্রেই শ্রীমতী কমলার কণ্ঠ ছিল অনায়াস-নৈপুণ্যে বিস্ময়বাহী। তাঁর সংগীতদীক্ষা ঘটেছিল অনেক খ্যাতনামা গুরুর কাছে। রামপুর দরবারের সভাগায়ক, সেনী ঘরানার প্রখ্যাত আচার্য উজির খাঁর কাছে বহুকাল তিনি গজল ঠুংরি উচ্চাঙ্গসংগীতের তালিম নেন। আবার বাদল খাঁর ছাত্র, সেকালের গ্রামোফোন কোম্পানির স্বনামপ্রসিদ্ধ সংগীতপরিচালক ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁর কাছেও শ্রীমতী ঝরিয়ার গীতচর্চার সুযোগ ঘটেছিল। প্রখ্যাত নটনাট্যকার সংগীতজ্ঞ তুলসী লাহিড়ীও কমলা দেবীর সংগীতজগতে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

বাঙলা গানের বহুশাখায়িত বৈচিত্র্যে সহজ সঞ্চরণ করেও শেষ পর্যন্ত কমলা দেবী তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গীতি-অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন করুণাঘন শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধ চরণতলে — সেইখানেই বোধহয় তাঁর সাধনার চরম পরিপূর্ণতা অনুভব করে তিনি কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। পদাবলী কীর্তনের আসরেই তাঁর জনপ্রিয়তা সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভাববৃন্দাবনের লীলামাধুরী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুধ্যান করেই তাঁর জীবনপথের তোরণদ্বারের দিকে তিনি শান্ত চরণে এগিয়ে চলেছেন।

সাত

বাংলা গানের এক আশ্চর্য প্রতিভা কমলা ঝরিয়া। আধুনিক, কীর্তন, ভজন, রামপ্রসাদী, আগমনী, বিজয়া, ভক্তিমূলক, ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি, রাগপ্রধান, নজরুলগীতি, চিত্রগীতি, গজল — নানা ধরনের গান তিনি গেয়েছেন। *আনন্দবাজার* পত্রিকার সম্পাদক অশোককুমার সরকার এইচএমভি-র 'গোল্ডেন ডিস্ক' প্রদান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় (৬ এপ্রিল ১৯৭৬) কমলা ঝরিয়ার পরিচিতি প্রসঙ্গে তাঁর কণ্ঠ-ঐশ্বর্য এবং গায়কির স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতার কথা বলেছেন এইভাবে :

> কিছুদিন আগে হঠাৎ রেডিওতে একটা গান আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল। অনুষ্ঠানের ঘোষণা শুনি নি বটে কিন্তু এ কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝলাম এই শিল্পী শ্রীমতী কমলা দেবী (ঝরিয়া) ছাড়া কেউ হতে পারেন না। সহজ ও স্বচ্ছন্দ গান করার ভঙ্গী, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং সবচেয়ে বড় কথা, গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য সুরময় পরিবেশ সৃষ্টি; এ সবই কমলা দেবীর মতো নিষ্ঠাবতী শিল্পীরই বৈশিষ্ট্য হতে পারে। সে যুগের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের মতো সাধনা, শিক্ষা এবং অনুশীলন ছিল বলেই কমলা দেবী শিল্পী হিসেবে এত দীর্ঘায়ু হতে পেরেছেন।

কমলা ঝরিয়ার গ্রামোফোনের ভুবনে প্রবেশ এইচএমভি-র কল্যাণে। তাঁর প্রথম রেকর্ড এখান থেকেই বের হয়। এইচএমভি-র তালিকা-পুস্তিকায় (ক্যাটালগ) প্রতি মাসে নতুন রেকর্ড ও শিল্পীর পরিচিতি ছাপা হতো। ক্যাটালগের প্রচ্ছদে শিল্পীদের ছবি স্থান পেতো। এইচএমভি-র ক্যাটালগে শিল্পী কমলা ঝরিয়া সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়, তা উদ্ধৃত করলে তাঁর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে এমন কয়েকটি মন্তব্য পেশ করা হলো।

'ঝরিয়ার শ্রীমতী কমলা অতি অল্প দিনেই আপনাদের আদরণীয়া হইয়াছেন তাঁহার মধুর কণ্ঠ ও অপূর্ব্ব গাহিবার প্রণালীর গুণে' — এইচএমভি-র এই ঘোষণা (ডিসেম্বর ১৯৩১) যে অতিকথন নয় তার সাক্ষ্য মেলে কমলার গানের আবেদন ও লোকপ্রিয়তায়। খুব অল্প সময়েই তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডের জগতে স্থায়ী আসন করে নেন। জুলাই ১৯৩৩ এইচএমভি থেকে কমলা ঝরিয়ার দু'খানি গানের রেকর্ড

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বের হয় : 'দূর থেকে চেয়ে দেখে ভরে না আঁখি' ও 'বল শতদল চাঁদ হেরে চাঁদমুখ ঢাকা কি ছিল'। একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই এ-সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'মিস্ কমলার সুরেলা কণ্ঠে নৃত্য-চটুল ছন্দের এই গান দুইখানি ফুলের পাতলা ঠোঁটের হাসিটুকুর মতই সুন্দর — তাহার উপর বাঁশী ও স্বরোদের সহযোগীতা শুনিলে মনে হয় যেন চাঁদের সোহাগে গরবী ফুলবধূ দখিনা বায়ের সাথে তালে তালে দুলিতেছে' ('নূতন বাংলা রেকর্ডের তালিকা' : এইচএমভি, জুলাই ১৯৩৩)। ডিসেম্বর ১৯৩৩ প্রকাশিত কমলার আর-একটি আধুনিক গানের রেকর্ডের পরিচিতি এইরকম : 'জনপ্রিয় গায়িকা মিস্ কমলা সুকবি তুলসী লাহিড়ী মহাশয় রচিত এই দুইখানি গান স্বরোদ সহযোগে কত সুন্দর গাহিয়াছেন শুনুন। গায়িকার এই নূতন রেকর্ডখানি সুর, লয়, তান সকল দিক দিয়াই অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে' ('His Master's Voice' : ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের তালিকা, ডিসেম্বর ১৯৩৩)।

কীর্তন গানেই সবচেয়ে বেশি নাম করেছিলেন কমলা। জুন ১৯৩৪-এ তাঁর প্রথম কীর্তনের রেকর্ড বের করে এইচএমভি। 'সখি কো কহু আওয়ব মাধাই' ও '(মাধব) বহুত মিনতি করু তোয়'। এই গান সম্পর্কে তালিকা-পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল : 'মিস্ কমলার কীর্ত্তন গান রেকর্ডে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। গান দুইখানির বিষয় 'বিরহ' — গায়িকার মধুর কণ্ঠে গানের ভাষা অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে' ('হিজ মাস্টার্স ভয়েস' নূতন রেকর্ড', জুন ১৯৩৪)। এই বছরেরই নভেম্বরে বেরুলো যে বৈষ্ণবপদের গীতরূপ তা শ্রোতার মনকে আরো স্পর্শ করলো। তুলসী লাহিড়ী সুর-যোজনা করেন এই জোড়া-কীর্তনের : 'যোজন মন মাহ' ও 'সখি কহতি কানুর পায়'। কমলার কণ্ঠের এই কীর্তন কেমন আবেদন সৃষ্টি করেছিল সে-সম্পর্কে জানা যায় :

> শ্রীমতী কমলার গান আজকাল কোন বিশেষণের অপেক্ষা রাখে না। চাঁদের আলো যে সুন্দর, বনের কোকিলের কুহুধ্বনি যে মনোহারী এ কথা ব'লে বোঝাবার দরকার হয় না। গতবার শ্রীমতী কমলার দুটি ভাটিয়ালী গান আমাদের চোখে অশ্রু হয়ে দুলেছে, এবারে তাঁর দুটি কীর্ত্তন শোনাচ্ছি।
>
> কীর্ত্তন বাঙলার প্রাণের গান। বাঙলার জলে স্থলে, গগনে পবনে, রাঙা পথের ধূলিতে যে প্রেমের চন্দনরেণু ছড়িয়ে রয়েছে, কীর্ত্তন গান সেই অবিনশ্বর প্রেমের মধুর মন্ত্র। তাই কীর্ত্তন আজও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুরাণো হয় নি। শ্রীমতী কমলা প্রাচীন বৈষ্ণবকবির পদাবলী গেয়েছেন। দু'টি গান যেন প্রেম-বিহ্বলা রাধিকার অশ্রু-সজল দু'টি আঁখি।...

বৈষ্ণব-কবির এই অপূর্ব্ব-সুন্দর ভাবকে সুরে সুন্দরতর করেছেন শ্রীমতী কমলা। তাঁর বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠের এই কীর্ত্তন গান দু'টি শুধু শোনবার মত নয়, ঘরে সযত্নে রেখে দেবার মত। কেননা, এই কীর্ত্তন গান দু'টি একবার শুনলে শোনার অতৃপ্তি কেবল বেড়েই যাবে। ('হিজ মাস্টার্স ভয়েস নূতন বাংলা রেকর্ড', নভেম্বর ১৯৩৪)।

'সুধীকণ্ঠী গায়িকা কমলাবালার ভজন গান শ্রোতৃবর্গের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী' — এই মন্তব্য করা হয় তাঁর 'চারু চরণ চারণ চিত্ত চোর বনোয়ারী' ও 'ব্রজ বধূগণ দুকূল হরণ রাস রসবিহারী' ভজন গানের রেকর্ড প্রকাশ উপলক্ষে। কীর্তনের মতো তাঁর ভজনও বিশেষ সমাদর পেয়েছিল।

লোকগান — বিশেষ করে ভাটিয়ালি গান গেয়েও তিনি বেশ নাম করেন। অনেক ভাটিয়ালি গানই তিনি গেয়েছেন — এর মধ্যে প্রখ্যাত গীতিকার প্রণব রায়ের লেখা ও তুলসী লাহিড়ীর সুর-দেওয়া দুটি গানের কথা বিশেষ করে বলতে হয়। 'ও বিদেশী বন্ধু' এবং 'যেথায় দূরে গাঙের চরে ফুল ফুটেছে থরে থরে' — এই গান দুটির রেকর্ড বের হয় ১৯৩৪-এর শেষদিকে। এ-বিষয়ে এইচএমভির তালিকা পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয় :

ভাটিয়ালীর উদাস করা সুর বাঙলার ঘর-ছাড়া মাঝি-মাল্লার, অকূল পথের পথিকের। এই ভাটিয়ালী সুরে বিজড়িত নদী-জলের সজল করুণা, স্রোতে ভেসে-যাওয়া নীড়ের তরে বিহগীর কান্না-কূজন। কূল ভাঙ্গা নদীর সাথে স্রোত-সম-চঞ্চল বেদরদী বন্ধুর যেন কোথায় মিল আছে; নদী ভাঙ্গে ঘরের কূল, বন্ধু ভাঙ্গে মনের কূল! তাই নাইয়া-মাঝির গানে, কূলে প্রতীক্ষমানা কুলবধূর গানে ফুটে ওঠে সেই সকরুণ অভিযোগ। কবি প্রণব রায়ের এই ভাটিয়ালী গানের বাণীতে মূর্ত্তি ধরে ফুটে উঠেছে কুলবধূর সেই মিনতি, সেই বেদনাতুর কাতরতা। গেয়েছেন বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে শ্রীমতী কমলা। গানের বাণী ও সুর যেন গলা ধরাধরি করে কাঁদছে বিজন নদীকূলে বসে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

('হিজ মাস্টার্স ভয়েস্ : সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত নূতন বাংলা রেকর্ড', সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৩৪)।

এই একই সালের অক্টোবর মাসে শৈলেন রায়ের কথা, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও ধীরেন দাসের সুরে যে দুটি ভাটিয়ালি গান এইচএমভি-তে রেকর্ড হয় ('এল আবার ফাগুন মাস' ও 'আমার মন নিয়েছে কাড়ি') তা ছিল দ্বৈতকণ্ঠের — কমলা ঝরিয়া গেয়েছিলেন 'লোককান্ত সুর-শিল্পী' ধীরেন দাসের সঙ্গে। এখান থেকে তাঁর যেসব পল্লীগীতির রেকর্ড বের হয়, তা যথেষ্টই শ্রোতা-সমাদর লাভ করে — 'কুল মজালি ঘর ছাড়ালি', 'বন্ধু বিদেশে গেল' এবং এই রকম আরো কিছু গানের কথা উল্লেখ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে ঝুমুর গানের কথাও এসে যায়। পুরুলিয়ার ঝুমুরগানের প্রখ্যাত শিল্পী সিন্ধুবালা দেবী লোক-গবেষক দীপঙ্কর ঘোষের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় (১১ এপ্রিল ২০০০) জানান, কমলা ঝরিয়ার সঙ্গে তিনি ঝুমুর গান করেছেন পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজবাড়িতে। কমলা রাজার আমন্ত্রণে মাঝেমধ্যেই সেখানে যেতেন, একনাগাড়ে বেশ কিছুকাল ছিলেনও। ঝুমুর গানেও কমলা ঝরিয়ার ভালো দখল ছিল। সিন্ধুবালা আলাপ প্রসঙ্গে বলেছেন : '... কমলাও ঝুমুর গাইত। পাহাড়িয়া ঝুমুরগুলা যা গাইতো উ-দারুণ।' নজরুল-গবেষক বাঁধন সেনগুপ্ত ১৯৬৮-এর ১০ ও ১২ আগস্ট কমলা ঝরিয়ার সঙ্গে গান নিয়ে আলাপ করেন। এতে ঝুমুর গানের প্রসঙ্গও ওঠে। কমলা জানান : 'ঝুমুর গানের প্রবর্তন হয় বিহারের অন্তর্গত ঝরিয়া অঞ্চল থেকে। শ্রীভদ্র ছিলেন এই ধরনের ঝুমুর গানের অন্যতম শিল্পী' এবং 'আদ্রায় (খড়গপুর) পঞ্চকোটে ছিল এসব গানের কেন্দ্রস্থল'। ঝুমুরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তিনি ধারণা দিয়েছিলেন এইভাবে : '১. পাহাড়ে ছাপ, ২. মোটামুটি ৫টা পর্দার নাড়াচাড়া, ৩. গেঁয়ো কথা ও মৈথিলী কথার প্রভাব, ৪. ঠুংরীর ঢঙ কিছুটা থাকে, ৫. মূল ঝুমুরে খাঁটি বাংলা কথা থাকে না কেননা ঝুমুরের লেখকেরা বাংলা কথা জানতেন না। বীরভূমের কোথাও কোথাও ঝুমুর গানের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত সাঁওতাল অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেই ঝুমুর গান প্রবর্তিত ও প্রচলিত হয়েছিল। প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগেও ঝুমুর গান ছিল এদেশে অর্থাৎ প্রধানত বিহার অঞ্চলে'। কমলা শুধু ভালো ঝুমুর গানই গাইতেন না, সেইসঙ্গে এই আঞ্চলিক লোকগানের উদ্ভব, বিকাশ ও এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। গ্রামোফোন কোম্পানি — কি এইচএমভি, কি মেগাফোন — কেউই কমলার কণ্ঠের ঝুমুর গান রেকর্ডে ধরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাখেননি। ফলে আমরা এক অমূল্য সংগীত-সম্পদের শ্রুতি-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

কমলা ঝরিয়া চলচ্চিত্রে অভিনয়, সেইসঙ্গে গানও করেছেন। রেকর্ড-নাটক ও রেকর্ডে-গীতিতে অংশ নিয়েছেন। জানুয়ারি ১৯৩৫-এ এইচএমভি তিন খণ্ডে 'প্রীতি উপহার' নামে একটি কমিক নাটিকার রেকর্ড বের করে। এতে কাজী নজরুল ইসলাম, তুলসী চক্রবর্তী, ধীরেন দাস, নিভাননী, বীণাপাণি, সরযূবালা ও হরিমতীর সঙ্গে কমলা ঝরিয়াও ছিলেন। এইচএমভির বারোটি রেকর্ডে সম্পূর্ণ 'মীরাবাঈ' গীতি-আলেখ্যর প্রধান শিল্পী ছিলেন কমলা ঝরিয়া। 'প্রতাপাদিত্য' নাট্যপালাতেও কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি।

এইচএমভি থেকে তাঁর নানা অনুষঙ্গের — যেমন গজল, কাওয়ালি, ভজন, না'ত, ক্বসিদা, গীত, ঠুমরির রেকর্ড প্রকাশ পায়। তিনি যেসব হিন্দি ছবিতে ('সার্কাস কুইন', 'মতওয়ালী মীরা', 'স্নেহবন্ধন', 'সেবা') কণ্ঠ দেন তারও কিছু কিছু রেকর্ড এখান থেকে বের হয়।

আট

১৯৩২-এ প্রতিষ্ঠিত হয় স্বদেশি রেকর্ড কোম্পানি 'মেগাফোন'। মেগাফোনের স্বাপ্নিক ও রূপকার ছিলেন বরিশালের জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ (জে.এন. ঘোষ)। গ্রামোফোন-সামগ্রী ও বাদ্যযন্ত্র-বিক্রেতা এই কর্মী-পুরুষের মেধা ও শ্রমে অল্পদিনেই মেগাফোন কোম্পানি দাঁড়িয়ে যায়। এইচএমভির সঙ্গে শিল্পী-সম্মানীর বিষয় নিয়ে নজরুলের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফলে নজরুলের নেতৃত্বে বেশ কিছু শিল্পী-কুশলী এইচএমভি ছেড়ে চলে আসেন। নজরুলের সঙ্গে এঁরা যোগ দেন নতুন প্রতিষ্ঠিত মেগাফোন কোম্পানিতে। আরো যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে হীরেন বসু, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। হীরেন বসু কানন দেবীকেও নিয়ে আসেন এখানে। কিছু পরে তুলসী লাহিড়ী ও কমলা ঝরিয়াও যুক্ত হন মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গে। অল্পদিনেই মেগাফোন হয়ে ওঠে বাংলা ও বাংলার বাইরের সেকালের নামী শিল্পী-কুশলীদের মিলনকেন্দ্র।

কমলা ঝরিয়া ও মেগাফোন ছিল একে অপরের পরিপূরক। কমলার গ্রামোফোন রেকর্ড-জীবনের প্রথম পর্ব কেটেছে হিজ মাস্টার্স ভয়েসে — আর দ্বিতীয় পর্ব মেগাফোনে। কমলার পরিপূর্ণ সাংগীতিক মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে — জনপ্রিয়তা অর্জনে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা স্মরণ করতেই হয়। আবার অন্যদিকে কমলাও ছিলেন মেগাফোনের কলা-লক্ষ্মী — অমূল্য সম্পদ। মেগাফোনে তাঁর সংগীত-প্রতিভার সবটুকু তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন। কী গাননি তিনি — কীর্তন, বিজয়া, আগমনী, রামপ্রসাদী, আধুনিক থেকে শুরু করে ভজন, টপ্পা, ঠুম্‌রি, খেয়াল-নাট্যপালাতেও গেয়েছেন — ফিল্মের গানও রেকর্ড করেছেন। বাংলা তো ছিলই তারপরে উর্দু-হিন্দি-পাঞ্জাবি ও আরো আরো ভারতীয় ভাষায় রেকর্ডে গান দিয়েছেন এখানে। মেগাফোনকে প্রচুর ব্যবসা দিয়েছিলেন কমলা। রেকর্ড-যুগের অবসান হলেও মেগাফোন আজও কমলা ঝরিয়ার গান বাঁচিয়ে রেখেছে ক্যাসেট, সিডি ও ডিভিডির মাধ্যমে। তবে সেই পুরনো রমরমা অবস্থা আজ আর নেই। সেকালের কথা ও কাহিনি আজ দূরের স্মৃতি। পুরনো দিনের শিল্পীদের সংগীত-শ্রোতারা যেমন মেগাফোনও তেমনি ভুলতে বসেছে। মেগাফোনের গানের বাড়িতে এই প্রতিষ্ঠানের মূল সংগীত-ব্যক্তিত্ব নজরুল অনুপস্থিত, কমলার স্মৃতি বলতে রিহার্সেল-রুমে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কানন দেবীর পাশাপাশি তাঁর একটি বড়োসড়ো ছবি ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে আছে।

মেগাফোনের জিতেন ঘোষ গ্রামোফোন রেকর্ডের জগতে ছিলেন এক অসামান্য দূরদর্শী ও সফল মানুষ। খুব ছোটো থেকে বড়ো হয়েছিলেন — সাইকেল-মেকার থেকে মেগাফোন কোম্পানির মালিক। গানের সমঝদার ও পাকা জহুরি ছিলেন তিনি। কোন শিল্পীর কী ধরনের গান শ্রোতারা নেবেন — কোন শিল্পী টিকে থাকবেন — রেকর্ডের বিক্রি-বাট্টা কেমন হবে, এসব তিনি খুব ভালো বুঝতেন। বেগম আখতারকে তিনিই রেকর্ড-সংগীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। কানন দেবী যে অর্থ ও সম্মান দুই-ই বয়ে আনবেন সেই বিশ্বাস থেকেই তাঁকে হীরেন বসুর সহায়তায় মেগাফোনে ভিড়িয়েছিলেন। ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান, নজরুল, হীরেন বসু, তুলসী লাহিড়ীর মতো যুগন্ধর সংগীত-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠানে থাকলে আরো আরো শিল্পী আকৃষ্ট হবেন — সেই হিসেবেও ভুল ছিল না। তুলসী লাহিড়ীর হাত ধরেই কমলা ঝরিয়ার মেগাফোনে আসা। জিতেন ঘোষ খেয়াল করেছিলেন কমলার গলায় কোন কোন গান ভালো ফোটে। সেগুলো তো বটেই, পাশাপাশি নিরীক্ষার কারণে অন্য ধরনের গানও তাঁকে দিয়ে রেকর্ড করিয়েছিলেন। শুধু বাংলা নয়, সেইসঙ্গে অন্য ভাষাতেও তাঁর রেকর্ড বের হয়, ফলে বাংলা গানের যেসব শিল্পী ভিন্ন ভাষার গান গেয়ে সর্বভারতীয় খ্যাতি ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, সেই তালিকায় কমলা ঝরিয়ার নামও যুক্ত হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কমলার মেগাফোনের অনেক গানই কাল থেকে কালান্তরে পৌঁছেও শ্রোতার মনকে অধিকার করে রেখেছে। 'কালজয়ী' — এসব গান সম্পর্কে এই বিশেষণকে কেউ বাড়িয়ে বলা কথা এমন বলতে পারেন না। 'রজনী প্রভাতে মাতা যশোমতী', 'তোমারি গরবে গরবিনী হাম', 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়', 'গোকুল ছাড়ি যবহু', 'না হ দরশ সুখ', 'সজনী অব কি করকি', 'কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ', 'সখি না বলা বচন আন্', 'কাতরা রাধিকা দেখিয়া অধিকা', 'কহিও কানুরে সই', 'ঐ খেনে ধনী রোয়ি', 'ধিক্ ধিক্ তোরে নিঠুর', 'সই কে বলে পীরিতি ভাল', 'তুহু রহু নিকরুণ', 'কি মোহিনী জান বঁধু' — এইসব কীর্তনের সুর-ব্যঞ্জনা মানুষকে ভিন্ন এক জগতে নিয়ে যায়। 'মা হওয়া কি মুখের কথা', 'মা আমায় ঘুরাবি কত', 'রইলি না মন আমার বশে', 'আমার হৃদ-কমল', 'চিন্তাময়ী তারা তুমি', 'মা গো আমার কপাল দোষী', 'মন গরীবের কি দোষ আছে', — কমলার কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান এক নতুন আবেদন তৈরি করেছিল।

ভক্তিমূলক ছাড়াও তাঁর আধুনিক বা কাব্যগীতির কথাও স্মরণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে বাংলা ঠুম্‌রি, খেয়াল ও গজলের কথাও এসে যায়। মেগাফোন থেকে এমন অনেক গানই বেরিয়েছিল — চটজলদি উল্লেখ করা যায় 'আমি এলাম মালা দিতে', 'ফুল-সম বঁধু তব হাতে', 'জান কি সজনী', 'পথ-পানে চাহে', 'বিরহ-মিলনেরই ডালা' ও 'স্বপন ভেঙ্গো না, যেও না বঁধুয়া চলি'র কথা। শেষের গান দুটির রেকর্ড প্রকাশ পায় এপ্রিল ১৯৩৯। 'মেগাফোন রেকর্ড'-এর ক্যাটালগে রেকর্ডটির পরিচিতিতে কমলা ঝরিয়া 'বাঙলার শ্রেষ্ঠ গায়িকা' হিসেবে মান পান। সেইসঙ্গে মন্তব্য করা হয় : 'সুকণ্ঠ, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য এবং সুষ্ঠু-অভিব্যক্তি এই তিনটির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাবেশে এই রেকর্ডখানি'।

কমলার গায়কিতে এক ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল আকালের গান গেয়ে। তুলসী লাহিড়ীর কথা ও সুরে কমলা মার্চ ১৯৪৬-এ মেগাফোন থেকে দুটি গান রেকর্ড করেন : 'শোন্ রে শোন্ বাংলা দেশের কাঙ্গাল চাষী ভাই' এবং 'ভুলো না রেখ মনে বাঁচবে যত কাল/ সোনার দেশে কেন এল পঞ্চাশের আকাল'। এই গণসংগীত দুটি সেই সময়ে অত্যন্ত আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। মেগাফোনের 'বাসন্তী গীতি-মাল্য' (মার্চ ১৯৪৬) তালিকা-পুস্তিকায় আকালের এই গান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় : '১৩৫০ বাঙ্গালার পল্লীজীবনে যে করুণ স্মৃতি রেখে গেছে তারি মর্ম্মস্পর্শী অভিনব রূপ পাবেন সুগায়িকা শ্রীমতী কমলার এই দুখানি অপরূপ গানে। কথা ও সুর দিয়ে দেশের সত্যকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যথা ও বেদনার পরিচয় দেবার চেষ্টা রেকর্ড-জগতে এই প্রথম।'

এইচএমভির মতো মেগাফোনেও কমলা বেশকিছু ফিল্মের গান রেকর্ড করেন। মনে পড়বে *অভিজ্ঞান* ছবির গান : 'মালা যদি দিলে ভুলে' ও 'তোমার কাছে চাইতে বঁধু'। 'তনুর দেউলে কাঁদে দেবতা' ও 'কাজল-কালো হরিণ-চোখের স্বপন আমায় ডাকে' — কমলার গাওয়া *দেবযানী* ছবির এই গান দুটি সম্পর্কে মেগাফোনের তরফ থেকে বলা হয় : ' 'মতিমহল থিয়েটার্সের' দেবযানী বাণীচিত্রের শ্রেষ্ঠ গান দুটি আমরা প্রকাশ করলাম। গায়িকার গানের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন কারণ যাঁরা ছবিটি দেখেছেন তাঁরাই গান দুটির প্রশংসা করেছেন' ('মেগাফোন রেকর্ড' : ডিসেম্বর ১৯৩৯)। কমলার হিন্দি ফিল্মের গানের রেকর্ডও মেগাফোন বের করেছিল। *অভাগিন* ছবিতে কমলার গাওয়া 'তুম সে মাঙনে মে লাজ আয়ে' ও 'জিগর কে ঘাওকো উপরকা মরহাম' — এইসব গান একসময় লোকের মুখে মুখে ফিরতো।

মেগাফোনের পরিবেশ ছিল অন্তরঙ্গ ঘরোয়া। শিল্পীদের সুখে-দুঃখে জিতেন ঘোষ ছিলেন নির্ভরতার এক মরমি আশ্রয়। তাঁর কল্যাণে মেগাফোন হয়ে উঠেছিল একটি সুখী পরিবারের মতো। আর এখানেও বাঙালি-অবাঙালি অনেক সংগীতগুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। এঁদের সান্নিধ্য-সাহচর্য কমলা ঝরিয়াকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছিল। আর রেকর্ড-সংগীতের ক্ষেত্রে মেগাফোনেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল — খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন। প্রায় দুই দশক ধরে এই মেগাফোনের সঙ্গে যুক্ত থেকেই তিনি সংগীতের সেবা করেছেন।

নয়

গ্রামোফোনে গান দেওয়ার কিছু আগে থেকেই তিনি বেতারে গান গাইতে শুরু করেন। কলকাতায় প্রথম বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯২৭ সালে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন নামে। প্রথম থেকেই নিয়মিত তিনি বেতারে সংগীত পরিবেশনের সুযোগ পান। গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান রেকর্ড করার বিষয়টি সহজ হয়ে ওঠে বেতারশিল্পী হওয়ার সুবাদে। বেতারে কমলার গান গাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন *আনন্দবাজার* পত্রিকার সম্পাদক অশোককুমার সরকার। টানা তিন দশক তিনি বেতারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওর সুবর্ণ জয়ন্তীতে ২৬ আগস্ট ১৯৭৭ ইন্দুবালা-আঙ্গুরবালার সঙ্গে কমলা ঝরিয়াও সংবর্ধিত হন ও স্মারক-সম্মাননা লাভ করেন।

বলতে গেলে তুলসী লাহিড়ীর আগ্রহ ও উৎসাহেই কমলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছায়াছবিতে নামেন। তাঁর গানের সঙ্গী ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, হরিমতী এবং আরো দু-একজন আগেই ফিল্মে অভিনয় শুরু করেছিলেন। এঁরা একসঙ্গেও কয়েকটি ছবিতে সহশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। কমলার ক্ষেত্রে অভিনয়ের চেয়ে গানই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। তুলসী লাহিড়ীর কাহিনি নিয়ে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি ১৯৩৩-এ *যমুনা পুলিনে* নামে একটি ছবি তৈরি করেন। এই ছবিতে বিশাখা চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই কমলা ঝরিয়ার চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ। এরপর তিনি বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে অন্তত গোটা বিশেক ছবিতে অভিনয় করেন : *বিল্বমঙ্গল* (১৯৩৩), *পাতালপুরী* (১৯৩৫), *মন্ত্রশক্তি* (১৯৩৫), *স্বয়ম্বরা* (১৯৩৫), *তরুবালা* (১৯৩৬), *সোনার সংসার* (১৯৩৬), *বাঙ্গালী* (১৯৩৬), *একটি কথা* (খণ্ডচিত্র, ১৯৩৬), *সাথী* (১৯৩৮), *দেবযানী* (১৯৩৯), *ঠিকাদার* (১৯৪০), *ফিভার মিকচার* (১৯৪০), *বিজয়িনী* (১৯৪১), *অবতার* (১৯৪১), *স্টেপ মাদার*, *নাইট বার্ড* ইত্যাদি। অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ধীরাজ ভট্টাচার্য, কে. এল. সায়গল, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, চন্দ্রাবতী, রাজলক্ষ্মী, ছায়া দেবী, কানন দেবী — সেকালের থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের এইসব খ্যাতিমান শিল্পীদের সঙ্গে কমলা ঝরিয়ার অভিনয়ের সুযোগ মিলেছিল।

থিয়েটারের সঙ্গেও যোগ ছিল কমলার। মূলত তুলসী লাহিড়ী জড়িত ছিলেন এমন কিছু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। গান গাইতে হয় এমন চরিত্রেই তিনি বেশির ভাগ অংশ নিয়েছেন। মঞ্চে তাঁকে যেমন দেখেছিলেন সে-বিষয়ে তাঁর এক গুণগ্রাহী শ্যামল ঘোষ জানিয়েছেন :

> আঙুরবালা-ইন্দুবালা দুজনেই একসময়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করেছেন। তবে তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে আমি কিন্তু কমলা ঝরিয়ার অভিনয় একবার দেখেছিলাম তাঁর পড়ন্তবেলায়। বিশ্বরূপা থিয়েটারে 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকে। চরিত্র তেমন কিছু নয়, কিন্তু কয়েকখানা গান ছিল। আর সে গান যে কী মনোরম গেয়েছিলেন। অনায়াস ভঙ্গিতে গাওয়া তাঁর সেই কীর্তনাঙ্গের গান অডিটোরিয়ামের শেষ আসন পর্যন্ত ললিত-মাদকতা তৈরি করেছিল। কণ্ঠের সেই দাপট এই মাইক্রোফোনের যুগের কোনো শিল্পী কল্পনাও করতে পারবেন না। চিৎকার নয়, যেন ঘরে বসেই গাইছিলেন, অথচ কী স্পষ্ট কী মেলডি! (*স্মৃতি সত্তা নাট্য* : ১৮৪)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দশ

কমলা তারিফ পেয়েছেন বাঙালি সংগীত-রসিক শ্রোতার, বাংলা মুলুকের বাইরেও — কিন্তু কোনো রাষ্ট্রীয় খেতাব বা পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। অবশ্য এসব নিয়ে তাঁর কোনো খেদও তেমন ছিল না। অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। 'ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শান্ত ও শালীন আচরণে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় ছিল প্রচুর কিন্তু তিনি আত্মসচেতন ছিলেন না' (দৈনিক *যুগান্তর* : ২১ ডিসেম্বর ১৯৭৯)। খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন এমন একজনের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে : 'কমলা ঝরিয়া একটু গ্রাম্যধরনের নরম প্রকৃতির মহিলা, যিনি নিজের কথা তেমন করে গুছিয়ে বলতে পারেন না, অথবা বলতে চান না' (*স্মৃতি সত্তা নাট্য* : ১৮৪-৮৫)। ইন্দুবালার মতো প্রগল্‌ভ বা গোছানো বা খোলামেলা নন, আঙ্গুরবালা-কানন দেবীর মতো মেকি বংশগৌরব বা আভিজাত্যের ভানও ছিল না, — শান্ত-সৌম্য-বিনয়ী-আত্মমুখী-নিভৃতচারী অথচ আন্তরিক-সৌজন্যপরায়ণ কমলার সঙ্গে কিছুটা যেন যূথিকা রায়ের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যূথিকা রায়কে খুব কাছ থেকে দেখে এই সাদৃশ্যের তুলনা মনে আসে।

শ্যামল ঘোষ নজরুলের গানের তিন কন্যা — ইন্দুবালা-আঙ্গুরবালা-কমলা ঝরিয়াকে নিয়ে বাইশ মিনিটের যে তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' নামে — তাতে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও কমলার শিল্পীসত্তা ও জীবনকথার অন্তরঙ্গ আভাস মেলে। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৫ এই তথ্যচিত্রের উদ্বোধনী-প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন সত্যজিৎ রায়, সুরলোকের তিন কন্যার হাতে সম্মান-উপহার তুলে দেওয়ার জন্যে। আমন্ত্রিত না হয়েও সাগ্রহে হাজির হয়েছিলেন সুরামত্ত ঋত্বিক ঘটক। ইন্দুবালা-আঙ্গুরবালা ছিলেন, কিন্তু কমলা ঝরিয়া যে-কোনো কারণেই হোক অনুষ্ঠানে থাকতে পারেননি। এককালের এই সাড়া জাগানো তিন শিল্পী জীবনের শেষপর্বে প্রায়-বিস্মৃতির আড়ালেই চলে গিয়েছিলেন। এই তথ্যচিত্র যেন বিস্মৃতির ধূসর জগৎ থেকে তাঁদের নতুন করে আলোয় নিয়ে এলো। 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' তাই দর্শকদের মন কেড়েছিল — গণমাধ্যমের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। কলকাতার প্রধান কাগজগুলোতে — এমনকি *কৃত্তিবাসে*ও এর প্রশংসাসূচক আলোচনা বেরিয়েছিল, এখানে কলম ধরেছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল, কিন্তু আরো বিস্তারিত উপস্থাপনের একটা দাবি তাঁদের ছিল, তাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই অতৃপ্তি নিয়েই দৈনিক *যুগান্তর* পত্রিকা (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫) লিখেছিল : 'আঙ্গুরবালা দেবী ও কমলা দেবীর সঙ্গীতজীবন আরেকটু বিস্তৃতভাবে চিত্রায়িত হলে দর্শকের পক্ষে এই দুই গুণী শিল্পীকে বুঝতে সুবিধা হত'।

এগারো

তাঁর সমকালের শিল্পীদের স্মৃতিচর্চায় কমলা ঝরিয়ার প্রসঙ্গ তেমন করে আসেনি। একেবারে জীবনের শেষের দিকে কোন কোন শিল্পীর গান ভালো লাগে এমন প্রশ্নের জবাবে আঙ্গুরবালা বলেছিলেন : '... কে. মল্লিক, কমলা ঝরিয়া, মালবিকা কানন ও মান্না দের গান ভাল লাগে ভিন্ন ভিন্ন কারণে' (*বাংলার বুলবুল আঙ্গুরবালা* : ৬১)। আবদুল আহাদ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন : 'আমরা... রেকর্ড বাজিয়ে বাজিয়ে সে যুগের সব বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীদের গান শুনতাম। কে. সি. দে, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শচীন দেববর্মন, কানন দেবী, কে. মল্লিক — এঁদের গান সময় পেলেই শুনতাম' (*আসা যাওয়ার পথের ধারে* : ১৫)। অন্তত এইসব সাক্ষ্য থেকেও বেশ বোঝা যায়, সেকালে বাংলা রেকর্ড-সংগীতের শিল্পী হিসেবে কমলা কতোটা জনপ্রিয় ছিলেন।

বারো

তুলসী লাহিড়ী কমলার জীবনবীণার তারটি বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর কমলা প্রায় বছর কুড়ি বেঁচে ছিলেন। অনেকটাই নিঃসঙ্গ-সাথীহারা — বাইরের জগৎ তাঁর কাছে ধীরে ধীরে ছোটো হয়ে আসে — একসময় প্রায় ছিন্ন হয়ে পড়ে এই সম্পর্ক। শেষজীবন নানা রোগশোকে কাটে। শ্বাসকষ্টে মাঝেমধ্যেই পীড়িত হতেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত তিনবার করোনারি থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হন। বিদায়ের দিনটি ছিল তাঁর গানের দিন — 'প্রকাশ্যে গান করা বন্ধ করলেও যখনই মন চেয়েছে গান গেয়েছেন আপন মনে নিজের আনন্দে। মৃত্যুর দিন সকালে অনেকক্ষণ গান গেয়েছেন, বারবার বলেছেন : 'আজ খুব গান করতে ইচ্ছে করছে' (সাপ্তাহিক *দেশ* : ৫ জানুয়ারি ১৯৮০)।

এইচএমভির পক্ষ থেকে ৬ এপ্রিল ১৯৭৬ কলকাতার রবীন্দ্রসদনে আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, কানন দেবী, পঙ্কজকুমার মল্লিক, যূথিকা রায় ও কমলা ঝরিয়াকে 'গোল্ডেন ডিস্ক' দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের স্মারকপত্রে তাঁর সম্পর্কে লেখা ছোটো এক পরিচিতি-রচনার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপসংহারে যে-কথা ক'টি বলা হয়েছিল তা উল্লেখ করেই এই কমলা-উপাখ্যান শেষ করি :

> সংগীতের আসর থেকে অবসর নিয়েও... তিনি নির্লিপ্ত নিষ্কামভাবে সংসারের বেদীর উপর জীবনের শেষ নৈবেদ্য অর্পণ করেছেন, আর আমাদের দান করেছেন সংগীতের এক সম্পন্ন বর্ণোজ্জ্বল উত্তরাধিকার। বাঙালির গানে শ্রীমতী কমলা ঝরিয়া একটি প্রদীপ্ত যুগের দেবদেউলের প্রোজ্জ্বল হোমশিখা।

গ্রন্থঋণ

১. গোলাম কুদ্দুস : *সুরের আগুন*। কলকাতা, ১৯৬১।
২. আব্বাসউদ্দীন আহমদ : *আমার শিল্পী জীবনের কথা*। কলকাতা সংস্করণ : বইমেলা ২০০১।
৩. প্রশান্ত দাঁ : *বাংলার বুলবুল আঙ্গুরবালা*। পুনর্মুদ্রণ : কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৩।
৪. আবদুল আহাদ : *আসা যাওয়ার পথের ধারে*। ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৬।
৫. শ্যামল ঘোষ : *স্মৃতি সত্তা নাট্য*। কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩।
৬. আবুল আহসান চৌধুরী-সম্পাদিত : *বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা*। ঢাকা, অক্টোবর ২০০১।
৭. *যুগান্তর* (দৈনিক, কলকাতা) : ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫।
৮. *দেশ* (সাপ্তাহিক, কলকাতা) : ৫ জানুয়ারি ১৯৮০।
৯. *দেশ* (সাপ্তাহিক, কলকাতা) : ২৩ মে ১৯৯২।
১০. *শব্দ শাব্দিক* (তুলসী লাহিড়ী জন্মশতবর্ষ স্মরণ, সংখ্যা-১, উত্তর ২৪ পরগনা) : অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৫।
১১. এইচএমভির রেকর্ড-তালিকা : ডিসেম্বর ১৯৩৩, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৩৪, নভেম্বর ১৯৩৪।
১২. মেগাফোন কোম্পানির রেকর্ড-তালিকা : ডিসেম্বর ১৯৩৯।
১৩. মেগাফোন কোম্পানির রেকর্ড-তালিকা : *বাসন্তী গীতিমাল্য*, মার্চ ১৯৪৬।
১৪. এইচএমভির স্মরণিকা : কলকাতা, ৬ এপ্রিল ১৯৭৬।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভোরের যূথিকার সঙ্গে আলাপ

তিরিশের দশক বাংলা গানের মোড় ফেরার কাল। বিশেষ করে আধুনিক বাংলা গান নতুন আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যে জন্ম নেয় এই সময়েই। এই যে কালান্তর — তার মূলে ছিলেন এক কিশোরী — তাঁর নাম যূথিকা রায়। ১৯৩৪-এ মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর প্রথম রেকর্ড বেরুলো এইচএমভি থেকে — আধুনিক বাংলা গানের রূপটা তিনি পালটে দিলেন — সে-এক বিস্ময়ের ইতিহাস। এই যে পালাবদলের অবিস্মরণীয় ঘটনা, সে সম্পর্কে আর-এক সুরশিল্পী বিমান মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'যূথিকা রায়ের নামে বাজারে রেকর্ড বেরুল — আমি ভোরের যূথিকা আর ওই বিখ্যাত সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে — যে গানটাকে এখনকার গবেষক বিশেষজ্ঞরাও অনেকে, আধুনিক বাংলা গান সরণীটির প্রথম মাইলফলক বলে চিহ্নিত করেছেন। কারুর কাছে এটা হয়ত প্রশ্নাতীত নাও হতে পারে, তবু এ গান যে ইতিহাসের উপাদান হয়ে গেছে — তাতে কিন্তু কোনরকম দ্বিমত নেই। সেই বোধহয় রেকর্ডের বাংলা গানে, প্রথম অর্কেস্ট্রা তৈরি হল।... তা, রেকর্ডখানা বাজারে বেরুল। আর মাত্র তিন মাসের মধ্যে যূথিকাদির এই রেকর্ডখানা ষাট হাজার কপি বিক্রী হয়ে গিয়ে বাজারে রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দিল। রাতারাতি যূথিকাদি হয়ে গেল আর্টিস্ট, স্টার' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : সিতাংশুশেখর ঘোষ, কলকাতা, ২০০৩; পৃ. ১৫৪-৫৫)। 'চিরকালীন সুপারহিট' এই রেকর্ড বেরুনোর পর কি ডিলার, কি শ্রোতা — সবাই মুখিয়ে থাকতেন শিল্পীর নতুন রেকর্ডের জন্যে।

দুই

যূথিকা রায়ের জন্ম ২০ এপ্রিল ১৯২০ হাওড়ার আমতায়। রায়-পরিবারের আদিবাড়ি খুলনার সেনহাটিতে। ছেলেবেলা থেকেই গানের প্রতি তাঁর ঝোঁক। বাবা-মায়ের উৎসাহে শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ হয়। রেকর্ডে গান দেওয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রামোফোন কোম্পানি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লিমিটেডের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন — মূলত গেয়েছেন এইচএমভির কুকুর-মার্কা লেবেলেই। শুরুটা বাংলা গান দিয়ে হলেও পরে হিন্দি-উর্দু-তামিল — নানা ভাষায় গান করেছেন। আধুনিক বাংলা গান, রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের গান, কিংবা ভক্তিগীতি, কীর্তন — আবার ভিন্ন ভাষায় গীত-গজল-ভজন-না'ত-বারমাসি-ঋতুসংগীত-হোলি-দেওয়ালি-রামধুন, দেশগান এবং সেইসঙ্গে ফিল্মের গান গেয়ে বাংলা মুলুক ছাড়িয়ে সারা ভারত ও ভারতের বাইরেও নানা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কণ্ঠে মীরার ভজন মানুষের মনে এক গভীর আবেগ ও আবেদন সৃষ্টি করে। বহুকাল পর্যন্ত রেকর্ড-লেবেলে তাঁর মূল নামের সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে 'রেণু' — এই ডাকনামটিও লেখা থাকতো। আরো পরে নাম থেকে ঝরে যায় 'রেণু', থাকে শুধু 'যূথিকা রায়'।

তিন

সেকালে গানের জগতে যূথিকা রায়ের নাম-যশ-গুরুত্ব কেমন ছিল তার পরিচয় মেলে সংগীতশিল্পীদের ভাষ্যে আর গ্রামোফোন কোম্পানির ক্যাটালগের বিবরণে। 'আমি ভোরের যূথিকা' ও 'সাঁঝের তারকা আমি' — এই দুটি গান (রেকর্ড নম্বর : এন ৭২৯৭) নিয়ে যূথিকার প্রথম রেকর্ড প্রকাশ পায় নভেম্বর ১৯৩৪-এ। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'-এর নভেম্বর ১৯৩৪-এর 'নূতন বাংলা রেকর্ড'-এর তালিকা-পুস্তিকায় এই গান ও শিল্পী সম্পর্কে বলা হয় : 'বিজন বনে কত মুকুল শোভায়-সৌরভে আপনি ফুটে ওঠে, অথচ লোকে তার কথা জানতে পায় না। তেমনি দুটি ফুল এবার আমরা আপনাদের উপহার দিলাম। এই ফুল দুটি কুমারী যূথিকার দু'খানি গান। কুমারী যূথিকার গানের সঙ্গে আপনাদের এই প্রথম পরিচয়, কিন্তু মনে হবে যেন ভোরের আধোঘুমে আধোস্বপ্নে এই গান কতদিন মনের দুয়ারে বেজেছে। এমনিই তাঁর কণ্ঠের গান। তাঁর স্বভাব-সুন্দর সুর যেন গিরিনির্ঝরিণীর রূপালী জলধারার মত আপনি উৎসারিত হ'য়ে ওঠে, দূর-থেকে ভেসে-আসা সানায়ের মতই ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তোলে। রেকর্ডে গায়িকার গান এই প্রথম। এবারে তিনি ভোরের যূথিকা আর সাঁঝের তারকার গান শুনিয়েছেন। প্রভাতের অরুণ যে যূথিকার বন্ধু, আকাশের যে সন্ধ্যাতারা মাটীর প্রদীপ হ'য়ে তুলসীতলায় নেমে এসেছে, এই দুটী গানে তাদেরই মর্ম্মকথা মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠেছে। নবীনের মধ্যেই সুন্দরের আবির্ভাব, নূতন কণ্ঠে নূতন গান কত সুন্দর হয়েছে, আপনাদের তা' শুনতে অনুরোধ করি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মপ্রকাশের চার বছর পর স্বাভাবিক নিয়মে যূথিকা যখন আরো পরিণত ও বিকশিত, তাঁর গান নানা ধারায় তখন প্রবহমান। আধুনিক বাংলা গানের সূচনা যেমন তাঁর হাতে হয়েছে, তেমনি 'গীতি-চিত্রে'রও তিনি প্রথম রূপকার। প্রণব রায়ের কথা ও কমল দাশগুপ্তের সুরে 'পাহাড়-দেশের বন্ধু আমার স্বপ্নে আমায় ডাকো গো' ও 'রূপ-কাহিনীর দেশে রে, নাম-না-জানা দেশে' — এই দু'খানি গান নিয়ে জুন ১৯৩৮-এ যূথিকার যে-রেকর্ড (এন ১৭০৮২) বের হলো তা ছিল এইচএমভির 'গীতি-চিত্র-মালার প্রথম নিবেদন'। জুন ১৯৩৮-এর ক্যাটালগ থেকে এ-বিষয়ে জানা যায় : 'বর্ত্তমান জুন মাস হইতে আমাদের রেকর্ডের আসরে একটি নতুন বিভাগ খোলা হইল। আমরা এই বিভাগের নাম দিয়াছি 'গীতি-চিত্র-মালা'। কথার তুলিকায় ও সুরের রঙে বিভিন্ন এক-একটি সুন্দর গীতি-চিত্র রচনা করিয়া আমরা গীত-রসিক শ্রোতাদের মাঝে মাঝে উপহার দিব। শুধু আধুনিক ভাব-প্রধান গান এবং মামুলী ভক্তিমূলক ভজন শুনিয়া শুনিয়া যাঁহারা ক্লান্ত, গীতি-চিত্র-মালা তাঁহাদের মনে নতুন আনন্দের রসদ জোগাইবে আশা করি।' এরপর গানের আবহ ও এর রূপকার সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় : 'আমাদের গীতি-চিত্র-মালায় প্রথম ফুল গাঁথিয়াছেন বাংলার শ্রেষ্ঠতমা গায়িকা কুমারী যূথিকা। সুর-সংযোজনা এবং পরিচালনা করিয়াছেন কমল দাশগুপ্ত। প্রথম চিত্রটি একটি পাহাড়িয়া যুবকের বন্য সৌন্দর্য্যের — যে সৌন্দর্য্য আমাদের নাগরিক-সভ্যতা-ক্লান্ত মনকে স্বপ্নে ডাক দেয়। দ্বিতীয় চিত্রটি রূপ-কাহিনীর রাজ্যের — যে রাজ্য আমাদের মনে চিরকালের মায়া রচনা করিয়া রাখিয়াছে। দুইটি চিত্রই কথায়, সুরে, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে এমনই সুন্দর হইয়াছে যে ইহা বাংলা রেকর্ড-জগতে শুধু অভিনব নহে, অতুলনীয়।'

ওই বছরেই — ১৯৩৮-এ, কুমারী যূথিকা রায় (রেণু)-এর 'যদি যমুনার জলে ফুল হয়ে ভেসে যাই' ও 'মন-বৃন্দাবনে রাস-মঞ্চে বেঁধেছি গোপনে' — দুটি ভজন-গানের রেকর্ড (এন ১৭১৮২) বের হয়। গানের কথা প্রণব রায়ের, আর সুর-যোজনা করেন কমল দাশগুপ্ত। এই রেকর্ডটির পরিচিতি প্রসঙ্গে এইচএমভির সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এর ক্যাটালগে উল্লেখ করা হয় : 'গীত-ভারতীর মানস-কন্যা কুমারী যূথিকার এই নতুন ভজন গান দু'টির ভাব সম্পূর্ণ নতুন'। কমল-প্রণব-যূথিকার অনন্য সম্মিলনে জন্ম নেওয়া আর-একটি কাব্যগীতির রেকর্ড (নভেম্বর ১৯৩৮, এন ১৭২১৬), — 'বনপথে যবে নিরজনে' ও 'ওরে আমার গান' — সম্পর্কে ওই মাসের এইচএমভির ক্যাটালগের ভাষ্য :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বাংলার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা গায়িকা কুমারী যূথিকা এ-মাসে দু'টি নতুন গান আপনাদের উপহার দিয়েছেন। কুমারী যূথিকার গানের যাঁরা অনুরাগী, তাঁরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, গায়িকার প্রত্যেকটি গান রচনা ও সুরের দিক থেকে নব নব বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়। কুমারী যূথিকার মতো এমন অপরূপ মায়া-কণ্ঠ শিল্পীর পক্ষেই এত বিভিন্ন বৈচিত্র্য পরিবেশন করা সম্ভব।' এইচএমভির তরফ থেকে যূথিকা রায়ের গান ও গায়কি সম্পর্কে এমন প্রশংসামূলক মন্তব্য হামেশাই প্রকাশিত হয়েছে। এ-থেকে স্পষ্টই ধারণা করা যায়, যূথিকা কতো বড়ো মাপের ও মানের শিল্পী।

চার

আমাদের সৌভাগ্য — সেকালের বাংলা গানের অনুরাগীদের সৌভাগ্য — যুগন্ধর এই শিল্পী আজো আমাদের মধ্যে আছেন — গানের জগৎ থেকে অবসর নেননি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ২০১০-এর ২৩ মে তাঁর উত্তর কলকাতার বাড়িতে। সেদিন সকাল এগারোটা থেকে দুপুর প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হয়। পরে আফসোস্ জাগে, এই কথাগুলো ধরে রাখতে পারলে কতোই না ভালো হতো! অবশেষে সেই সুযোগ মেলে প্রায় দেড় বছর পর।

আগেই দিন-ক্ষণ ঠিক করা ছিল — ২৬ নভেম্বর ২০১১ শনিবার বিকেল চারটে। বনেদি উত্তর কলকাতার ৫-বি শ্যামপুকুর স্ট্রিটের তেতলা বাড়িটিতে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক প্রায় দেরিই হয়ে গেলো। সংস্কারহীন প্রায় একশো বছরের পুরোনো বেশ বড়ো-সড়ো বাড়িটির পেছন দিকে একতলা-দোতলা-তেতলা মিলিয়ে বেশ অনেকগুলো ঘর নিয়ে থাকেন যূথিকা রায় — বাড়ির ডানপাশের একটি অপরিসর গলি পেরিয়ে তারপর পাওয়া যাবে তাঁর দরোজার সন্ধান। জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে — প্রায় পঞ্চান্ন বছর এই বাড়িতে আছেন তিনি। তবে কিছুকালের মধ্যেই এখানকার বাস তুলতে হবে — 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে' — হয়তো বরানগরে। কেননা বাড়ির মালিকেরা এই ভগ্ন-জীর্ণ বাড়িটিকে ভেঙে ফেলে এখানে আকাশচুম্বী অট্টালিকা গড়বেন। এই শিল্পীর জীবনের কতো স্মৃতি — হাসি-বেদনার, দুঃখ-সুখের, দীর্ঘশ্বাস-হাহাকারের, নিঃসঙ্গতার সাক্ষী এই বাড়িটির অস্তিত্ব অচিরেই ধুলোয় মিশে যাবে।

দোতলার বসার ঘরটি পরিচ্ছন্ন অথচ নিরাভরণ — ঠিক যেন শুভ্র শাড়ি-পরা তাঁরই মতো। বোঝা গেলো অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর বিধবা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বউদি পথ দেখিয়ে দোরগোড়ায় নিয়ে এলেন। কিশোরী রেণুর মতো একমুখ হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। বাড়িতে জনমনিষ্যি বলতে এই দু'জনই। নানা কথা শুরু হলো, সেইসঙ্গে ছবি তোলাও। তাঁর জানাই ছিল যন্ত্রে ধারণ করবো তাঁর কথা। আমার সঙ্গে আছে যূথিকাভক্ত সোমনাথ — কলকাতারই ছেলে সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়– আমার ছায়া-সহচর। মূল আলাপের আগে সে কথার ফোয়ারা ছোটালো — যূথিকা রায় দু'একটি কথা আর হাসি দিয়ে — মৃদু মাথা নাড়িয়ে জবাব দিলেন। জলখাবার এলে সোমনাথের কথা বন্ধ হলো — যূথিকা রায়ের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম আমি। থেমে-জিরিয়ে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা উতোর-চাপান চললো। ধীরে ধীরে কথা বললেন — জবাব দিলেন সব প্রশ্নের। কখনও চোখে-মুখে আনন্দের ঝিলিক — আবার কখনও বিষাদ — বেদনায় আচ্ছন্ন — দূর অতীতের কথা বলতে গিয়ে কখনও বা আনমনা ভাব লক্ষ করা যায়। এই যে বড়ো একটা সময় ধরে কথা বললেন, তাতে কিন্তু ক্লান্তি কিংবা বিরক্তির ছাপ চেহারায় পড়েনি। তাঁর অর্জনের কথা — খ্যাতির কথা — স্বীকৃতির কথা জানাতে গিয়ে স্বভাবতই কিছুটা আনন্দিত-উচ্ছল হয়ে উঠেছেন। নজরুলই যে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার ভিত-রচনা কারিগর, আলাপচারিতায় সে-কথা বারবার শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন। সুরের গুরু কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথায় কণ্ঠে হতাশা, বেদনা ও ক্ষোভের সুর বেজে উঠেছে। যে 'কমলদা'কে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কমল দাশগুপ্ত যখন ফিরোজা বেগমকে বিয়ে করলেন, তখন সেটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। এ-বড়ো বিস্ময়ের ব্যাপার! বাইরে প্রত্যাখ্যান করলেও ভেতরে ভেতরে তাঁর জন্যে তবে কি একটা দুর্বলতা ছিল যূথিকার? তাঁকে তিনি গ্রহণও করবেন না, আবার ত্যাগও করবেন না — এ-এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব!

পাঁচ

যূথিকা রায়ের প্রায় দেড় ঘণ্টার আলাপচারিতা টেপ-রেকর্ডারে ধারণ করি। কথোপকথন শেষে এবারে বিদায়ের পালা। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'আসুন, ওপরের তলায় আমার ঘরে — একটা অনুষ্ঠানের কার্ড দেবো।' ওঁর ঘরেও কিছু কথা হলো, আর-একটি ঘরে সাজানো রয়েছে তাঁর সম্মাননা-স্বীকৃতির সব স্মারক। একধরনের তৃপ্তির আনন্দ নিয়ে রাস্তায় নামলাম — অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। আলো-আঁধারি আবহে পথ-চলা শুরু হলো। হঠাৎ [illegible] হলো বহুদূর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে যেন নিঃসঙ্গতার বেদনা নিয়ে কোনো সুর ভেসে আসছে — 'চাঁদ ডুবেছে তবু প্রিয় নাহি আসে'।

ছয়

যূথিকা রায়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর একান্ত স্নেহভাজন ও অনুরাগী সংগীতপ্রিয় তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — তাঁর আন্তরিক সহায়তার কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। এবারের সাক্ষাতের ব্যবস্থাও তিনিই করেন। 'সূরাজ-শ্রুতি-সদনে'র অমিত গুহের কাছে প্রাসঙ্গিক নানা তথ্যের জন্যে গভীরভাবে ঋণী। লোকগানের বিশিষ্ট শিল্পী রমেন সাহা আমাকে দিনের পর দিন সঙ্গ দিয়েছেন। সোমনাথের কথা তো আগেই বলেছি। বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক ডক্টর তপন বাগচী কলকাতা থেকে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এনে দিয়েছেন। ক্যাসেট-রেকর্ডার থেকে সাক্ষাৎকারটি লিখে দেওয়ার দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজটি করেছেন অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক-গবেষক ডক্টর মাসুদ রহমান। দ্রুত কম্পোজের জন্যে মোঃ হুসাইন টিটু যথেষ্ট শ্রম-স্বীকার করেছেন।

সাক্ষাৎকারটি ছাপার উপযোগী করার জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করতে গিয়ে কোনো কোনো অংশ বাদ দিতে হয়েছে। আবার জবাবের অসম্পূর্ণ বাক্য পুনর্গঠিত কিংবা প্রশ্নের সঙ্গে সংগতিহীন জবাবের কারণে প্রশ্নের ধরনও পালটাতে হয়েছে। সেইসঙ্গে পুনরুক্তি বা অপ্রয়োজনীয় বক্তব্যও বর্জন করতে হয়েছে — এমনকি কিছু ব্যক্তিগত স্পর্শকাতর বিষয়ও। স্মৃতিভ্রমের কারণে কিছু তথ্যভ্রান্তি ঘটেছে, সেগুলো যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। কখনো আবার কথার খেই ধরিয়ে দিতে হয়েছে।

শেষে বলতে হয়, এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার *কালি ও কলম* ছাড়া অন্য-কোথাও ছাপার সুযোগ ছিল না — এ-জন্যে সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আবুল হাসনাতের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রিয় পাঠক — আসুন, এবারে আমরা যূথিকা রায়ের মুখোমুখি হই।

আবুল আহসান চৌধুরী

আবুল আহসান চৌধুরী : আমরা যেসব কথা জানতে চাইবো তার কিছু কিছু আপনার স্মৃতিকথায় আপনি বলেছেন। কিন্তু স্মৃতিচর্চায় তো খুঁটিনাটি সবকথা উঠে আসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না, তাই জানতে চাই যে, গানের জগতে আসার পেছনে– বিশেষ করে এই যে গ্রামোফোনে গান দেওয়ার ব্যাপারে আপনি প্রেরণাটা কীভাবে পেয়েছিলেন?

যূথিকা রায় : আমার বাবা, আমার মা এঁরা গান খুব ভালোবাসতেন এবং আমার বাবা নিজেও গাইতে পারতেন। ছোটবেলায় বাবাই আমাকে শিখিয়েছেন। আর মা সব স্তব-স্তুতি দিয়ে যখন পুজো করতেন তখন শুনতাম পাশে দাঁড়িয়ে। আমার খুব ভালো লাগতো সেই স্তুতি-স্তব, সেগুলো আমাকে শেখাতেন। কবে যে আমার গানের একটা ভাব এসে গিয়েছিল আমি নিজেও বলতে পারবো না, কতো বছরে কতো সময়ে আমার এটা হয়েছিল। সেটা মা-বাবা বলতে পারেন। আমি হয়তো কোথাও গান শুনলাম বা কোথাও কেউ কোনো কলের গানের রেকর্ড বাজাচ্ছে, সেই গান যদি আমার ভালো লাগতো আমি সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিতাম। সেটা আমার এমন একটা ভাব ছিল যে দু'তিনবার শুনলেই আমার গানটা মুখস্থ হয়ে যেতো। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারতাম, খুব বেশি সময় আমার লাগতো না। এই করেই আমার গানের জগৎটা শুরু হয় এবং বাবার ছিল চেঞ্জের চাকরি, নতুন নতুন কর্মস্থলে যেতেন —

আবুল আহসান : মানে বদলির চাকরি!

যূথিকা : বদলির চাকরি — দু'তিন বছর অন্তর অন্তর নতুন জায়গায় যেতে হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যেতে হতো। এতে আমাদের গান শেখা বা পড়াশোনার ক্ষতি হতো। কলের গানের একটা রেকর্ড ছিল আমাদের বাড়িতে, সেটা ছিল মাস্টার মদন বলে এক শিল্পীর — আর পাশেই ব্র্যাকেটে লেখা ছিল সাত বছর বয়সে গেয়েছিল যে গানটি — 'একবার এসো শ্রী হরি' — এই বলে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে গানটা করেছিল। আমার তো তখনো সাত বছর হয়নি — বাবা অফিস থেকে ফিরে এলেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাকে ডাকতেন, পাশে বসিয়ে আমাকে গান শেখাতেন, হাতে তালি দিয়ে গান শেখাতেন। ভালো ভালো শিল্পীদের গান রেকর্ড থেকে তুলে এনে বাবা আমাকে শেখাতেন সেসব গান গাইবার জন্যে। কোনটা কী তাল, কী রাগরাগিণী — আমাকে তখন সেগুলো বলতে হতো। এরকম করে বাবারই প্রেরণাটা বেশি ছিল। আর মাঝে মাঝে বলতেন, 'দ্যাখ্ রেণু' — আমার ডাকনাম রেণু — 'দ্যাখ্ রেণু, তোকেও ঠিক এই মাস্টার মদনের মতো তোর সাত বছর বয়সে আমি রেকর্ড করাব।' আমি তখন বলতাম, 'তোমার কি মাথা খারাপ যে তুমি সাত বছর বয়সে আমার রেকর্ড করাবে? যারা গাইছে তাদের তো আমি ভগবান বলে মনে করি, আর তুমি বলছো আমাকে সাত বছর বয়সে রেকর্ড করাবে!' আমি তখন একেবারে কিচ্ছুই শিখিনি, সবে শুরু। বলে, 'না, না, যতোটুকু জানিস্ গাইবি, আমি তোকে রেকর্ড করাব।' এভাবে আমার যখন সাত বছর বয়স হলো, বাবা আমাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এসে — আর ঐ যে বলেছিলেন, তখন থেকেই বাবা — প্রথম থেকেই একেবারে গ্রামোফোনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। মানে যখন নতুন রেকর্ড বেরোবে তখনই রেকর্ড যেন আমাদের পাঠিয়ে দেয়। আমরা থাকতাম তখন গ্রামে, আমার নিজের দেশে, সেটা হচ্ছে সেনহাটি — খুলনা জেলায়। নতুন রেকর্ড বেরোলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানি পাঠিয়ে দিতেন — আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, কে.সি. দে, কে. মল্লিক — এঁদের গানের রেকর্ড পাঠিয়ে দিতেন। আর তাঁরা চিঠিরও বেশ জবাব দিতেন। তা আমার যখন ঠিক সাত বছর বয়স, বাবা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন, আমার পিসির বাড়িতে আমরা তখন উঠলাম। যখন কলকাতায় আসতাম তখন ঐখানেই উঠতাম। আমাকে বাবা গ্রামোফোন কোম্পানিতে নিয়ে গেলেন। গ্রামোফোন কোম্পানি আমার গান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুনে বললেন যে, 'হ্যাঁ, ভালো, ভালো গলা, কিন্তু এখন তো আমরা নিতে পারবো না, ও তো ছোটো, আমরা পরে আবার ডাকবো। আমাদের মনে থাকবে, আমরা পরে ডাকবো।' তারপর আমরা সঙ্গে সঙ্গে আবার দেশে চলে এলাম — না না, দেশে যাইনি। আমরা যখন ফিরে আসছি, বাবার খুব মন খারাপ — বলছেন, 'দ্যাখ্ রেণু, গান এখানে তো হলো না, তা চল্ আমরা বেতারকেন্দ্রে যাই।' ১ নম্বর গারস্টিন রোডে — সেখানে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন। গিয়ে সেখানে দেখলাম বেতার — আমাদের রেডিওর তখন দুটো ঘর মাত্র। আর একটা হলঘর, সেখানে একটা মাইক আর দাঁড়িয়ে আছেন ঘড়ি ধরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। আর যিনি কর্তা তিনি বসে আছেন। আর কোনো লোকও নেই, কোনো ইন্সট্রুমেন্টও নেই। এমনকি হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা এটুকু পর্যন্ত নেই। ফাঁকা-ফাঁকা ঘরটা। আমার অডিশন নেওয়া হলো এবং ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্রুভ্ করলেন এক সপ্তাহের মধ্যে আমার গান ওখানে ব্রডকাস্ট হলো। তখন ছিল সব হেডফোন। হেডফোনে গান শুনতে হতো। মানে এখন যেমন আমরা সাউন্ডবক্সের মধ্য দিয়ে গানটা শুনি, আবার রেকর্ডিংও হয়, সেই হয়তো পনেরো দিন একমাস আগে, দু'মাস আগে, এরকম অনেকটা টাইম নিয়ে ওরা দেখে সময়মতো বাজাতো। আমি সেদিন — আর সেটা ছিল বেতারকেন্দ্রের জন্মদিবস, জন্মবছর। আমি ঠিক বেতারকেন্দ্রের জন্মদিনে গাইনি। কিন্তু বেতারকেন্দ্রের জন্মবছরে আমি গেয়েছিলাম। ঠিক সেম্ বছরে। বেতারকেন্দ্র চালু হয় বোধ হয় ১৯২৭ সালে, আর আমি তখন সাত বছরের। গানটা গাইলাম, আমি তখন খুব ছোটো, সাত বছর বয়স আর ওরকম বাইরে সকলে শুনছে একটা মাইকের মধ্য দিয়ে আমার গানটা যাচ্ছে। আমি গেয়েছিলাম রবীন্দ্রসংগীত — 'আর রেখো না আঁধারে আমায়, দেখতে দাও' — সেটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিয়েই শুরু। তারপর আমার খুব মন ছটফট করছে যে, কী রকম গাইলাম, তাঁদের কী রকম লাগলো! এখানে তো শুনতে পেলাম না। বাড়িতে গিয়ে — পিসিমার বিরাট বাড়ি — অনেক লোক। তা সেখানে গিয়ে আমি ওঁদের কাছ থেকে শুনবো যে কী রকম লেগেছে! আমি তখন খুব উৎসাহ নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার পিসিমার বাড়িতে গেলাম। সব সার সার করে দাঁড়িয়ে আছে আমার আসার অপেক্ষায়। আমি ঢুকেই প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গান কী রকম হলো?' জবাব পেলাম, 'গান কী আর শুনতে পেলাম, মাত্র দু'লাইন শুনেছি।' তারপরের জনকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রকম লাগলো?' তখন বললো যে, 'আমি তো কানে দেওয়া মাত্র কে যেন ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো। আমি কিছুই শুনতে পাইনি। তার পরের জনকে যখন জিজ্ঞেস করছি, 'তা, কেমন লেগেছে তোমার?' তো সে বলছে, 'আমি কানে দেওয়া মাত্তর শুনলাম সমাপ্তির ঘোষণা।' তা আমি তখন মনে মনে কষ্ট পেলাম। আমার আর শোনা হলো না যে কী রকম আমি গেয়েছি! ওদের ভালো লেগেছে — কিন্তু সম্পূর্ণটা তো শুনতে পেলাম না! সেই একটা আমার আক্ষেপ। আমি আর কিছু বললাম না। তারপর সেই পিসিমার বাড়ি থেকে আমরা আবার দেশে চলে এলাম — সেনহাটিতে। এ রকম মাঝে মাঝে বাবা আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসতেন এবং ওখানে জানালে আমাকে ওরা প্রোগ্রাম দিতো। এটা যে সময়ের কথা বলছি তখনও আমরা কলকাতায় আসিনি। আমরা স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসেছি ১৯৩০ সালে। গ্রামে থাকতে মা বলতেন যে, 'না, এখন আমরা গ্রামে বাস করতে পারবো না' — আমাদের গান শেখা হচ্ছে না, এসব হচ্ছে না, পড়াশোনা হচ্ছে না, ভালো ইস্কুলে যাচ্ছি না, ভালো মাস্টার পাচ্ছি না। সেজন্যে আমরা কলকাতায় চলে এলাম।

আবুল আহসান : এই গান গাওয়া নিয়ে কি খুব উল্লেখযোগ্য কোনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্মৃতি মনকে নাড়া দেয়?

যূথিকা : ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ — প্রথম স্বাধীনতা দিবসে আমাকে দিল্লির রেডিও থেকে ওঁরা ডাকলেন — ওনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। এটা ঠিক সেই স্বাধীনতা দিবস বলে আমাকে জানাননি, এটা মানে এমনিই প্রতিবছর আমাকে ডাকতো — যেমন গান্ধিজির জন্মদিন, বড়ো বড়ো একটা ফেস্টিভ্যাল কিছু এসেছে — এরকম হলেই আমাকে ডাকে। তখন ছিল তিনটি করে সিটিং — তিনটে করে সিটিং থাকতো। প্রথমে সকালে একটা সিটিং থাকতো, সেটা পনেরো মিনিট। তারপরে সন্ধ্যের দিকে একটা সিটিং থাকতো, সেটাও পনেরো মিনিট। তারপর রাত্তিরে — শেষের দিকে একটা থাকতো, সেটাও পনেরো মিনিট। কী গাইবো সেটা ওখানে লেখা থাকতো, যে এই গান তোমাকে গাইতে হবে — পনেরো মিনিট সময়। বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন দিল্লি স্টেশনে সকালবেলা — এই ছ'টা-সাতটা এরকম — রেকর্ডিং শেষ করে আমি সবে বাইরে এসেছি, তখন দেখি যে অফিসরুম থেকে একটা অফিসার ছুটতে ছুটতে এসে হন্তদন্ত হয়ে বাবাকে বলছেন, 'যাবেন না, যাবেন না, দাঁড়ান আমাদের বিশেষ কথা আছে।' বাবা দাঁড়াতেই তখন বললেন যে, 'এইমাত্র আমি ত্রিমূর্তি হাউস থেকে ফোন পেয়েছি। আমাকে ফোন দিয়েছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর তরফ থেকে — তিনি জানিয়েছেন যে, আমাদের প্রসেশন এখন লালকেল্লায় যাচ্ছে, ওখানে ভাষণ দেওয়া হবে এবং ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে আমাদের জাতীয় পতাকা তোলা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন যূথিকা গান গেয়ে যায়। ওদের তখন প্রসেশন বেরিয়ে গেছে। আমাকে তখন অফিসার বললেন, 'আপনি শিগগিরই স্টুডিওতে ঢুকে পড়ুন, ঢুকে গান শুরু করুন।' আমি তখন খুব মুশকিলে পড়েছি। কী গান গাইবো — এত বড়ো একটা অকেশন! তারপরে যেমন আনন্দ হয়েছে, তেমন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভয়ও হচ্ছে যে, কোন্ গান দিয়ে শুরু করবো! ওই অফিসার বলছেন যে, 'হ্যাঁ, মহাত্মা গান্ধীজি তোমার ভজন ভালোবাসেন, তোমার ভজন রোজ শোনেন রেকর্ড বাজিয়ে, তুমি সেই ভজন দিয়ে শুরু করো। পরপর তুমি গেয়ে যাবে, থামবে না। পরপর গেয়ে যাবে — যতক্ষণ না আমরা তোমায় ইশারায় জানাবো — এখন থামো — ততক্ষণ পর্যন্ত গাইবে।' আমি তো ঢুকে পড়লুম — ঢুকে পড়ে, এটা ঠাকুরেরই আশীর্বাদ, আমার মনে পড়লো একটা স্বাধীনতার গান — 'সোনে কা হিন্দুস্তান মেরা — সোনে কা হিন্দুস্তান মেরা', এটা দিয়েই আমি আরম্ভ করেছিলাম। তখন তো রেকর্ড হতো — রেকর্ডে দুটো গান থাকতো, 'হিন্দুস্তান মেরা'র অপর পিঠে ছিল — 'ভারত মেরি জন্মভূমি হ্যায়'। তা আমি 'হিন্দুস্তান মেরা' দিয়ে আরম্ভ করলাম এবং তারপরে গান্ধিজি যে সমস্ত ভজন ভালোবাসতেন, যেমন — 'ম্যায় তো গিরধর্ আগে নাচুঙ্গি' — তারপর এই ভজন যতো ছিল আমার সেই গানগুলো দিয়ে আমি প্রায় এক ঘণ্টার মতো গেয়ে তারপর ওখান থেকে সংকেত পেলাম যে — 'বন্ধ করো'। বন্ধ করে আমি বেরিয়ে আসলাম। তা সেটা আমার সংগীতজীবনের একটা খুব বড়ো স্মৃতি। সেটা আমি এখনও যখনই আমাকে কেউ বলে যে, 'তোমার বড়ো স্মৃতি কী', — তখন আমি এই ঘটনাটা বলি। বলে আমার খুব ভালোও লাগে যে এখনও আমার খুব মনে আছে, আমি ঠিক বলতে পারছি — এইটুকু আমার আনন্দ।

আহসান : আচ্ছা, যূথিকাদি আপনার বয়স তো নব্বই পেরিয়ে গেছে —

যূথিকা : হ্যাঁ, বয়স আমার এখন বিরানব্বই।

আহসান : এই বিরানব্বই বছর বয়সে আপনি এখনও গানের চর্চার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং পুরোনো দিনের সেই জীবনের স্মৃতি আর গানের স্মৃতি মিলিয়ে *আজও মনে পড়ে* বলে একখানা [illegible]খপাঠ্য বইও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন। তো পেছনে ফিরে গান শেখার কলকাতা-পর্বের কথা কিছু বলুন।

যূথিকা : কলকাতায় এসে পেলাম জ্ঞানরঞ্জন সেনকে — তিনি আমাকে প্রথমে শাস্ত্রীয় সংগীত শেখাতেন এবং খুব ভালো গাইতেন, গলা খুব দরাজ ছিল, মিষ্টি গলা। কিন্তু তখন তো এই রকম রেডিও-টিভি এসব হয়নি, আর প্রোগ্রামও সেরকমভাবে কোনো হলঘরে মানে প্রোগ্রাম করতে গেলে হয় স্টার নয় তো ঐসব থিয়েটারের সব স্টেজে গাইতে হতো। এখন যেমন, রবীন্দ্রভবন আছে, তখন এতোটা চর্চা ছিল না যে তিনি পপুলার হবেন। আমাকে শেখাতেন খুব দরদ দিয়ে, আর খুব স্নেহ দিয়েছেন মানে আমাকে একদম ভাইয়ের মতো করে নিজের বোন, ছোট বোন এরকমভাবে শেখাতেন। তিনিই একদিন বলেছিলেন আমার বাবার কাছে যে, 'সত্যেনবাবু, আমার সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের খুব বন্ধুত্ব। কাজী নজরুল ইসলামকে আমি যখনই বলবো 'আসুন', তিনি সেই কথাটা কোনো দিন ছেড়ে দেননি — সঙ্গে সঙ্গে আসতেন। তা এখন কাজী নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির সর্বেসর্বা। তিনি লেখক, কবি এবং গায়ক, নির্দেশক সবকিছু — অধিকর্তা, মানে গ্রামোফোনে কাকে নেওয়া হবে, কী করা হবে — এ সমস্ত তিনিই করেন।' তা জ্ঞানবাবু বললেন, 'কাজীদা গ্রামোফোন কোম্পানির অধিকর্তা এবং লেখক — সবকিছুর গুণ তাঁর আছে। তিনি এখন সর্বেসর্বা।' বাবা বললেন, 'আমার তো অনেক — অনেকদিনের সাধ রেণুর রেকর্ডের গান হোক। আপনি একটু যদি করে দেন, তাহলে বড়ো ভালো হয়। ওর গানটা একটু শোনান না!' তো উনি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আমরা রবিবার রবিবার যেতাম — বরানগরে থাকতেন তিনি। তা বললেন যে, 'ঠিক আছে, আমি এরপরের সপ্তাহে নিয়ে আসবো তাঁকে।' তা আমরা পরের সপ্তাহে যখন গেলাম, দেখি কাজীদা বসে আছেন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেখানে আমাদের আগেই চলে গেছেন।

আহসান : রিহার্সেল রুমে?

যূথিকা : না, এটা জ্ঞানবাবুর বাড়িতে। তখন আমি গ্রামোফোন কোম্পানিতে ঢুকিনি। আমি তখন শিখছি সবে। আমি জ্ঞানবাবুর কাছে শিখেছি, ভীষ্মদেবের কাছে তখনও যেতে পারিনি — ওনার কাছে শিখেছি, কমল দাশগুপ্ত — ওনার কাছে শিখেছি। আমার রেকর্ডের প্রায় সমস্ত সুর কমল দাশগুপ্তের। কাওয়ালি, ম্যাড্রাসি গান, তামিল, উর্দু এসমস্ত — হিন্দি, ভজন — সব ওনার সুর, উনি এতো সুন্দর সুর দিতেন যে আমি আর অন্য কোনো ট্রেনারের কাছে যাইনি, ওনার কাছে ছাড়া।

আহসান : আচ্ছা, আমরা কাজী নজরুল ইসলামের কথায় ফিরে আসি আবার।

যূথিকা : কাজীদা আমার গান শুনে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্রুভ্ করলেন যে, 'হ্যাঁ, যূথিকার গান হবে। এই আমি অ্যাপ্রুভ্ করছি। আমিই ওকে আগে শেখাব' — এই বলে উনি নিজেই দুটো গান লিখলেন — 'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা' এই গানটা — আরেকটা ঠিক মনে করতে পারছি না। আর নিজেই তিনি সুর দিলেন, আমাকে শেখালেন, তারপরে রেকর্ডও হলো। কিন্তু কোনো কারণে সেই রেকর্ডটা আর রিলিজ হলো না। সেই রিজেক্টেড রেকর্ডটা গ্রামোফোন কোম্পানিতে ছিল। তার পরের বছর — কমল দাশগুপ্ত নতুন ট্রেনার — উনি তখন টুইন বলে একটা কোম্পানিতে কাজ করতেন — কমল দাশগুপ্তকে এরকম বলা হলো যে, আমাকে তো কাজীদা অ্যাপ্রুভ্ করে দিয়েছেন আর ওনার কাছে একটা গান রেকর্ড করেও সেটা প্রকাশিত হলো না এবং আমাকে তখন আর ডাকা হয়নি। আর কমল দাশগুপ্তকে পরের বছর বলা হলো, 'আপনি পাঁচজন শিল্পীকে আপনার চয়েসে ডাকুন। আর আপনার যাকে ইচ্ছে, যার রেকর্ড হয়ে গেছে তাকেও ডাকতে পারেন বা যার হয়নি — নতুন কোনো আর্টিস্টকেও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুলতে পারেন। এইসব আর্টিস্টের একজনও যদি আপনার হাতে পপুলার হয় — এই রেকর্ডে যদি পপুলার হয়, তাহলে আমরা আপনাকে এইচএমভি-তে তুলে নেব, আপনি তখন এইচএমভি-তে ট্রেনার হবেন। ওটা একটু ফার্স্ট স্টেজের। ওখানে আসবেন।' তখন যারা যারা এসেছিল, যেমন — হরিমতী, কমলা ঝরিয়া, তারপর ছেলেদের মধ্যেও কেউ কেউ।

আহসান : টুইন তো এইচএমভিরই সিস্টার কনসার্ন, কিন্তু সস্তা দামের রেকর্ড বের করতো টুইন।

যূথিকা : হ্যাঁ, সস্তা। শিখলে হবে — একটা ভবিষ্যৎ আছে, তখন হয়তো তৈরি হয়নি, কিন্তু ছেড়ে দিতো না। তখন যে তৈরি হয়নি, তাকে চান্স দিতো ঐ টুইন রেকর্ডে। তো কমলদাকে বলা হলো, আমার ঐ রিজেক্টেড স্যাম্পল নিয়ে আমি নিজে ওনার সামনে যাইনি, যাই হোক ঐ রিজেক্টেড স্যাম্পলটা শুনে উনি বললেন যে, 'একে আমি নিলাম।' হরিমতী — তারপর আর কে কে ছিল আমার মনে নেই। আর বাড়িতে তখন ভগবতীবাবু — গ্রামোফোন কোম্পানির অধিকর্তা — উনি নিজে এসে বাবাকে বলে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন সেখানে কমল দাশগুপ্তের কাছেই আমি প্রথম রেকর্ড করি — 'আমি ভোরের যূথিকা' আর 'সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে'। এ গান দুটো খুব পপুলার হয়েছিল।

আহসান : তাহলে আপনার প্রথম রেকর্ড হয়েছিল 'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা' — নজরুলের এই গানটি — কিন্তু যে কোনো কারণে হোক রেকর্ডটি রিলিজ হয়নি। এই 'ভোরের যূথিকা' —

যূথিকা : হ্যাঁ, 'ভোরের যূথিকা' আর 'সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে' — এটা প্রণব রায় লিখেছিলেন এবং আমার এই ফার্স্ট রেকর্ডে কমল দাশগুপ্ত সুর দিয়েছিলেন।

আহসান : সাল-তারিখ কি মনে পড়ে?

যূথিকা : হ্যাঁ, ১৯৩৪ সাল। '৩৩ সালে আমি [illegible]জীদার কাছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিখতাম, তারপরে — হ্যাঁ, '৩৪ সাল।

: তো এই গান বেরুনোর পর কেমন সাড়া পড়েছিল সেই কথা আপনার স্মৃতি হাতড়ে যদি বলেন!

: হ্যাঁ, সে গান খুব পপুলার হয়েছিল। তার মধ্যেও কাজীদার একটা অবদান আছে। তখন রেকর্ড কোম্পানিগুলোর কলকাতায় প্রচুর ডিলার ছিলেন। আর প্রতি মাসেই রেকর্ড হতো যাঁদের হওয়ার কথা — যাঁরা শিল্পী হয়ে গেছেন — তাঁদের, নতুন যাঁরা আসতেন — তাঁদেরও হতো। আর সমস্ত রেকর্ড একটা একটা করে ডিলাররা এসে নিয়ে যেতো, এবং যার যেটা বিক্রি হতো না সেটা ফেরত যেতো আবার কোম্পানিতে — এরকমভাবে নিয়মটা ছিল। কিন্তু আমার যখন 'ভোরের যূথিকা' রেকর্ডটি হলো, তখন ডিলাররা এসে আর-সব রেকর্ড নিলেন, কিন্তু আমার রেকর্ডটা নিলেন না — বললেন, 'না, গান একেবারে সোজা সোজা — এ গান কেউ কিনবে না, পছন্দ করবে না। এ সুর কী রকম — এতো অন্যরকম মানে যে রকম ক্ল্যাসিকাল ওরা চায়, অতোটা ক্ল্যাসিক্যাল ভাব এতে নেই। এটা বিক্রি হবে না।' ওরা কেউ কিনবে না — সেইসব ডিলার। কাজীদা ওখানে ছিলেন, ওখানে বসে ছিলেন। উনি বললেন যে, 'কেন কিনবে না?' কাজীদা খুব রেগে গিয়েছিলেন। 'কেন তোমরা রেকর্ড নেবে না? তোমাদের যদি বিক্রি না হয় তাহলে আমাদের তো সেটা ফিরিয়ে দিতে পারো। তার জন্যে তো আমরা বলছি না যে, না, এটা তোমাদের কাছেই থাকবে! তোমরা যদি যূথিকার রেকর্ড না নাও তাহলে আমি কোনো রেকর্ড তোমাদের দেবো না।' এরকমভাবে কাজীদা সেই ডিলারদের মত করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রেকর্ড যখন বেরুলো — ছ'মাসের মধ্যেই হিট হয়ে গেলো। হিট হতেই কমল দাশগুপ্ত এইচএমভির পার্মানেন্ট হয়ে গেলেন। আমিও ঢুকে গেলাম — আমারও স্থান হয়ে গেলো, সেইখান থেকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আহসান : মানে আপনার জয়যাত্রা শুরু হলো।

যূথিকা : শুরু হলো, হ্যাঁ। মানে এই যে বাবার যে ইচ্ছে, সেই ইচ্ছাটা আমি পূরণ করতে পেরেছি।

আহসান : আপনার সময়ে বা আপনার আগে যাঁরা গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে জড়িত ছিলেন শিল্পী হিসেবে, তাঁদের কার কার গান আপনার খুব ভালো লাগতো, প্রেরণা পেতেন — সেইরকম কয়েকজন শিল্পীর কথা যদি বলেন।

যূথিকা : দেখুন, আমাদের মতো ঘরের মেয়েরা তখনও যেতো না, তখনও আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতী — এরাই কিন্তু গাইছে। আমি যখন প্রথম যাই, তার আগে কমল দাশগুপ্তের বোন এসেছিলেন। কিন্তু একটা না দুটো গান করে তার বিয়ে-থা হয়ে গেলো, তারপর বাইরে চলে গেলেন। কিন্তু এরপরে আমি প্রথম ওখানকার শিল্পী এবং তারপরে আমার প্রথম গান 'সাঁঝের তারকা' যখন খুব হিট করলো তখন আমার মতো সব মেয়েরা ওখানে ঢুকতে আরম্ভ করলো। তারপর ছেলে — এই জগন্ময়, হেমন্ত, সত্য চৌধুরী — এরা তখন শুরু করলো। আর এদের মধ্যে আমি ছিলাম ওখানে সব থেকে সিনিয়র। তখন আর যারা আসতো তাদের কীরকম — খুব একটা শেখেনি, কিন্তু আমার ভালো লাগতো রেণুকা ভৌমিকের গলাটা। ভালো লাগতো পারুল কর — তার গলাটা একটু মোটা — তাহলেও ওকে কমল দাশগুপ্তই সব সুর করে দিতেন।

আহসান : কমলা ঝরিয়া?

যূথিকা : কমলা ঝরিয়া খুব ভালো লাগতো। কমলা ঝরিয়ার গানও আমি তখন শিখতাম। ওর ঠুমরি তালের যেসব গান বেরুতো, আমি ঐ রেকর্ড কিনে কিনে সব শুনতাম — ওর গান রামপ্রসাদী, কীর্তন — আর ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা এদের গানও শিখতাম। ওদের গানও আমার ভালো লাগতো।

আহসান : আপনি কি কে. মল্লিককে দেখেছেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যূথিকা : হ্যাঁ, কে. মল্লিককে দেখেছি।

আহসান : ওর গান সম্পর্কে কিছু বলুন না!

যূথিকা : হ্যাঁ, উনি আগমনী, রজনীকান্তের গান, অতুলপ্রসাদ — এসব গানই গাইতেন এবং সেই প্রথম থেকেই আমরা যখন দেশে থাকি — সেনহাটিতে, তখন আমার ঠাকুরদা থেকে আরম্ভ করে বাবা এঁরা সব ওঁদের গানই কিনতেন। ওঁর [কে. মল্লিক] গলা আমার খুব ভালো লাগতো — পরিষ্কার গলা, মিষ্টি গলা। ওনার কাছ থেকেই আমরা ভাব পেয়েছি — ঐসব গান করতাম খুব। কে. সি. দে — কে. সি. দের গলার তো আর তুলনা করা যায় না। কে. সি দের কীর্তন-টির্তন অপূর্ব। আব্বাসউদ্দীন — আব্বাসউদ্দীনের গান — আব্বাসউদ্দীন যে ভাটিয়ালিগুলো গাইতেন — অপূর্ব!

আহসান : ওঁর ভাওয়াইয়া?

যূথিকা : হ্যাঁ, দারুণ, দারুণ।

আহসান : সেই সময়টা তো ছিল বাংলা গানের স্বর্ণযুগ — তাই না!

যূথিকা : হ্যাঁ —

আহসান : আপনি অনেক গীতিকারের কথায় এবং অনেক সুরকারের সুরে গান করেছেন। তো সুরকারদের মধ্যে আপনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন কার নির্দেশনায় গান করতে?

যূথিকা : তখন সুরকার ছিলেন যেমন পঙ্কজ মল্লিক, যদিও আমাদের কোম্পানিতে নয় — তাহলেও পঙ্কজ মল্লিকের সুরটা আমার ভালো লাগতো। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় যে বাংলা গানগুলো করেছেন তা তো অপূর্ব। তখন ভীষ্মদেবের গান আমি গাইতে পারতাম না — মানে সবে গেছি শিখতে। আর সুরকার বলতে দুর্গা সেন, কমল দাশগুপ্ত। কমল দাশগুপ্তের কাছে আমি যেভাবে সুর পেয়েছি, আমার কিন্তু তখন মনে হতো যে আমি একটা নতুন কোনো সুরের রাস্তায় গিয়েছি। মানে আগের সুরটুর সেখানে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেই, এটা নতুন ধারায় মনে হচ্ছে যেন একটা নতুন জীবন পেলাম। এরকম আমার মনে হতো। আমার যতো গান — যতো রেকর্ড আমি করেছি প্রায় সবই কমল দাশগুপ্তের সুরে। এবং কাজীদার সুরে কিছু আছে। কাজীদার সুরটাও আমার খুব প্রিয়। তিনি না হলে তো আমি ওখানে ঢুকতেই পারতাম না। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। কেননা সেখানে না ঢুকলে আজ আমি এখানে দাঁড়াতে পারতাম না। আর সুর আমার ভালো লাগতো কে. সি. দে, মৃণালকান্তি ঘোষ, জগন্ময় মিত্রের।

আহসান : আর রাইচাঁদ বড়াল?

যূথিকা : রাইচাঁদ বড়াল খুব ভালো সুরকার। ওনার মিউজিকটা আমার খুব ভালো লাগতো। সিনেমা দেখতে যেতাম যখন, তখন যে মিউজিকটা বাজাতো — অপূর্ব! ওরকম মানে ঠিক যে ভাব যে ধারায় যাবে সেই জিনিসটা উনি সেই মিউজিকের মধ্যে ফোটাতেন আর যে ক'টি হ্যান্ডস্ বাজাতো, তার তুলনা নেই। সে-সমস্ত সুর আর সেরকম সুন্দরভাবে বাজানো এখন পর্যন্ত শুনিনি।

আহসান : অনেকের লেখা গানই তো আপনি গেয়েছেন। অনেক গীতিকবির বাণী আপনি সুরের ভেতর দিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন শ্রোতাদের কাছে। তো গীতিকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপনার ভালো লাগতো কার বা কাদের গান করতে?

যূথিকা : কাজীদার লেখা গান আমার খুব ভালো লাগতো। তবে শেষের দিকে কাজীদা নিজেই এসে কমল দাশগুপ্তকে অনেকগুলো গান দিয়ে বলতেন, 'তুই — এই যতো শিল্পী এসেছে নতুন নতুন — যাকে ইচ্ছে — যাদের ইচ্ছে তুই তাদের দিবি — আমি গান লিখে দিলাম, এবার তুই সুর দে।' উনি নিজেই সুর দিতেন। আর কাজীদার সুর তো অনেক রকম আছে, ওঁর তো তুলনা নেই, ওনার সঙ্গে আমি কাউকে যোগ করছি না। কাজীদা, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, তারপর আরো ছিল মোহিনী চৌধুরী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আহসান : অজয় ভট্টাচার্যের গান কি করেছেন আপনি?

যূথিকা : না।

আহসান : সুবোধ পুরকায়স্থ?

যূথিকা : হ্যাঁ, সুবোধ পুরকায়স্থ করেছি।

আহসান : তা, এই যে কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্য যাঁদের গান করেছেন তাঁদের মধ্যে বাণী-ভাব এসব মিলিয়ে কার লেখা গান আপনার বেশি পছন্দ হতো?

যূথিকা : তখন তো আধুনিক গানটাই বেশি চলতো। তা সেখানে আমার প্রণব রায়ের গানটা সব থেকে ভালো লাগতো।

আহসান : তাহলে কাজী নজরুল ইসলামকে আপনি সবার উপরে স্থান দিচ্ছেন?

যূথিকা : হ্যাঁ, কাজীদা তো সম্মানের — আমি দিচ্ছি না, সকলেই দেয়। রবীন্দ্রনাথ-কাজী নজরুল — ওঁরা সমান সমান হতে পারেন। কিন্তু কাজীদার সঙ্গে এঁদের তুলনা হয় না। এঁরা তো কাজীদা-রবীন্দ্রনাথের কথা নিয়েই গান লিখেছেন। এঁরা সব লেখেন — সুন্দর গান লেখেন, কিন্তু প্রণব রায়ের মতন না। এই যে, 'ভোরের যূথিকা' — সাধারণ লোকে লিখলে কী হতো জানি না! প্রণব রায় সত্যিই খুব সুন্দর গান লিখেছেন, অনেক সুন্দর সুন্দর গান লিখেছেন। আর যখন গানটা সুন্দর লেখা হয়, সেখানে সুরটাও স্বাভাবিক সুন্দর হয়।

আহসান : আপনার মতানুসারে নজরুলকে সবার উপরে রেখেই এ-বিষয়ে কথা বলছি। তো আপনার প্রিয় সুরকার কমল দাশগুপ্ত এবং প্রিয় গীতিকার প্রণব রায় — এ দু'জনেই খুব বন্ধু ছিলেন এবং দু'জনের মধ্যে ভারি ভাব ছিল এবং দু'জনেরই এ বছর (২০১১) জন্মের একশো বছর পূর্ণ হলো — জন্মশতবর্ষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এঁদের দু'জনের কাউকে নিয়েই কেউ কোনো কিছু লিখলেনও না, কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজনও করলেন না, স্মরণও করলেন না! এই বিষয়ে আপনি কিছু বলুন — আপনার কী বক্তব্য?

যূথিকা : এটা খুব দুঃখের বিষয় যে, এতো বড়ো একজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুরকার কমল দাশগুপ্ত, এতো বড়ো একজন নির্দেশক — এতো সুন্দরভাবে শেখাতেন, যে-কোনো শিল্পীকে মানে যে রকমেরই গলা হোক না কেন — তিনি তাকে ঠিক পপুলার করে দিতেন একটা গানেতেই। আবার একজন ট্রেনার হতে গেলে যতো রকম তার গুণ থাকা দরকার সবকিছু ছিল কমল দাশগুপ্তের। সেই কমল দাশগুপ্তের নাম কিন্তু আমি শুনি না। এতো লোকের নাম করে, এতো লোকের স্মৃতি রাখছে — দ্যাট ইজ অল রাইট, কিন্তু কমল দাশগুপ্তের কথা কেউ বলেও না, আর কেউ একটা কিছু তাঁর স্মৃতি রাখার চেষ্টাও করে না — সেটা কিন্তু ঢাকাতেও হয়নি, আমার যা মনে হয়। ঢাকায় যে তিনি চলে গেলেন, সেখানেও কিছু হয়নি। আর আমাদের এইখানে তাঁর জন্ম তাঁর জায়গা, নিজে এখান থেকে উঠেছেন — এই যে এতো বড়ো দান তিনি করে গেছেন — তাঁর এতোখানি দান, সেটাকে কেউ একটু মনে করে না! আর এটা আমি এখন হা-হা করে বললে তো তা ঠিক হয় না। যাঁরা উপরআলা, যাঁরা গান বিচার করেন, যাঁরা গান নিয়ে চলেছেন একেবারে শীর্ষে, তাদের কারো মুখে কিন্তু কখনও আমি শুনিনি এঁর নাম। সেটা আমার খুব একটা বড়ো দুঃখ আছে।

আহসান : প্রণব রায়েরও তো এবারে এই বছর জন্মশতবর্ষ। তাঁকে নিয়েও তো কিছু হলো না!

যূথিকা : প্রণব রায়ের জন্মদিন একটা হয়েছিল কিছুদিন আগে। আমার কাছে আসেনি।

আহসান : যূথিকাদি, আপনি আমাদের পুরোনো দিনের কথা কিছু বললেন, গানের জগতে কীভাবে এলেন সে-কথা জানালেন, এসব কথার খেই ধরে আমরা আপনার মুখ থেকে আরো কিছু শুনতে চাই। সেকালে এইচএমভি তো সাহেব কোম্পানির ছিল, তার পাশাপাশি বাঙালিরাও গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির কোম্পানি গড়ে তুলেছিলেন। আপনি কি বরাবর এইচএমভি-তেই গান রেকর্ড করেছেন, না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্য কোনো কোম্পানি থেকেও ডাক পড়েছে?

যূথিকা : না। প্রথম থেকেই আমি এইচএমভি-তেই আছি বরাবর। অন্য কোনো কোম্পানিতেও আমি যাইনি — যাওয়ার দরকারও হয়নি। এখানে যে ট্রেনার আমি পেয়েছি। কাজীদার গান, আরো ভালো ভালো লেখকের গান — আমার প্রাণটা ভরে গিয়েছিল। আর কোথাও যাবার দরকার হয়নি।

আহসান : মেগাফোন, হিন্দুস্তান রেকর্ড, সেনোলা বা পাশাপাশি আরো দু'একটি বাঙালি রেকর্ড কোম্পানিও তো গড়ে উঠেছিল, তাঁরা কি আপনাকে কখনো আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অথবা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন গান রেকর্ড করার জন্যে?

যূথিকা : একবার হয়েছিল, প্রথম যখন আমি গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান করলাম। কাজীদার গান আমি প্রথম করেছিলাম, কিন্তু সেটা যখন রিজেক্ট হলো, কোনো কারণে বের হলো না, আমাকে তখন একটা বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেইসময় আমাকে 'হিন্দুস্তান' থেকে ওরা খুব ডেকেছিল। 'হিন্দুস্তানে' আমার যাওয়া যখন প্রায় ফাইনাল, কন্ট্রাক্ট সই করবার দিন হঠাৎ দেখি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে ভগবতীবাবু [ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য] — উনি ওখানকার সর্বেসর্বা, — তিনি আমার বাড়িতে এসে সেটা ক্যান্‌সেল করে আমাকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে নিয়েছিলেন।

আহসান : আসলে আপনাদের কালের ভদ্র-শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা সাধারণত মঞ্চে অভিনয়ও যেমন করতেন না, বাইরে গানও করতেন না কিংবা গ্রামোফোন রেকর্ডে গান দেওয়ার ব্যাপারটিও ছিল না। একটা বিশেষ জায়গা থেকে শিল্পীরা আসতেন। তো আমরা দেখলাম যে, যূথিকা রায় মানে আপনি, প্রতিভা সোম পরে যিনি বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে প্রতিভা বসু নামে পরিচিত হন — এরকম দু'চারজনকে দেখি যে, ভদ্র-শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে — তাঁরা রেকর্ডে গান দিলেন। যুগটা তো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্যরকম ছিল — এই যে একটা ব্যাপার এ সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

যূথিকা : না, তখনকার দিনটা ছিল যে, ভদ্রঘরের মেয়েদের গান কেউ ঘরে বসে শুনতে পারে, কিন্তু তারা গাইবে না তো গলা ছেড়ে, কোথাও বাইরে তো গাইবেই না এবং পড়াশোনাও কিছু শিখতে পারবে না — এটা একটা খুব জটিল ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমার মা এ বিষয়ে কিছুই মানতেন না। উনি বলতেন যে, 'মেয়েরা গান শিখবে না, পড়াশোনা কিছুই শিখবে না, শুধু অল্প বয়সে তাদের বিয়ে হয়ে যাবে যে সংসারই করবে, তাহলে কোনো দিন আমাদের সমাজের উন্নতি হতে পারে না।' পড়াশোনা আমাদের গ্রামের থেকেই আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশে যখন ভালো স্কুল হয়েছে — 'প্রতিভাময়ী বালিকা বিদ্যালয়' — সেই স্কুলে তিনি আমাদের ভর্তি করে দিয়েছেন।

আহসান : সেটা কোথায়?

যূথিকা : সেনহাটিতে — খুলনার সেনহাটিতে। সেখানে ছেলেদের স্কুলে — সব ছেলেরা হাইস্কুলে তারা পড়তো, তারা পাশ করতো — সবকিছু। কিন্তু আমাদের দেশে — সেনহাটিতে 'প্রতিভাময়ী বালিকা বিদ্যালয়' থাকা সত্ত্বেও কোনো মেয়ে যেতো না, সেটা ফাঁকাই পড়ে থাকতো। কিন্তু আমরা যখন সেনহাটিতে গেলাম, তখন মা এরকম দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমাদের গ্রামের যাঁরা মোড়ল ছিলেন, যাঁরা কর্তা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁকে অসম্ভব তর্ক করতে হতো। তাঁরা বলতেন যে, 'না, মেয়েরা বাইরে যেতে পারবে না, গাইতে পারবে না।' আমি গাইতাম — বাইরে কোনো ফাংশন হলে আমাকে যেতে দেবে না — এই করে করে একেবারে মৃত করে রেখেছিল আমাদের গ্রামটাকে। কিন্তু মা সেকথা শোনেননি। তিনি আমাকে, আমার দিদিকে, আমার ছোটবানকে গ্রামের ঐ 'প্রতিভাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে' ভর্তি করে দেন। মাকে অনেক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপ্রিয় কথা শুনতে হয়েছে, তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভর্তি করলেন জোর করে — ঐ রকম অপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও। তাছাড়া তিনি সমস্ত গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকল মাকে বোঝাতেন — তাদের বাড়িতেও আমাদের মতো সব মেয়েরা ছিল। তাদের বোঝাতেন যে, 'তোমরা এইরকম করে চুপ করে থাকবে না। তোমরাও মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখাও, তা না হলে তাদের উন্নতি কী করে হবে?' এই করে মা সমস্ত বাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে নিয়ে নিজেই গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। গ্রামের যিনি মোড়ল ছিলেন — কর্তা ছিলেন, তাঁর মেয়েকে তিনি আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেলো তাঁর মেয়েও আমাদের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এভাবে আমারও একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে গ্রাম সম্বন্ধে। এখনও আমি সেই ঘটনাগুলো ভুলতে পারিনি। আমি যখন গাইতাম — বাড়িতে গাইতাম, সকলেই শুনতে আসতো, বাড়ি ভরে লোক হয়ে যেতো। একদল যেতো, আবার ফিরে আরেক দল আসতো। আমাকে এই গান গাওয়ার জন্য মাঝিরা পর্যন্ত চিনে গিয়েছিল। মাঝিরা নৌকাতে উঠলে বলতো, 'দিদি তুমি গান শুরু করো' — এরকম। আবার একবার আমরা ট্রেনে করে আসছি, কলকাতা থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছি। তখন আমার বাবা আমাদের সঙ্গে ছিলেন না। আমার ঠাকুমা অসুস্থ, বাবা তাই তাঁকে দিল্লিতে দেখবার জন্য গিয়েছিলেন। এতোগুলো সন্তানকে নিয়ে মা একলাই যাচ্ছিলেন। তা সেখানে হঠাৎ আমার পরিচিত একজন আমাকে দেখে বললেন, 'এই তো আমাদের রেণু এখানে আছে। টাইমটা খুব ভালো করে কেটে যাবে। এই রেণু, তুই একটা গান কর্।' আর আমিও এমন ছিলাম, কেউ যদি আমাকে গান গাইতে বলতো সেইসময় — আমি খালি গলায় একটার পর একটা গান গাইতাম। আমার এটাতে নিজেরই একটা আনন্দ ছিল। আর তারাও খুব খুশি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হতো। আমরা তখন আসছি ট্রেনে করে, কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছি — আর মা খুব চিন্তা করছেন, 'আমি এতোগুলো বাচ্চা নিয়ে, জিনিসপত্র নিয়ে কী করে দৌলতপুর স্টেশনে নামবো!' আর দৌলতপুরে একটু সময় থামে, বেশিক্ষণ থামে না, একটা ভীষণ আতঙ্ক-ভাবনা এই নিয়ে। মা সারা রাস্তা চিন্তা করতে করতে আসছে। আর আমরা সব বাচ্চা ভাইবোনেরা জানলার কাছে বসে দেখছি যেই স্টেশন আসছে, চা কী করে বিক্রি করছে — এসব নিয়ে খুব আনন্দ করছি। আমাকে দেখে আমার পরিচিত এক পিসি বললেন, 'রেণু, একটু গান করো আমরা শুনি, দেখো সময়টা কাটছে না।' তা আমি তো গান ধরে দিয়েছি। স্টেশনে সবে থামছে, আস্তে আস্তে গাড়িটা ঢুকছে — আমি গান গাইছি — আমি তখন বেশ জোরেই গাইতাম। প্রথম গাইতে গাইতে গলা ভারি হয়ে যায়, জোর কমে যায়, জোর থাকে না। কারণ ওখানে খুব চেঁচিয়ে গাইতে হয়। তা আমি গান ধরেছি এমনই জোরে, খালি গলায় তখন খুব জোর ছিল — আমি যখন থেকেই গাইছি তখন থেকেই যিনি গার্ডসাহেব — গাড়িতে থাকেন, ইনচার্জ যিনি, পতাকাও ওড়ান, তারই নির্দেশে গাড়ি ছাড়ে, এরকম — আমাকে গাইতে দেখে একটু দাঁড়িয়ে থেকে অন্য কামরায় চলে গেলেন। পরের স্টেশনে যখন থেমেছে গার্ডসাহেব আমাদের গাড়িতে ঢুকেছেন। ঢুকে সকলকে জিজ্ঞেস করছে, 'কে গাইছিল গাড়িতে?' তখন সকলেই আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, 'এই যে রেণু গাইছিল।' তা বলছে, 'আমি একটা গান শুনে তারপর গাড়ি ছাড়বো।' তখন মা বললেন, 'গাও'। আমি তখন গাইতে শুরু করলাম। পুরো গান শুনে উনি চলে গেলেন। আর মা আবার তাকে একটু জানিয়েছিলেন, 'আমি একলা একলা যাচ্ছি এতগুলো বাচ্চা নিয়ে, আপনি একটু দেখবেন দৌলতপুর স্টেশনে যেন আমরা ঠিকমতো নামতে পারি।' তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি কিচ্ছু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাববেন না' বলে তিনি গাড়ি ছেড়ে দিলেন। তারপর যখন দৌলতপুর স্টেশন আসলো, আমরা নামতে না নামতেই গার্ডসাহেব আমাদের কামরায় এসে ঢুকলেন। বললেন, 'মা, আপনি কিচ্ছু তাড়াতাড়ি করবেন না। আপনি আগে নামুন — তারপর সকলে জিনিসপত্র নিয়ে নামলে তবেই আমি সবুজ পতাকা ওঠাবো।' মাকে অনেক সাহায্য করলেন, সব জিনিস ধরে নামিয়েও দিলেন। আমার খুব মনে আছে সেই স্টেশন-গার্ডটার কথা। আমরা খুব নিশ্চিন্তে নেবে গেলাম। গার্ডসাহেব সবুজ পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

আহসান : বেশ মজার ঘটনা যে গান গেয়ে মুশকিল আসান হলো। যাই হোক — আমরা একটু জানতে চাইছি, যে সময়ে আপনারা গান করতেন — বিশেষ করে গ্রামোফোনে গান দিতেন — সেই সময়ে তো ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া — এঁরা গান করতেন, আরো আশ্চর্যময়ী, বেদানা দাসী, হরিমতী এরকম নানা শিল্পী ছিলেন, তাঁরা তো একটু ভিন্ন পাড়া থেকে আসতেন — তো এঁদের সঙ্গে কী আপনার কোনো কথাবার্তা হতো কিংবা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এই গানের ভেতর দিয়ে?

যূথিকা : না, সেটা হতো না। কারণ এ বিষয়ে মা খুব কনজারভেটিভ ছিলেন। মা যখন আমাকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে দেন ভগবতীবাবুর কাছে, এরকম কথা নিয়েছিলেন যে, 'আমার মেয়ে যখন যাবে তখন সে ঘরে আর কেউ থাকবে না। সেখানে শুধু ট্রেনার থাকবে আর অধিকর্তা থাকতে পারেন আর যিনি লিখেছেন গান ইনি থাকবেন আর সঙ্গে যাঁরা যাবেন — যে যাবে ওর ভাই কি বোন, তাকেও ওর সাথে রাখতে হবে। ওকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবেন, আবার গান হয়ে গেলে এক মিনিট দেরি না করে ওকে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরিয়ে দেবেন।' এরকমভাবে আমাদের যাতায়াতটা ছিল। আর প্রথম থেকে যাঁরা গাইছেন, মানে আলাদা জায়গা থেকে এসেছেন তাদের সঙ্গে যেন কোনোরকম মেলামেশা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না হয় — নিষেধ ছিল। তা আমরা সেরকমভাবেই চলেছি। যতো বছর গান করেছি এটা কিন্তু ভগবতীবাবু একদম মেনে চলেছেন। আমার গানের ঘরে কাউকে যেতে দিতেন না। আমার কেন — আমাদের মতন ঘরের যারা যেতো তাদের ঘরেও কাউকে যেতে দিতেন না — ওরকম ট্যাক্সি করে তাদেরও নিয়ে আসা হতো, দিয়ে আসা হতো। আর কমলবাবু তো একেবারে অসম্ভব স্ট্রিক্ট ছিলেন এ বিষয়ে। তিনি যখন গান শেখাতেন বা তোলাতেন অর্কেস্ট্রার সঙ্গে — যখন আমরা গান করতাম, তখন হয়তো একজন শিল্পী এসে গেছে — আমার তখন গান শেষ হয়েছে — তার সঙ্গে পর্যন্ত আমি কথা বলতে পারবো না। হয়তো আমার গান শেষ হওয়ার সময় জগন্ময় এসেছেন, কিন্তু একদিনের তরে এক মিনিটের জন্যেও মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে দিতেন না। একদম কথা বলতে দিতেন না। আমরা এইরকমভাবে সারাজীবন — যতোদিন আমার সংগীতজীবনে গ্রামোফোন কোম্পানিতে ছিলাম ততোদিন পর্যন্ত এই যে, ভগবতীবাবু আমার মাকে যে কথা দিয়েছিলেন, সেটা রেখেছিলেন।

আহসান : পরে কি কখনোই ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া বা কানন দেবী — এঁদের সঙ্গে আপনার কথা হয়নি, আলাপ হয়নি?

যূথিকা : যখন প্রণব রায় মারা গেলেন, তাঁর স্মৃতিসভায় সেখানে কানন দেবী ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা হলো। আবার এক জায়গায় হয়েছিল, বাইরের জগতে — যেমন এই কলকাতাতে একটা মিউজিক কম্পিটিশন হয়েছিল বাচ্চাদের, তা সেখানে তাঁরা আমাকেও জাজ করেছিলেন আবার আঙ্গুরবালাকেও জাজ করেছিলেন, আমরা একসঙ্গে সেখানে বসে কাজ করেছিলাম।

আহসান : সেখানে কি কথাবার্তা হয়নি?

যূথিকা : হ্যাঁ, কথাবার্তা হয়েছে। এই কেমন আছেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিদি' — এরকম কিছু কথাবার্তা। আমি তখন একটু ইয়ে ছিলাম, মানে বেশি কথাবার্তা বলতে পারতাম না। এখন যেমন বকবক করে যাই, তখন কিন্তু আমি একদম কথাবার্তা বলতাম না, মানে কী দিয়ে আরম্ভ করবো, যদি কিছু মনে করে! আমি খুব কম কথা বলতাম।

আহসান : না, অনেক সময় তো থাকে যে কোনো কোনো মানুষকে শ্রদ্ধা কিংবা স্নেহ কিংবা এমনি প্রীতির বশে মানুষের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে — তেমন কি কোনো শিল্পীর সঙ্গে গড়ে ওঠেনি?

যূথিকা : সেরকম হয়েছে — যেমন পারুল কর, ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। আমার বাড়ির পাশেই তার শ্বশুরবাড়ি। তারপর পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায় — তাঁর সঙ্গেও খুব ভাব ছিল, একসঙ্গে আমরা গান গাইতে যেতাম। এরকম রেণুকা ভৌমিক, তারপরে আরেকজন ছিল গায়ত্রী বসু — এঁদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল।

আহসান : এমনি শিল্পী হিসেবে ইন্দুবালা বা আঙ্গুরবালা বা কমলা ঝরিয়া বা কানন দেবী — এঁদেরকে কীভাবে — এঁদের গানকে কীভাবে আপনি বিচার করবেন?

যূথিকা : না, এঁদের গান তো আমি খুবই ভালোবাসতাম ছোটবেলায়। এঁদের গান শিখেই তো আমি দেখতাম যে ওঁরা কোথায় টানটা ছাড়ছেন, কোথায় আবার তারপরেই ধরছেন — এ জিনিসগুলো আমি খুব লক্ষ করতাম, ওঁদের রেকর্ড বাজিয়ে শুনে শুনে।

আহসান : যূথিকাদি, এবারে আমরা জানতে চাইবো, ফিল্মে প্লেব্যাক বলতে গেলে আপনি করেনইনি, — কিন্তু কেন?

যূথিকা : ফিল্মে আমার খুব একটা বেশি ইচ্ছে ছিল না। আমি অনেকদিন পর্যন্ত ফিল্ম লাইনটাকে আটকেছিলাম। এর কারণ আমি যে ভজন গানটা গাইতাম — সকলে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার এ ভজনটাকে নিয়েছিল। তারা যে খুব ভালোবেসেছিল, সেটা আমি বুঝতাম। যখন সেখানে প্রোগ্রাম করতে যেতাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন দেখতাম তাদের চোখের ধারায় জল পড়ছে আর আমার কাছে এসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতো। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সেই স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না। সেই যে ভাবটা — আমিও বোধ হয় অতোটা ভাবতাম না, ভজন গাইতাম। এই যে আমার শ্রোতারা যারা আসতেন তাদের ভাব দেখে আমিও এই ভজনকে অসম্ভব ভালোবাসলাম, অসম্ভব আমার প্রিয় ছিল। এই ভজন ছাড়া আমার কিছু গাইতেই ভালো লাগতো না। তখন যদি সিনেমাতে আমি গাই — আমাদের সিনেমার জগৎটা তখনো এতোটা অ্যাডভান্স হয়নি। তখন বেশির ভাগ ওখানে বাইজিদের গান-টান এসব করাতো। এমন একটা যে, সাধারণভাবে একে-ওকে দিয়ে গাইয়ে দিলো। সেইসব দেখে, আমি তো দেখতাম সিনেমা, সেসব দেখে আমার কোনোদিন ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিল না। এতো ভালো ভালো গানও ছিল না — তখন লতাও আসেনি। এতো সুন্দর মিউজিক ডিরেক্টর যাঁরা এসেছিলেন, পরে তাদের মতো ঐ সময় মিউজিক ডিরেক্টরও ছিল না — বাজে সাধারণ সুর দিয়ে তারা চালিয়ে দিতো। তাই আমি এই ভজনের ভাবটা যাতে নষ্ট না হয়, আমি ঠিক করেছিলাম যে আমি কোনোদিন ঐখানে গাইবো না। কিন্তু আমার সংগীতজীবনের যখন শেষসীমায় আমি এসেছি, আমার রেকর্ড করা যখন বন্ধ হয়ে এসেছে, প্রায় বন্ধ হবার মতো তখন দেবকী বোস — উনি বলে পাঠালেন। আমি বন্ধ করেছিলাম এই ভেবে যে, যে রেটটা সিনেমা জগতে আর্টিস্টরা পায়, যে টাকাটা পায়, আমি তা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি এটা ইচ্ছা করে করেছিলাম। শিল্পীরা কোনো স্যাম্পল পাবে না, তারা কোনো রয়্যালিটি পাবে না, তারা ঐ যে একবার যে সিনেমাতে যা পাবে তাই — সেইটিই শেষ তাদের। এসব জেনে আমি তখন আমার রেটটাকে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, যাতে আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাকে না বলতে হয় — আমি সিনেমায় গাইবো না, এটা না বলতে হয়। কিন্তু দেবকী বোস যাঁর ছবি আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি — যখনই তাঁর ছবি আসতো আমরা দেখতাম — তিনি এতো সুন্দর ছবি করতেন। তিনি আমাদের বাড়িতে বলে পাঠিয়েছিলেন — গ্রামোফোন কোম্পানিতে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, 'যূথিকা যে টাকা চায়, যেভাবে করতে চায়, সে গান ও করবে — আমি ঠিক ওর মতো করে সেই সিনটা করবো। ও যেন আমার 'রতনদ্বীপে' দুটো গান গায়।' তা আমি সেখানে গেয়েছিলাম, 'রতনদ্বীপ' হিন্দি ছবি — এটাতেই আমার প্রথম প্লেব্যাক।

আহসান : কোন সালে ছবিটি হয়েছিল?

যূথিকা : আমার ঠিক মনে নেই।

আহসান : অনুমান করে কি বলা যায়?

যূথিকা : হ্যাঁ, অনুমান হয়তো ষাট সালে।

আহসান : ষাট? মনে হয় ষাটের আগে হবে। কেননা দেবকী বসুর বাংলায় 'রত্নদ্বীপ' মুক্তি পায় ১৯৫১-তে।

যূথিকা : তাহলে পঞ্চাশ কি ষাট — ওর মধ্যেই।

আহসান : আচ্ছা, এ তো গেলো প্রথম ছবি। এরপরে যেসব ছবিতে আপনি গান গেয়েছেন, সেসব ছবি সম্পর্কে — গান সম্পর্কে যদি কিছু বলেন!

যূথিকা : যখন আমি সিনেমায় গাইছি — সেখানে দেবকী বোস যেইটা রেট করেছিলেন, সেইটা পরেও আমাকে দিয়েছেন — কেননা উনি কথা দিয়েছিলেন। আর এইখানে বাংলাতে আমি গেয়েছিলাম 'ঢুলি'তে। ঐ রাজেন সরকার সুর দিয়েছিলেন এবং গান লিখেছিলেন প্রণব রায়।

আহসান : হ্যাঁ, 'ঢুলি' তো চুয়ান্ন সালের ছবি। মনে পড়ে গানটির কথা?

যূথিকা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা মনে পড়ে, — 'এই যমুনারই তীরে মুরলি বাজিত যেথা রাধা রাধা সুরে'। আর ছিল একটা হিন্দি ভজন। ওটা মনে হয় মাধুর পণ্ডিতেরই লেখা, যতদূর আমার মনে হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আহসান : আচ্ছা, গানটার কথা মনে পড়ে?

যূথিকা : এই গানটা দরবারি কানাড়ার উপর সুর দিয়ে — এটা রাজেন সরকারই সুর দিয়েছিলেন। আর বোম্বেতে 'লালক্যর' বলে একটা বই হয়েছিল। তা সেখানে আমি দুটো গান গেয়েছিলাম। সে দুটোও ভজন — একটা শিবের স্তুতি কোরাসে, মানে সেটা কোরাসে ছিল। আর একটা ছিল ঐ ভজনই। আর মিউজিক ডিরেক্টর যিনি ছিলেন তিনি নতুন, আমার নামটা ঠিক মনে নেই। তিনি খুব নতুন — অল্পবয়েস, তিনি সুরটা খুব ভালো দিয়েছিলেন।

আহসান : এরপরে কি আর কোনো বাংলা বা হিন্দি ছবিতে আপনি গান গেয়েছেন?

যূথিকা : না, এরপরে আর গাইনি। এরপরে আমি গান বাইরে গাওয়াটাই প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। বাইরে এমনি ফাংশন করতাম। রেকর্ডও যেমন ছাড়লাম, তেমনি সিনেমাও ছাড়লাম। কারণ তখন গলা আস্তে আস্তে একটু নিচু হচ্ছে, ঠিক যতোটা গাইতাম — সেরকম হতো না। এটা ভেবে নিই যে এখন গানটা ঠিক হচ্ছে না। আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

আহসান : আপনার শেষ রেকর্ড কোন্ সালে বেরুলো?

যূথিকা : ছিয়াত্তর সালে, সেটা সাঁইবাবার ভজন। আমি বাহাত্তর সালে সাঁইবাবার কাছে গিয়েছিলাম। তারপর সাঁইবাবা আমাকে আমার ভজন শুনবার জন্য ডেকেছিলেন। আমাকে খুব আশীর্বাদ করেছিলেন — রত্নমালা দিয়ে, একটি কৃষ্ণমূর্তি দিয়ে, তারপর শাড়ি, বিভূতি — এসব দিয়ে আমাকে প্রচুর আশীর্বাদ করেছিলেন এবং বলেছিলেন 'আমি সবসময় তোমার কাছে আছি — আমি তোমার কাছে থাকবো, তুমি কোনো চিন্তা করবে না, তুমি অতো চিন্তা করো কেন? এসব চিন্তা করবে না, তোমাকে আমি সবসময় রক্ষা করবো।'

আহসান : সেই রেকর্ডটিই তাহলে শেষ রেকর্ড — সেটি বের হয়েছিল কোন্ কোম্পানি থেকে?

যূথিকা : গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আহসান : এইচএমভি?

যূথিকা : এইচএমভি। কারণ তখন গ্রামোফোন কোম্পানির অধিকর্তা যিনি ছিলেন, তিনিও সাঁইভক্ত। আমি সাঁইবাবার কাছ থেকে ফিরে এসে — ওখানে যে ভজন হতো — ঐ গানগুলো এইখানে যাঁরা ভক্ত তাঁদের কাছে শিখে শিখে বাড়িতে প্রতি বৃহস্পতিবার সেটা করতাম — মানে বাবার পুজোটুজো করতাম। যদিও আমরা দীক্ষিত বেলুড় মঠের — স্বামী বিরজানন্দের কাছে। তা সেখান থেকে — বেলুড় মঠ থেকে আমাকে খুব বাধা দিয়েছিল যে, 'তুমি মঠে ঠাকুরের নাম ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারো না। তা তুমি এইটা কেন এতো সাধনা করছো!' আমি তখন শুনে শুনে ঘরে প্রায় বারো বছর ধরে করে তারপর বন্ধ করেছি। সেটা আমার অসুবিধে ছিল, আমি বন্ধ করেছি।

আহসান : আচ্ছা, আমরা জানলাম যে ছিয়াত্তর সালে — ১৯৭৬-এ আপনার শেষ রেকর্ড বের হলো। এটি ভজনের — সাঁইবাবার ভজন।

যূথিকা : অতি সুন্দর সাঁইবাবার ভজনের সেই রেকর্ডটি। সেটা সাঁইবাবার যখন পঞ্চান্ন বছর বয়স — সেই বছরে আমাদের কমিটি থেকে ঐ ভজনের রেকর্ডটি সাঁইবাবার হাতে দিয়ে এসেছিল।

আহসান : এ তো গেলো আপনার ভজনের শেষ রেকর্ড। বাংলা গানের শেষ রেকর্ড করলেন কোন্ সালে?

যূথিকা : হ্যাঁ, কমল দাশগুপ্তের তখন সুরের খুব খরা — তিনি সুর করতে পারতেন না। তার একটা গলস্টোন ছিল। সেটা তিনি অপারেশন করলেন না। মানে তাঁর মা চাইলেন না, সেইজন্য তিনি সেটা অপারেশন করলেন না। তারপর থেকে তিনি আর সুর করতে পারতেন না কোনো। সোজাভাবে দাঁড়াতে পারতেন না — কাঁপতেন। আর সুর করার সময় তাঁর সেই নোটেশনগুলো, যেটা আমরা পেতাম — তারপর অন্য রকম হয়ে যেতো। সেজন্যে উনি নিজেই আমাদের গান রেকর্ড করা বন্ধ করেছিলেন। আমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন খুব ভালো টাইম। আমি ভালোভাবেই চলছি। এদেশ-ওদেশ ঘুরছি এই ভজন নিয়ে। তারপরে বাংলা গান চাইছে। তখন বন্ধ করতে বাবাও বারণ করলেন যে, 'তুমি এখনই বন্ধ করলে তোমার আর কোনো কাজ থাকবে না। এখনও তো তুমি ভালো করে গাইতে পারছো। তুমি একটা অন্য রাস্তা নাও।' কমল দাশগুপ্তের কাছে যখন গান করা বন্ধ হলো, গ্রামোফোন কোম্পানি তখন আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি যেই ট্রেনারই চাইবে, আমরা সেই ট্রেনারই দেবো।' কমল দাশগুপ্ত যখন পারবে না, তখন ওখানে আমি আর কাউকে আনতে পারিনি। আমি তখন অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত — এসব গান করতে আরম্ভ করলাম। সেটা ছোটবেলায় যেসব গান আমি গাইতাম, বাবার কাছে শিখেছিলাম। তা সেই গানগুলো এখানে দিলীপ রায়-রজনীকান্তের নাতি আমাকে একেবারে কারেক্টভাবে শেখাতেন। তারপরে বাংলায় ঐ রজনীকান্তের গানগুলো গাইতাম।

আহসান : শেষ বাংলা রেকর্ডটি কবে বের হলো?

যূথিকা : শেষ রেকর্ডটি? গ্রামোফোন কোম্পানি — ওখানকার যিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ — তিনি বললেন যে, 'এই যে যূথিকা, তুমি তো কমল দাশগুপ্তের কাছে প্রচুর গান শিখেছো, ভালো ভালো সুরও শিখেছো, তুমি তো পনেরো বছর ওনার কাছে গান শিখেছো — ভীষ্মবাবুর কাছেও শিখেছো। আচ্ছা, তা এতো বছর শিখে তুমি একটু সুর দিতে পারো না? একটু চেষ্টা করো না! তুমি তো সুর দিয়ে রেকর্ড করতে পারো।' তা আমি তখন চেষ্টা করতে আরম্ভ করি। আমি কোনোদিন সুর দিইনি। আমি কমল দাশগুপ্তের যেদিন রেকর্ড করেছি সেদিন ছবির মতো সমস্ত লিখে উনি দিতেন — কোন্ লাইন কতো বার হবে — মানে ভাবতে হতো না — সুন্দরভাবে উনি শেখাতেন। তো সেই যূথিকাকে বলছেন যে, 'তুমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজে সুর করো।' তাহলে তো সমস্ত দায়িত্ব আমার। ওখানে যে রেকর্ড আমি করবো, সেই রেকর্ডের সমস্ত দায়িত্ব আমার। আবার ভালো করে গাইবো। ভাবলাম তখন, ধরেছে যখন আমি গাইবো, আমি চেষ্টা করি। এই করে আমি দুটো গান রেকর্ড করলাম। প্রণবের না, এটা শ্যামল গুপ্তের লেখা। সন্ধ্যার স্বামী — মারা গেছে।

আহসান : মনে পড়ে গান দুটির কথা?

যূথিকা : হ্যাঁ, 'দীপ যদি নিভে যায় রাতের ঝড়ে' — এই গানটা ছিল। আর ওপিঠে কী ছিল আমার ঠিক মনে আসছে না এখন। তারপরে আমি যেগুলো সুর দিয়েছি, উনি গান লিখে দিয়েছেন। এরপরে লিখেছিলেন — 'আলোর পিছনে ছায়া' — খুব সুন্দর লিখতেন — 'রাতের পিছনে আসে দিন অলখ টানে' — এইটা। আরো দিয়েছিলেন — 'মন্দিরে নয় সেথায় যাবো প্রাণের কুসুম লয়ে'। এই গানটা দিয়ে শেষ হয়েছিল। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি গানও করেছিলাম।

আহসান : হিন্দি গানেও আপনি সুর করেছিলেন?

যূথিকা : আমি সুর করেছিলাম — 'আকাশ তলে যব দীপ জ্বলে' — এটা খুব সুন্দর সুর হয়েছিল।

আহসান : তাহলে আপনি তো বাংলা ও হিন্দি অনেক গানেরই সুর করেছেন এবং সেইসঙ্গে নিজে রেকর্ডও করেছেন —

যূথিকা : নিজেই রেকর্ড করেছি। গানের যেরকম মিউজিক ঐ কমল দাশগুপ্ত দিতেন — মানে প্রথমে খানিকটা মিউজিক হবে, মাঝে ছোটো ছোটো মিউজিক হবে, যেখানে ফাঁক সেখানে কোন্ মিউজিক দিলে সেটা সুন্দর হবে — সেরকমভাবে আমি খুব ভালোভাবে সাজিয়েছিলাম। ওটাও বেশ ভালো বিক্রি হয়েছিল।

আহসান : তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আপনি যখন সুর করলেন বাংলা কিংবা হিন্দি গানের — কমল দাশগুপ্তের একটা ছায়া মনে হয় সে সুরের উপর পড়েছিল।

যূথিকা : হ্যাঁ, এটা ঠিক — এটা তো আমার পড়বেই। আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তো প্রথম থেকেই উনার সুরে গেয়ে আসছি — আর সেটা পড়বে — পড়েছেও। মানে আমি বুঝতে পারি ঠিক যে, হ্যাঁ এখানটায় পড়েছে। কিন্তু অনেকে কিন্তু সেরকম বলেনি। তাঁরা বলেছেন কমল দাশগুপ্তের মতো হয়নি তোমার।

আহসান : আসলে কমল দাশগুপ্ত সম্পর্কে একটা কথা বলাই যায় যে, ওঁর সুরে গান জনপ্রিয় হয়নি এমন গানের সংখ্যা খুবই কম। এই যে, কমল দাশগুপ্ত সুর করলে সেটা লোকের মনে গভীর দাগ কাটতো — ভালো লাগতো, জনপ্রিয়তা পেতো — এর মূল কারণ কী বলে মনে হয় আপনার?

যূথিকা : যেটা আমি বললাম, উনি যেটা সুর করতেন সেটা স্বাভাবিক — মানে তাঁর ভিতরেই ছিল। তাঁর দাদাও সুর করতেন। ওঁদের বাড়িটা একটা মিউজিক্যাল বাড়ি — মানে প্রত্যেকেই সুর করে গায়।

আহসান : ওঁর ছোট ভাই সুবল দাশগুপ্ত!

যূথিকা : সে তবলা বাজায়, সেও খুব সুন্দর গায়। সেও সুর করে। আবার সুধীরা — সে হয়তো সুর করবার চান্স পায়নি, কিন্তু গায়িকা অপূর্ব। তাঁর গানটা শুনি প্রথম আমি দেশেতে — সেনহাটিতে ওঁর গান শুনেছিলাম। আর সেই থেকে আমার মনের মধ্যে ওঁর একটা আদর্শ তৈরি হয়েছিল যে, আমি ওঁর মতো করে গাইবো — অতো পরিষ্কার — অতো নিট অ্যান্ড ক্লিন — কাজগুলো অতো সুন্দর হবে, টানগুলো অতো কারেক্ট টান হবে। এসব আমি খুব মনে রাখতাম যে, আমি যদি কখনো গান করি বাইরে, তাহলে আমি ঠিক ওঁর মতো করে গাইবো। এটা আমার মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল। সেইটা — আমি যেটা মনে করতাম যে আমি এইরকম গাইবো — এই গানটা আমি শিখবো — ওই গানটা ও ভালো গাইছে — ওই গানটা আমি তুলবো — আমার সে আশা পূর্ণ হয়ে গেছে।

আহসান : আপনার গাওয়া গানের ভেতরে — বাংলা গানের কথাই বলি, একটা বিষয় লক্ষ করার মতো যে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা রোম্যান্টিক অনুভূতি — একটা বিষণ্ণতা-বিরহের ছায়া — সব মিলে গানের কথার সঙ্গে সুরের সহযোগে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা তো গায়কি — সেটি অনন্য এক রূপ পেতো। আপনি কি নিজে এই ধরনের গান বেছে নিতেন?

যূথিকা : না, ওটা কমল দাশগুপ্তই দিতেন। ওটা যিনি ট্রেনার তিনিই বুঝিয়ে দেবেন আমার গলায় কোন্ কথার কোন্ সুরটা ঠিক ভালো হবে। এটা তাঁর বিশেষ গুণ ছিল ট্রেনার হিসেবে। মানে আমার গলায় কতোদূর যাবে, গলার কাজটা সুন্দর — ওটাকে মার্জিত করলে আরো সুন্দর হবে, আমার গলা কতো নিচে যায়, কতোখানি স্কেলের নিচে যাবে, কতোখানি স্কেলের উঁচুতে যাবে, আর কোন্ জায়গাটায় গেলে আমার গলাটা সুন্দর খুলবে, সুন্দর লাগবে — সেটা ওনার খুব ভালোভাবে জানা ছিল। তার জন্যে ওনার প্রত্যেকটা রেকর্ড হিট হতো। উনি যেগুলো সুর দিতেন, যার গলায়ই সুর দিতেন উনি — এইটে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আগে গান শুনতেন, শুনে বুঝে নিতেন — বলতেন, 'একটু গাও তো?' উনি বুঝে নিতেন কার গলায় সুরটা মানাবে, কতোদূর যাবে, কোন্‌খানটায় কাজটা দিলে ভালো হবে। এইটা ওনার স্বাভাবিক প্রতিভা। যার জন্যে একটা তাঁর সুরে স্পেশাল রেকর্ডটা হতো।

আহসান : অনেক সময় আমরা দেখি — অনেকে বলেও থাকেন যে, একটা অদ্ভুত সংযোগ রচিত হয়েছিল — গান লিখছেন প্রণব রায়, সুর দিচ্ছেন কমল দাশগুপ্ত এবং সেই গানটি গাইছেন যূথিকা রায় — এ যেন গানের ত্রিভুজ। আর এই তিনজনের সংযোগে সেই গানটি অনিবার্যভাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অন্যদের বেলায় এইরকম উদাহরণ খুব বেশি দেওয়া যায় না।

যূথিকা : একদম প্রথম থেকে — মানে প্রথম গানের থেকে কিন্তু জনপ্রিয় হয়েছে তাঁর সুর। এটা আধুনিক শিক্ষিত বাইরের লোকে বলে যে, আমি নাকি ওটার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফার্স্ট লাইন-আপ্ আধুনিক — আর সেখানে সাকসেসফুলও হলাম। আর যেটা আমার আগে একজন গেয়েছিলেন তিনি সাকসেসফুল হননি, যদিও আধুনিক বলেই গেয়েছিলেন। আধুনিকটা কিন্তু আমাকেই বলে যে, 'তুমি আধুনিক প্রথম দেখিয়েছ।' এটার সুরও কিন্তু সৃষ্টি করেছিলেন কমল দাশগুপ্ত, লিখেছিলেন প্রণব রায়। আমি যখন প্রথম গ্রামোফোন কোম্পানিতে যাই, আমি তো ভেবেছিলাম আমাকে একটা খুব — যেমন ইন্দুবালা — তারপরে আঙ্গুরবালা — এঁরা যে ধরনের উঁচু ক্ল্যাসিক্যাল ধারা নিয়ে যেমন গাইছে — আমাকেও কমল দাশগুপ্ত সে রকম একটা দেবেন। আর সুধীরার কাছেও আমি যেটা শুনেছিলাম — যেটা আমার ভিতরে একেবারে বসে গিয়েছিল সেটাও আমি ভেবেছিলুম যে, ওঁরই তো ভাই — নিশ্চয় ঐ সুধীরার মতো আমাকে বেশ ভালো একটা মজার গান দেবেন। কিন্তু সেটা তো আমি দেখলাম না, দেখলাম আমাদের নামের উপর গান লেখা। আমি গানটা পড়ে বললাম– 'এ কী রকম গান? এ যে নামের উপরে লেখা গান! এতোদিন যা গাইতুম, যেটুকু সময় গেয়েছি, আমি তো এরকম গান কখনো গাইওনি, শুনিওনি। আমি এ গান গাইবো না।' প্রথমেই আমার সবার সামনে এই কথা। তখন উনি খুব শান্ত হয়ে বললেন, 'না, আমরা একটু নতুন রাস্তা ধরেছি। আর এটা তুমি যে শাদা কাপড়-টাপড় পরে আসো ঐ জন্যে আমরা তোমাকেই বেছে নিয়েছি।' এইভাবে আমাদের গানের সেই প্রথম ধারা আরম্ভ হয়েছে।

আহসান : 'ভোরের যূথিকা'ই তো প্রথম রেকর্ড হলো? অপর পৃষ্ঠার গানটি পরে রেকর্ড হলো 'সাঁঝের তারকা'!

যূথিকা : না, দুটো গানের ঐ একটা রেকর্ড।

আহসান : না, আমি বলতে চাচ্ছি যে, প্রথমে তো গেয়েছিলেন 'ভোরের যূথিকা'ই!

যূথিকা : 'ভোরের যূথিকা'।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আহসান : আমাদের একটা দুর্লভ সুযোগ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি। সৌভাগ্যও বটে। তো আমরা একটু অনুরোধ আপনার কাছে সবিনয়ে করতেই পারি যে, 'ভোরের যূথিকা' একটু গুন গুন করে আমাদের শোনান না?

যূথিকা : দেখুন, আমার আজকে গলা ভাঙা, এতক্ষণ বকবক করলাম। আজকে হবে না —

আহসান : ঠিক আছে। আধুনিক বাংলা গানের একটা নতুন ধারার প্রবর্তন তো আপনার কাছ থেকেই হয়েছে — তাই না?

যূথিকা : সে তো কমলদার জন্যে এবং কাজীদার জন্যে হয়েছে। তা না হলে হতো না। এই যে নতুন ধারা, নতুন রাস্তা দেখানো — নতুনভাবে সুর করা — এটা কিন্তু ওনারা যদি না থাকতেন, ওনারা যদি না করতেন — তাহলে কিন্তু এটা হওয়ার কোনো রাস্তা ছিল না। আর কেউ করতে পারতো না। এখনও — এই পর্যন্ত এখনও কারো দেখিনি যে, এই ধারায় তারা গাইছে — এরকম নতুন আরেকটা রাস্তা দেখিয়েছে। এ দেখানো তো আমি প্রথম দেখালাম — দেখাতে পেরেছি।

আহসান : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সে কথা তো আজ বাংলা গানের ইতিহাসের অন্তর্গত। তো এইচএমভির কথায় আরেকটু আমাদের জানতে ইচ্ছে করে যে, তখন তো ট্রেনার হিসেবে ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খাঁ সাহেব ছিলেন — তাঁর সঙ্গে কি আপনার কোনো যোগাযোগ বা কোনো আলাপ অথবা এই যে নির্দেশনা লাভের সুযোগ হয়েছে?

যূথিকা : না, আমি কিন্তু জানতামই না যে জমিরউদ্দিন খাঁ এখানে ঐ স্টুডিওতে আসেন। আর বললাম যে, আমরা যখন যেতাম আমাদের কারো সঙ্গে কথা বলতে দিতেন না, কারো দিকে তাকাতে দিতেন না, কারো সঙ্গে মিশতে দিতেন না, কোথায় কে আছে তা জানতে দিতেন না। সেইজন্যে ঐসব বিষয় আমি জানিই না। কিন্তু জমিরউদ্দিন খাঁর সুরে এবং তাঁরই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্দেশনায় আমার ছোট বোন মল্লিকা রায় একটি রেকর্ড করেছিল হিন্দিতে। জমিরউদ্দিন খানকে তখন আমি —

আহসান : আপনার আপন বোন?

যূথিকা : হ্যাঁ, সে মারা গেছে। আমার পরের ছোট বোন — মল্লিকা রায় তার নাম ছিল।

আহসান : ক'টি রেকর্ড করেছিলেন উনি?

যূথিকা : একটা — হিন্দি ঐ একটাই করেছিল। জমিরউদ্দিন খাঁ খুব সুন্দর — অপূর্ব সব কাজ দিয়ে গেছেন। ওঁর শিষ্য ভীষ্মদেবের কাছে ওঁর যে গান ছিল, সেই গানটিই ওকে শিখিয়েছিলেন — আর সেটা রেকর্ড হয়েছিল। আর তাছাড়া বাংলায় গানটা লিখে নির্মল ভট্টাচার্য — উনি শিখিয়েছিলেন।

আহসান : আপনি তো বাংলা ছাড়াও নানা ভাষায় গান করেছেন, নানা ধরনের গান করেছেন, তো সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন?

যূথিকা : আমি যখন প্রথম ওখানে বাংলায় গান করছি তখন কিন্তু ওখানে কোনো হিন্দি বা অন্য কোনো ভাষারই গান হয়নি। এমনকি এই যে, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কে. সি. দে হয়তো ফিল্মের গান করেছেন — সেটা না, কিন্তু ওখানে ওসব নিয়ে কোনো আলোচনাও শুনিনি, কোনোদিন রেকর্ডও দেখিনি। এরপর প্রথমে কমল দাশগুপ্ত আমাকে একটা মীরার ভজন শেখালেন, সেই মীরার ভজন যখন দাঁড়িয়ে গেলো, পপুলার হলো, ফার্স্ট যখন 'মীরা কে প্রভু সাঁচী দাসী বানাও' — এই গানটা বেরিয়ে পপুলার হলো, তখন ঐ গ্রামোফোন কোম্পানির থেকে বলা হলো যতগুলো মীরার ভজন আছে সব যূথিকাকে দিয়ে গাওয়ানো হবে। তা আমাকে দিয়ে মীরার ভজন, এরপর দেখি উর্দু না'ত, কাওয়ালি — এসমস্ত তখন আমাকে ওখানে শিখিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু ভাষাগুলো তখন আমি জানতাম না, পরে আমি হিন্দিটা মাস্টার রেখে শিখেছিলাম। কিন্তু উর্দু আমি তখন অ-আ-খ-খ-র মতো ঐটা জানতাম —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলিফ-বে-তে-ছে। বাবার একজন অফিসার ছিলেন, বাবার সঙ্গে কাজ করতেন, তো তাঁর কাছ থেকে আমরা শিখতাম। আমি আর দিদি। তারপর দেখি তামিল — আমার উর্দু গানটা খুব পপুলার হয়েছিল — তো পর পর দেখি খুব উর্দু গান আমাকে করাতেন। আর সেটা যখন আমি মন দিয়ে গাইতাম, দু'একটা তখন ওরাও শুনতো। কিন্তু ওখানে তো মুসলমান — নানা জাত আসতো প্রোগ্রামে — তাদের খুব ভালো লাগতো — মানে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিল। আর মুসলমানেরা একটা সংস্কার থেকে তারা আবার একটা প্রোগ্রামও করেছিল শুধু উর্দু ভাষার গানগুলো করবার জন্যে। তারপরে বলে যে, 'তুমি ভজনও গাইতে পারো, আমরা ভজন শুনবো।' কিন্তু উর্দুটা বেশিদিন আমাকে চালাতে দেয়নি গুজরাটিরা — ওরা তো অসম্ভব ভজনের ভক্ত — তারা বলে যে, 'না, যে ভজন এতো সুন্দর গাইছে, তার আমরা উর্দু গান শুনতে চাই না।'

আহসান : এই রেকর্ডগুলো কারা বের করতেন?

যূথিকা : সব গ্রামোফোন কোম্পানি।

আহসান : এগুলোর রেকর্ডিং কি কলকাতাতেই হতো?

যূথিকা : হ্যাঁ, সব কলকাতায়।

আহসান : আপনি হিন্দি-উর্দু-গুজরাটি ভাষায় তাহলে গান রেকর্ড করেছেন!

যূথিকা : গুজরাটি না, হিন্দি-উর্দু-তামিল।

আহসান : এই তিন ভাষায় — পাঞ্জাবিতে কি করেছেন?

যূথিকা : না, তামিল হচ্ছে ম্যাড্রাসি, ম্যাড্রাসি ভাষায় যখন সিনেমাটা — ফার্স্ট সিনেমায় গান করলাম, তখন হিন্দিতে দুটো গান ছিল। আর দুটো তামিল বইতেও আমি গেয়েছিলাম।

আহসান : আচ্ছা, সেই তামিল ফিল্ম দুটির নাম কি মনে পড়ে?

যূথিকা : ঐ একই বই — ঐ *রতনদ্বীপ*। দেবকী বসু *রতনদ্বীপ* হিন্দিতে করেছিলেন, বাংলায় করেছিলেন, তামিলে করেছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আহসান : ও আচ্ছা, তাহলে *রতনদ্বীপ* ছবিটি তিন ভাষাতেই হয়েছিল আর কি!

যূথিকা : তামিল গান আমি দুটো করেছিলাম — আর হিন্দি গান করেছিলাম — এই কলকাতায় বসেই।

আহসান : আপনি এই উর্দু-হিন্দি-তামিল এসব ভাষায় গান গেয়ে এক সর্বভারতীয় পরিচিতি ও খ্যাতি পেয়েছিলেন এবং এখনো পাচ্ছেন। তো সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

যূথিকা : আমি তো কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে, আমি আজ এখানে এসে দাঁড়াবো, যার জন্যে ১৯৭২ সালে আমাকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দিলেন গভর্নমেন্ট থেকে। তখন ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী আমাদের প্রধানমন্ত্রী আর ঐ সময় যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি হচ্ছেন — আমার এখন ঠিক মনে আসছে না।

আহসান : ভিভি গিরি সম্ভবত।

যূথিকা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভিভি গিরির হাত থেকে আমি 'পদ্মশ্রী' মেডেল নিয়েছিলাম।

আহসান : এই যে গানগুলো আপনি গাইলেন, সারা ভারতবর্ষে আপনার নাম ছড়িয়ে পড়লো — এর জন্যে তো নানা অনুষ্ঠানে আপনাকে বাইরে গিয়ে গাইতে হয়েছে — বাংলার বাইরে গিয়ে। তো সেই সম্পর্কে কিছু বলুন না!

যূথিকা : বোম্বেতে যে আমি গিয়েছিলাম সেই একটা প্রোগ্রামের জন্যে, সেবার তিনটে প্রোগ্রাম আমাকে করতে হয়েছিল এবং আমি যে মার কাছে কথা নিয়েছিলাম আমি আর যাবো না — এই শেষ। তা সেইখানে আমাকে এখনো পর্যন্ত বলে, আমাকে ওরা ডাকে, আবার অনেক প্রোগ্রাম করে, ওখান থেকে সারা গুজরাটও ঘোরায়। আরো অন্য অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। হায়দ্রাবাদে গিয়েছিলাম। হায়দ্রাবাদ থেকে বোম্বে, বোম্বে আমার সেন্টার হয়ে গিয়েছিল। বোম্বে ছিলাম — সেখান থেকে একটা গ্রুপ করে আমরা তিন মাস ধরে প্রোগ্রাম করবো এই বলে ইস্ট আফ্রিকায় গিয়েছিলাম সে সময়। আর এ-ছাড়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিংহল, ম্যাড্রাস, হায়দ্রাবাদ — এদিকে বোম্বে, পুনা, নাসিক — ঐদিকে মানে গুজরাটের প্রায় সব জায়গায় আমাকে প্রায়ই ঘুরতে হতো।

: মানে এইসব জায়গায় আপনার গানের বেশ আদর-কদর হয়েছে।

: আর এখানে আমাদের ভারতের মধ্যে আরো দিল্লি, তারপরে এলাহাবাদ, কানপুর, লখনউ — এগুলো আমাকে গানের জন্যে ঘুরতে হয়েছে। তারপর গ্রাম-ট্রাম সব আছেই। তারপরে সাঁইবাবার যখন ভজন আরম্ভ করলাম, রেকর্ড যখন বেরুলো, তখনও সব চারিদিক থেকে আমাকেই ডাকা শুরু হলো, সাঁইবাবার ভজন করবার জন্যে লিড করতে হয়েছে। ভজনে একজন লিড করে আর কোরাস হয়। ভক্ত যারা প্রত্যেককে গাইতে হবে একসঙ্গে।

: তো, এই যে আপনি ধীরে ধীরে গানের জগতে নিজেকে বিস্তারিত করলেন — আধুনিক বাংলা গান থেকে উর্দু-হিন্দি-তামিল ভাষায় গান, ফিল্মের গান, ভজন-ভক্তিগীতি এসব গান যে করলেন — সর্বভারতীয় স্বীকৃতিটা আদায় করে নিলেন, সেটাকে তো দুর্লভ ব্যাপারই বলতে হয় আর কী!

: দুর্লভই। কিন্তু আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে, যেই গ্রামটায় আমার জন্ম — সেখান থেকে আমি যে আজকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেরিয়েছি — মানে আমার বাইরে যাওয়ার তেমন সৌভাগ্য হয়নি কিংবা চান্স এসেছে কিন্তু হয়নি, তাহলেও আমি যে এতোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, নানান লোকের সঙ্গে মেলামেশা, নানা ভাষা, নানা তাদের সাজপোশাক কতোরকম যে আমার মনকে একেবারে আনন্দে ভরিয়ে রেখেছে — সে আমি বলতে পারবো না। আমার গ্রাম তারাও আমাকে ভোলেনি, যেখান থেকে আমি জন্ম নিয়েছি — যেখান থেকে আমি প্রথম গান নিয়ে উঠেছি, সেই জায়গা আজও আমাকে মনে রেখেছে। এইটাই আমার সব থেকে বেশি আনন্দ।

: আপনি যেসব গান করেছেন, রেকর্ড বেরিয়েছে যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গানগুলোর — যদি বাংলা গানের কথাই বলা হয় — এর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় গান আপনার কোনটি?

যূথিকা : আমার কিন্তু সব গানই প্রিয়। কিন্তু তার মধ্যে দু-একটি গান, যেমন আছে 'চুপকে চুপকে বোল, ময়না চুপকে চুপকে বোল' — এই গানটা অসম্ভব গুজরাটিদের প্রিয়।

আহসান : বাংলা গানের কথা বলছি আমরা।

যূথিকা : বাংলা গানের? বাংলা গানের মধ্যে আমার কয়েকটি রেকর্ড আছে কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের, যেমন ঐ গানটি — 'স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর', তারপরে আরো অনেক। যেমন — 'আমি ঝর্ণাধারা' — এই বলে একটা গান আছে।

আহসান : এটি কি নজরুলের?

যূথিকা : না, এটা প্রণব রায়ের। 'সাঁঝের তারকা আমি'। তারপরে নজরুলের — 'দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল, যায় ভেসে যায় কালের স্রোতে' — এইটি আছে। নজরুলের অনেক আছে। এখন হয়তো আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু নজরুলের প্রচুর গান আমার প্রিয়। নজরুলের আমার সবচেয়ে প্রিয় গান মানে যতো গান আমি করেছি তার মধ্যে সব থেকে আমার প্রিয় গান — 'ওরে নীল যমুনার জল', আর ওপিঠে হচ্ছে — 'তোমার কালো রূপে যাক না ডুবে সকল কালো মম, হে কৃষ্ণ প্রিয়তম'। এটার যেমন সুন্দর সুর দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত তেমনি কাজীদা লিখেছিলেন। কাজীদাকে আমার মা একটু অনুরোধ করেছিলেন — আমি সেটা মাকে বলতে বলেছিলাম যে, 'আমি আধুনিক গান অনেক করেছি। আমার এখন আর আধুনিক গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি ছোটবেলা থেকে ভক্তিমূলক গান ভালোবাসি। মা, তুমি কাজীদার কাছে গিয়ে বলবে যে, রেণু খুব ভক্তিমূলক গান গাইতে ভালোবাসে, আপনি ওকে যদি দুটো ভক্তিমূলক গান লিখে দেন, মানে ছোট মেয়ে গাইবে — সরল-সহজ ভাষায়।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা-ও বলেছিলেন মা, 'সরল ভাষায় যদি দুটো গান রেণুকে লিখে দেন, যূথিকাকে লিখে দেন — সে খুব খুশি হবে।'

আহসান : এই গান দুটি বুঝি?

যূথিকা : হ্যাঁ, আর সেটা কাজীদাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজীদা বললেন, 'ঠিক আছে মা, আপনি আমার বাড়িতে আসুন, আমার যতো গান খাতায় লেখা আছে, আপনাকে দেবো, যে গানই ইচ্ছে সে গান আপনি যূথিকার জন্যে নিয়ে যাবেন।' তা মা সকালবেলায় উঠে কাজীদার বাড়িতে গিয়েছিলেন। কাজীদা ওঁর সমস্ত খাতা চারশো-পাঁচশো গান মা বসে বসে দেখে দুটোর সময় বাড়ি এলেন। বাড়ি এলে আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, 'মা, কোনো গান নিয়ে এসেছো? কোন্ গানটা? কী গান এনেছ আমাকে দেখাও।' তখন বললেন, 'আমার একটা গানও পছন্দ হয়নি।' আমি বললাম, 'কী সর্বনাশ, তোমাকে কাজীদা অমন করে দিলেন!' মা বললেন, 'ওগুলো বেশি বয়স যাদের তাদের জন্যে। বড়োরা গাইলে ভালো লাগবে।' তা আমি বললাম, 'এবার কী হবে?' তখন মা জানালেন তিনি কাজীদাকে বলেছেন, 'আপনি যদি নতুন করে যূথিকার গান লিখে দেন, তাহলে খুব ভালো হয়। বললেন, 'ঠিক আছে।' কাজীদা যে এতো ভালোবাসতেন আর এতো তাঁর প্রাণ ছিল যে আমাদের তখন ক'দিনই আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে — যতোটুকু ঐ রেকর্ড কোম্পানির ঐখান থেকে। তাতেই তিনি মা'র পরে এতোটুকু রাগ করলেন না। আমি তো ভেবেছিলাম উনি রেগে যাবেন। রাগ করলেন না, একেবারে শান্তভাবে বললেন, 'মা, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি যূথিকার জন্যে নতুন করে লিখে দেবো।' তিনি দিন দুই পরেই 'নীল যমুনার জল' আর ঐ গানটা লিখে দিলেন। আমার তো প্রাণটা একেবারে আনন্দে ভরে গেছে। আর তখন কমল দাশগুপ্তও দুদিন-তিনদিনের মধ্যে সুর দিয়ে দিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিউজিশিয়ানকে নিয়ে, রিহার্সাল করে আমিও দুদিনের মধ্যে ও গান রেকর্ড করলাম। রেকর্ড করাটাও আমার ভালো হলো। গানটা আমার প্রাণে লেগেছে তো, গানটার রেকর্ডও ভালো হলো। খুব সুন্দর, আমি ওটাকে সব থেকে উপরে রাখি।

আহসান : এই গান দুটি — আপনি যতো বাংলা গান করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় বলে আপনার কাছে মনে হয়?

যূথিকা : হ্যাঁ, এই গান দুটি আমার সকলের চেয়ে প্রিয়। তারপরে তাঁর সব গানই আমার ভালো লাগে।

আহসান : গানের সঙ্গে মানুষের জীবনের অনেক সময় মিল ঘটে যায়। যেমন আপনার প্রথম গানটি আপনার নাম দিয়ে রচিত হয়েছিল। তো সেটি যেমন ব্যাপার, আবার অনেক সময় গানের বাণী গায়কের জীবনে, শিল্পীর জীবনে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়, বা তিনি অনুভব করেন সেই গানের ভেতর দিয়ে তাঁর জীবনকে। তো আপনার কি কখনও এইরকম গানের কথার সঙ্গে আপনার জীবনের কোনো মিল ঘটে গেছে?

যূথিকা : না, আমি ওটা খুব বেশি ভাবিনি। তবে শেষের দিকে আমি যখন গাইতাম, আমায় যে গানগুলো দিতেন সে গানগুলো খুব বিষাদের গান। তা আমি তখন চাইতাম না। আমার মনে তখন ভীষণ আনন্দ যে, আমি এতোভাবে এতো রকমের সুরের গান গাইলাম, আর সেগুলো ভারতের সকলের কাছে প্রিয়ও হলো — তবে আমি কেন এতো বিষাদের গান গাইবো? এটা আমার খুব মনে পড়তো। আর আমার মনটাও তখন খুব খারাপ হয়ে যেতো। শেষ দিকের গান কতোগুলো — প্রথমের না — শেষের দিকের গানের কথা আমার ঐরকম খুব মনকে খারাপ করতো। আর সে গানগুলো আমি গাইতামও — আবার সে গানগুলো খুব সুন্দরও হতো।

আহসান : জনপ্রিয়ও তো হতো!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যূথিকা : হ্যাঁ, জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। কিন্তু সেটা আমার ঠিক প্রাণে লাগতো না। আমার মন তখন চাইতো যে, আমি আনন্দের গান গাইবো। আমি তো সাকসেসফুল, আমি যে রাস্তায় গেছি আমি সফল হয়েছি। আমি কেন বিষাদের গান গাইবো!

আহসান : করুণ সুর আর ভাবের গান!

যূথিকা : হ্যাঁ, সেইভাবেই গাইতাম — করুণভাবেই গাইতাম। আর শিল্পী হলে তাকে সবরকমই করতে হবে — এটাই হচ্ছে নিয়ম। শিল্পীকে সবরকম — আনন্দও করতে হবে, দুঃখও করতে হবে — আবার হাসিরও করতে হবে। সবকিছুই করতে হবে। তো সেইটেই প্রকাশ পেলো যে, হ্যাঁ যদি শিল্পী ঠিক হয় তবে সবরকমই গাইবে। কিন্তু ওটা গাইতে আমার একটু খারাপ লাগতো। আর তখন মনে হতো যে, এতো সকলকে আনন্দ দিচ্ছি, এতো আনন্দের গান করছি, সুরগুলোও ভালো হচ্ছে। আমি শুনতাম, আমার হয়তো স্যুট করেছে, আমি তাঁকে হয়তো বলতাম যে, 'আমি এই গানটা গাইবো, খুব ভালো লেগেছে এই গানটা।' তখন বলেছেন, 'না, তুমি গাইবে না, অন্য শিল্পীরা তাহলে কী গাইবে!' তা এতো খুব কঠিন গান — আর হতাশ সুরের গান, যারা না জানে তারা বুঝবে না। আমাকে একটা সুর দিলেন, আবার পাশে হয়তো আরেকটা করলেন — আনন্দের, খুব সুন্দর। 'আমি যার নূপুরের ছন্দ' — গানটা কতো সুন্দর — কতো সুন্দর সুর! আমি যখন বললাম, 'আমি এই গানটা গাইবো। আমার প্রাণ চাইছে আমি এ গানটা রেকর্ড করবো।' বললেন, 'তুমি কেন সব ভালো ভালো গান গাইবে? অন্য শিল্পীরা কী করবে? তাদের দিতে হবে।' এই — এইগুলো আমার শুনতে খুব খারাপ লাগতো।

আহসান : আসলে আপনার জীবনের স্বর্ণসময় গানের জগতে ছিল এবং এখনো ভাবতে ভালো লাগে যে, আপনি পুরোপুরি গান ছাড়েননি — আপনি গানের জগৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। কোনো না কোনোভাবে, পরোক্ষভাবে হোক, বিচ্ছিন্নভাবে হোক, অসংলগ্নভাবে হোক, গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

যূথিকা : এখনও আমি বিচ্ছিন্ন হইনি। কারণ আমি শেখাই। তারা কিছু চায় — ঐ কমল দাশগুপ্তের সুরের ভজন, গীত, বাংলা গান — এইগুলোই কিন্তু তারা শিখতে আসে। আমার চর্চাটা থেকে যায়। তারা বলে, 'ঐ গানটা শিখবো, ঐ গানটা শিখবো।' আমি হয়তো সেই গানটা গাইছি না, কিন্তু সেটা আমাকে শিখে নিতে হয় তখন রেকর্ড থেকে। আর সুরের জগতে আমাকে থাকতেই হবে — না থাকলে তো আমি মরে যাবো সেখানে, সেখানটায় তো আমি মৃত। আমি কিন্তু সবসময় চেষ্টা করি, আমার সুরটা যাতে বেঁচে থাকে। এটা আমার নয়, এটা হচ্ছে সকলের — এটা আমার দেশের। এই সুরটা — এই ভজন — ঐ গীত — মানে গীত আর ভজনের কী তফাৎ সেটা কমল দাশগুপ্ত দেখিয়ে গেছেন। এই জিনিসটা যেন তাদের মনে থাকে, মানে তারা শিখতে পারে যে, হ্যাঁ ভজন আর গীত এক জিনিস নয়। হোলির সময় একরকম সুর, আপনার দেওয়ালির সময় একরকম সুর, বর্ষাতে একরকম সুর। একদম অপূর্ব তাঁর ভাবনা। তা সেই জিনিসটা যাতে বেঁচে থাকে আমি মরে গেলেও — তিনিও গত হয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সুরটা আমি বাঁচাবার জন্যে — যতোদিন আমার প্রাণ থাকবে আমি সেটা বাঁচাবার চেষ্টা করবো। আমি তাঁর গান এখনও গাই। যখনই গান করি, আমি তাঁর গানই গাই। আবার সেই সুরগুলো তো তাঁরই। আমার সমস্ত রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানির। কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে কীভাবে ওনাদের একটু ঝগড়া, মানে ঝগড়া না, একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, তাতে গ্রামোফোন কোম্পানি আমার সমস্ত রেকর্ড ক্যান্‌সেল করে দিলো। তখন ওরা করলো কি, না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর রেকর্ড থাকবে না, এবার আমরা ক্যাসেট করবো। ক্যাসেট-যুগ পড়লো — সব ক্যাসেট। কিন্তু আমার গান একটাও হচ্ছে না, বুঝলেন? আমার তখন খুব ভয় লেগে গেছে। আমি তো ওনাদের কাছে গিয়েছি — বলেছি, 'এতো ক্যাসেট করছেন, আমার গানগুলো কি ক্যান্‌সেল করে দিলেন? আর সকলের রেকর্ড — ক্যাসেট রেকর্ড করছেন আর আমার কেন বেরোচ্ছে না? অতোগুলো গানের?' তা বললো, 'না, করবো, আমরা করবো।' বলে, কিন্তু করে না। এরপরে আমি ওদের অনেকভাবে বলেছি। তারপরে ক্যাসেট চলে গেলো কিছুদিনের মধ্যে। বলে, 'ক্যাসেট থাকে না।' তারপর ওরা করলো সিডি। আমি গিয়ে কথা বলেছি যে, 'এই গানগুলো বাঁচান! আপনারা ছাড়া তো কেউ বাঁচাতে পারে না।' কিন্তু সিডি ওরা করছেই না — আমার সিডি করছে না, বলেছি, 'এখন সিডির যুগ, আপনি সিডিটা করুন।' কিছু হচ্ছে না। কিন্তু দেখুন, আমি বললাম যে আমার পরে ভগবানের একটা আশীর্বাদ আছে। এই আমি জানিও না, তারা একটা কী করে চল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানিকে দিয়ে তারপর বললেন, 'যূথিকার সিডি করতে হবে। আমরা এই যে টাকা দিলাম।'

আহসান : টাকাটা কারা দিলেন?

যূথিকা : বিএসএনএল — মানে ফোনের কোম্পানি। তখন এই আরম্ভ করলো। কাগজে খুব বেরিয়েছিল, সব সিডি। তাছাড়া ওঁরা আমাকে একটা বিরাট সম্মান দিলেন। তখন কোম্পানি অতো টাকা পেয়েছে, কোম্পানি সিডি-টিডি না করলে তো ওরা ছাড়বে না। ভজন-আলেখ্য বলে ওরা দুটো সিডি করলেন, একটা বাক্সের মধ্যে — খুব সুন্দর। তাতে একটা ছোট্ট বই ছিল, তাতে যে ভজনগুলো সিডির মধ্যে আছে তার পরিচয় আছে। আমাকে দিয়েই ওরা চয়েস করালো। আমি সব খাতা বের করে ঐ ভালো ভালো — যেগুলো বেশি ভালো রেকর্ডিং হয়েছে —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভালো মানের — অন্যরকম, সেরকম পর পর সাজিয়ে আমি দুটো সিডির গান বেছে দিলাম ওদের।

আহসান : কবে বেরিয়েছে?

যূথিকা : ওটা বেরুলো না। ওটা করলো কী, ওরা বড়ো বড়ো জায়গায় গিফট্ পাঠালো সব, বুঝলেন? ওটার কোনো দাম করলো না, বারও করলো না, ওটা ঐ পর্যন্ত ।

আহসান : আপনার নিজের কাছে আছে তো?

যূথিকা : আমার কাছে আছে। মানে আমাকে দিলো, আমাকে অনেকগুলো দিয়েছিল — দশটা-বারোটা। কিন্তু আমি সকলকে দিয়ে দিয়েছি। ওটা রাখতে পারিনি।

আহসান : আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। এইচএমভি তো আপনাকে গোল্ডেন ডিস্ক দিয়ে সম্মাননা জানিয়েছে — আরো ছ'জন শিল্পীর সঙ্গে।

যূথিকা : আমার যখন 'চুপকে চুপকে' এটা খুব বিক্রি হলো, মানে সিনেমা-টিনেমার যেমন রেকর্ড বিক্রি হয় তার থেকে বেশি, এখনো চলছে সেগুলো, এখন সিডিতে দিয়ে দিয়েছে। তা সেই গান বেরোতে বলে — গ্রামোফোন কোম্পানিতে তখন কিন্তু সাহেবরা রেকর্ড-টেকর্ড করে, তখনও স্বাধীনতা হয়নি। তা ওঁরা আমাকে গোল্ড মেডেল দিল। বলে 'এটা কোম্পানিতে একমাত্র পেয়ারু কাওয়াল পেয়েছিলেন।' পেয়ারু কাওয়াল আর আমি পেলাম।

আহসান : কে. মল্লিক মনে হয় পেয়েছিলেন!

যূথিকা : না, ওরা তখন তা বললো না, বললো — এই দুজন মাত্র পেলেন গোল্ড মেডেলটা। তখন সাহেবরাই বলেছিল যে, 'আমরা একটা পার্টি করে যূথিকাকে এই গোল্ড মেডেল দেবো আর খাওয়া-দাওয়া হবে — এই ধরনের পার্টি করবো। ফটো থাকবে।' — বুঝলেন? কিন্তু আমার কতোগুলো কুসংস্কার ছিল, মা কেবল বলতেন যে, ফটো তোলা যাবে না। এ জন্যে গ্রামোফোন কোম্পানিতে আমার কোনো ফটো নেই, বা গান্ধীজির সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার কোনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফটো করতে পারিনি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পরে যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, আমাকে ডেকে গান শুনছেন, মহাত্মা গান্ধীকে আমি গান শোনাচ্ছি — এসবের আমি ফটো রাখতে পারতাম। ওনাদের সঙ্গে আমি বসে আছি। কিন্তু সেগুলো আমি করতে পারিনি। মা বলতেন যে, 'না, ফটো তুমি তুলবে না। এখন ফটো তোলার মতো কিছু হয়নি। আগে ভালো করে শিখে একেবারে ভালো করে গান করো — তারপর তুলো।' তারপর যখন ঐ '৭২ সালে 'পদ্মশ্রী পেলাম', ঐ যে 'পদ্মশ্রী', তারপর থেকে ফটো। এইজন্য আগেকার ফটো — অনেককিছু আমি করতে পারিনি।

আহসান : আচ্ছা যূথিকাদি, এবারে আমরা একটু জিজ্ঞেস করি যে, এইচএমভি যে গোল্ডেন ডিস্ক দিয়ে সম্ভবত ১৯৭৬-এ ছ'জন শিল্পীকে সম্মাননা জানিয়েছিল, যতদূর মনে পড়ে তাতে আপনাকে বিশেষভাবে নজরুলগীতির একজন বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি তো খুব বেশি নজরুলের গান করেননি, আরো বেশি তো নজরুলের গান করতে পারতেন, তা করলেন না কেন?

যূথিকা : না, ওখানে সকলকেই তো গাইবার জন্যে ইয়ে করেছিলেন, আর একটা করেই গান ওদের ছিল। ওদের ওখানে একটা কি দুটোর বেশি গান কাউকে দেয়নি — একটা সময় ছিল।

আহসান : না, আমি সেটা বলছি না। আমি বলছি যে, গ্রামোফোন রেকর্ডে আপনি তো নজরুলের আরো বেশি গান গাইতে পারতেন!

যূথিকা : না, ওটা তো কমল দাশগুপ্তের উপরেই ভার ছিল। উনি দেখতেন যে, আরো তো সকলেই চাইছে — আমি গাই তাঁর গানটা। তারাও তো কমলদাকে বেশি ধরতো। একটা-দুটো দিয়েছেন। শেষের দিকে বেশির ভাগ প্রণব রায় আর কাজীদার গান — মোহিনী চৌধুরী, এঁদের গান তো কোনো একজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিল্পীকে কমলদা বেশি দেননি।

আহসান : আপনি নব্বইয়ের কোটা পেরিয়ে এখন বিরানব্বই বছরে পড়েছেন, নাকি বিরানব্বই পেরিয়ে গেছেন?

যূথিকা : না, এপ্রিলে পেরুবো।

আহসান : আচ্ছা, এপ্রিলে — মানে সামনের ২০১২ সালের এপ্রিলে তাহলে বিরানব্বই পেরিয়ে তিরানব্বইয়ে পা দেবেন। তা আপনি এই যে একা আছেন, আমি নিঃসঙ্গ বলবো না, কেননা আপনি এখানে একটা বেশ আনন্দভুবন তৈরি করে রেখেছেন গানের — গান শেখানোর — এই বাড়িতেই।

যূথিকা : হ্যাঁ, আর সেখানেও একটা কথা যে, কমল দাশগুপ্ত যতো রেকর্ড করেছেন, আমি চেষ্টা করছি বাংলা-হিন্দি তারপরে উর্দু, কাওয়ালি — এগুলোর আমি নোটেশন করছি। তাই দিয়ে আমি একটা বই করবো। বই করবার আমার খুব চেষ্টা। তবে এই বয়সে আমি বেশিটা করতে পারি না। দুই লাইন করে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমার তখন মাথার মধ্যে কিছু আসে না। আর এসব জিনিস খুব সাবধানে করতে হয়, একটু ভুল হলে সেটা অন্যরকম হয়ে যায়। সেইজন্যে আমার যখন ওরকম একটা ভাব আসে বা শরীরটা যখন চলছে না, মনটাও দিতে হবে, দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে অক্ষরগুলো, তখন আমি সেখানে বন্ধ করে দিই। সেজন্যে কাজটা ঠিক তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। আর প্রথম থেকে যদি আমি শুরু করতাম, তাহলে হয়তো এতোদিন শেষ হয়ে যেতো, কিন্তু প্রথম দিকে তো আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি আর আমার নিজের প্র্যাকটিস্ করতে রীতিমত এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা সময় যেতো — আমি এ-বেলা ও-বেলা প্র্যাকটিস্ করতাম। তা তখন আমি শেখাতাম না। সে সমস্ত গান শুনতাম যে সমস্ত গান আমি করেছি — তা সেগুলো শুনে মনে রাখতে হতো, বাইরে গিয়ে আমাকে সে সমস্ত গান গাইতে হবে। এইজন্যে তখন কাজেতে আমি খুব ব্যস্ত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবার একটা স্মৃতিকথাও লিখতে আরম্ভ করলাম। মা বলতেন যে, 'রোজকার যা হবে তুমি একটা ডায়েরি লিখো। আমি যখন ইস্ট আফ্রিকাতে গেছি — আমরা জাহাজে গিয়েছিলাম, জাহাজের কেবিনে আমি থাকতাম। সেখানে খুব নিঃসঙ্গ আর খুব খারাপ লাগতো। একা কী করবো! ওখানে বসে প্রতিদিনকার সমুদ্রের কী রূপ, প্যাসেঞ্জাররা কী করছে, কে খেলছে — একটা ঘর ছিল, সেখানে লাইব্রেরি আছে, কেউ পড়ছে, — এইসব লিখতাম। আমার বইটার মধ্যে সেই দৃশ্যগুলোও আমি দিয়ে দিয়েছি। এই জন্যে প্রথমে আর এটা আমার তখন মাথায় আসেনি। আমি ভেবেছিলাম, গ্রামোফোন কোম্পানি আমার জিনিসগুলো বাঁচাবে। কিন্তু সেটা তো হবে না প্রথমেই বুঝতে পারলাম, যখন আমার সব রেকর্ড ক্যান্‌সেল হয়ে গেলো। কোনো ক্যাসেট তৈরি করছে না, তখন আমি বুঝে নিলাম যে এরা কিছু করবে না — আমাকেই করতে হবে। এই করেই আমি তখন থেকেই চেষ্টা করছি। জানি না কতোটা দূর আমি এগুতে পারবো। তবে যতোদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে আছি, আমার হাত-মাথা চলবে।

আহসান : যূথিকাদি, শিল্পীর কিংবা লেখকের জীবন সম্পর্কে মানুষের একটা অদ্ভুত ধরনের কৌতূহল থাকে, জানার আগ্রহ থাকে। শিল্পী তো শুধু নিজের পরিবারেরই সম্পদ নন, তিনি সব মানুষের সম্পদ, দেশের সম্পদ, জাতির সম্পদ — সেজন্যে তাঁর নিজের কথা যদি সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শোনা বা জানা যায়, তাহলে অনেক সময় মানুষের কোনো ভুল ধারণা বা নিজের মনের মতো করে কল্পনা করে নেওয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তো সে জন্যে একটু জানতে চাই যে, আপনি এই যে সংগীতজীবনে প্রবেশ করলেন, তারপরে খ্যাতিলাভ করলেন, প্রতিষ্ঠা পেলেন — তারপরেও আপনি একা থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

যূথিকা : দেখুন, আমি ছোটবেলা থেকেই দেখতাম যে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের দেশের যে সমস্ত মেয়েরা বিবাহিত — সেখানে তাদের জীবনটা একেবারে বন্দি, যেন বন্দিশালায় এসে ঢুকেছে। আর তখনকার দিনে খুব ছোটবেলায় তাদের বিয়ে দিয়ে দিতো। টাকা-পয়সা কম, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়া শেখানো হতো না তাদের — এগুলো যখন চোখে পড়লো যে, আরো সব লোকে করছে একই জিনিস। আবার লেখাপড়া শিখেও যারা বিয়ে করলো, বিয়ে করে কী হলো! এই যে গ্রামোফোন কোম্পানিতে আমার সময় কতো মেয়ে আসলো, আমার মতো ঐ রকম ঘর থেকে। কিন্তু তারা ঐ দু'চারটে গান যেই হিট করলো। ব্যস্, তারপরেই শুনি তার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপরে সন্তানের মা হয়েছে। এরকম করতে করতে তাদের আর কিছুই হলো না। আবার আমার কাছে যারা শিখতে আসে, যেসব মেয়েরা আসে, যাদের খুব গানের গলা — বাইরে ফাংশন করতো, সবই করতো, যেই দেখলো ভালো গান করছে তখনই বিয়ে দিয়ে দিলো। নিজেরাই হয়তো করলো। বলে যে, 'আমি আরো ভালো করে শিখতে পারবো।' এইতো সংসার করলে — সেই জিনিসটা তারা নিজেরাই বলেছে, 'দিদি, আমার কিছুই হয়নি। এতো বছর আমার গ্যাপ গেছে। কিন্তু গানটা আমাকে এখনো কষ্ট দেয় যে আমি কিছুই শিখলাম না।' সে জন্যে এখন এই শেষ বয়সে তারা বলছে, 'এখন আমি গান না হলে থাকতে পারি না, আপনার কাছে গান শিখবো।' বেশির ভাগই সব এরকম কথাবার্তা নিয়ে আসে। ছোটবেলায় আমি দেখতাম যে, তারা বন্দি — আর কিছু শেখে না, ঐ একঘেয়ে রান্না করো, বাচ্চাদের দেখো — এই তাদের জীবন। তখন থেকে আমি ঠিক করেছিলাম যে, বিয়ে আমি করবো না, আর আমি তখন থেকে ভীষণ গানের পাগল ছিলাম। গান থাকলে আমার আর কিছু নাই, পড়তে পড়তে গান গাইতাম, বই ছেড়ে আমি পড়ে থাকতাম। প্রথম থেকে আমার মনে এরকম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাব একটা ছিল আর আমার মাও খুব বিয়ের বিপক্ষে ছিলেন। তিনিও আমাদের বোনদের সকলকে শেখাতেন, 'আগে লেখাপড়া শিখবে, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, আগে নিজেকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত করবে, এসব কিছু জানবে — তারপরে যদি ইচ্ছা হয় তুমি নিজে বেছে-শুনে বিয়ে কোরো।' আমি কিন্তু তখন থেকেই স্বামীজির আদর্শে চলি। ওখানে মা-ই আমাদের দীক্ষা দিয়ে দিলেন বেলুড় মঠে, বিবেকানন্দ স্বামীর আদর্শে আমি এবং আমার বোনেরাও সব শিখবো সব জানবো। সেখানে লেখা আছে, সেখানে বলে, আমার মা-ও বলতেন — মা খুব বই পড়তেন, মা বলতেন যে, 'বারো বছর থেকে কেউ ব্রহ্মচর্য পালন করলে, এটা স্বামীজি বলে গেছেন, ব্রহ্মচর্য পালন করলে তাহলে মনের অনেকটা উন্নতি হয়। মনটা — সে ঠিক বুঝতে পারে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ — এই বিচারগুলো তাদের মধ্যে আসে। আশ্রমে যেতে হবে না, সব ঘরে ঘরে এরকম পড়াশুনো করবে সেই সময়টায়, ঐ সময়টা নাকি খুব খারাপ। তখন তোমরা বিয়ের কথা ভাববে না, আর এরকম ব্রহ্মচর্য বারো বছর পালন করবে।' স্বামীজির সেই আদর্শ নিয়ে আমরা তিন বোন না জানিয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে পরামর্শ করে এরকম শাদা কাপড় পরতে শুরু করলাম।

আহসান : এটি কতো বছর বয়সের কথা?

যূথিকা : আমার বোধ হয় ন'বছর, আমার দিদির বারো বছর আর আমার যে বোন মারা গেছে সেই বোনের বয়স ছিল আমার থেকে তিন বছর কম — তার মানে ছ'বছর। এই আমরা তিনজন একসাথে থাকতাম। এই তিনজনই পরামর্শ করে আমরা এই শাদা কাপড় মানে ব্রহ্মচর্যের যেগুলো নিয়ম শাদা কাপড় পরবো, মাছ-মাংস কিছু খাবো না, অর্নামেন্টস্ পরবো না। তারপর কোনো শ্রাদ্ধবাড়ি — বিয়েবাড়ি যাবো না। নেমতন্ন-টেমতন্ন ঐ সমস্তে যাবো না — বেশি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাংসারিক কথাটথা বলবো না — এরকম। এরকম সেইসব নিয়ম আমরা মনে মনে ঠিক করে আমরা তাই করলাম — সব ছেড়ে দিলাম — অর্নামেন্টস্, হাতে চুড়ি-টুড়ি সব — এই করে শাদা কাপড় পরা শুরু করলাম — এতোটুকু পাড় ছিল না, সেই কাপড় কিনে, সেই কাপড় পরলাম। মাকে বললাম, 'মা, আমাদের জন্য আর মাছ-মাংস কিছু করবে না — আমরা খাবো না।' ব্যস্, ছেড়ে দিলাম এইসব করে — ঐ বছর থেকে আমরা এইরকমভাবে চলছি।

আহসান : একেবারে ছোট থেকেই তাহলে এই ব্রত?

যূথিকা : আমার ন'বছর বয়সে আমি যখন কমল দাশগুপ্তের কাছে গেছি গান শিখতে — রেকর্ডের, তখন এইরকম ড্রেস আমার। যখন জ্ঞানবাবুর কাছে গান শিখছি তখনও আমার এইরকম পোশাক। ভীষ্মদেবের কাছে গান শিখছি যখন, তখনও। মানে তারপরে আমি ছাড়িনি, সেই সাজটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল। আমার এই সাজটা পরে বেশ আনন্দ হয়েছিল। যখন বোম্বে যাই, তখনও কিন্তু আমি এই কাপড়ে। কী জানি, গ্রামোফোন কোম্পানি আমাকে এই সাজের জন্যেই বোধ হয় ওখান থেকে তাড়িয়েছে! বোম্বেতে কিন্তু ওরা খুব মেনেছিল। এখন যতোটা পরি, আগে এর থেকেও শাদা পরতাম। কিছুই জানতাম না তো, গেঁয়ো — আমি গ্রামে ছিলাম, সেইভাবে আমি বোম্বে গেছি। আমার একটু দ্বিধা হয়েছিল যে, কলকাতাতে কলেজ-টলেজে যখন যাই তো সাজগোজ দেখে কী রকম করে! বোম্বেতে এইভাবে আমাকে দেখে ওরা কিন্তু এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি — আমাকে আরো আসনের উপরে তুলে দিলো। আমাকে 'মীরা বাঈ — মীরা বাঈ' বলতে লাগলো। কী সাংঘাতিক! একেবারে আমার কাছে এলো — আমার মুখের ভাষা শুনবে। আমি ভাষার জন্যে কথা বলতে পারছি না, ভাষা জানি না তো! আমি তখন হিন্দিটা ভালো জানি না,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা যেখানে 'হ্যাঁ' বলার কথা, সেখানে 'না' বলছি, তাতেই ওরা খুশি — একেবারে সেই ঘিরে ধরেছে, বুঝলেন! ঘিরে ধরেছে একেবারে। আর কী সম্মান — মানে ভাবা যায় না! আমি মনে মনে বললাম, একি রে বাবা! যে দেশে গেছি আমাকে কেউ ছোট — মানে নিচু চোখে দেখেনি।

আহসান : অবশ্য দেখার কথাও তো নয়। তা আপনার দিদিও কি এই ব্রত মেনে চলেছেন?

যূথিকা : হ্যাঁ, দিদি বারো বছর পর্যন্ত চলেছে। ও এমএ পড়তো অঙ্কে। সে তখনও কলেজে এই ড্রেসে গেছে। খালি পা, বুঝলেন!

আহসান : উনি ঘর-সংসার করেননি?

যূথিকা : দিদি তারপর বিয়ে করেছে, পছন্দ করে। তারপরে ছোট বোন — ও বারো বছর পর্যন্ত করে — বারো বছর কি এগারো বছর — ও আর করতে পারেনি। কারণ ও অসুস্থ হয়ে পড়তো। অসুস্থ হলো — হার্টের অসুখ হলো। ডাক্তার বললো, 'মাছ-মাংস না খেলে এ সারবে না।'

আহসান : তো যূথিকাদি, রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছে — রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে — 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে'। আসলে প্রেম তো অনেক সময় নিঃশব্দ চরণেও মানুষের জীবনে আসে, তাই না!

যূথিকা : হ্যাঁ, এসেছিল। সেটা আবার কমল দাশগুপ্তই আমাকে খুব বিপদে ফেলেছিলেন। আমি তখনও এরকম — ওনার কাছে আমি যখন গান শিখি তখন কিছু বলেননি। তারপর একসময়ে বলেন, 'না, গ্রামোফোন কোম্পানির যারা গান লেখে — প্রণব রায় — ও তো বলে তোমাকে দেখলে ওর ইন্সপিরেশন বেড়ে যায়। সেই ভাব নিয়ে ও গান লেখে, তোমার গান।' তা আমি বললাম যে, 'বাবা, তা-ও ভালো!' যাই হোক, কমল দাশগুপ্ত কিন্তু প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে ঢুকেই — সেদিন ছিল ভাইফোঁটা — আমরা ভাইদের ফোঁটা-টোটা দিয়ে, পুজোর ঘরে থালা রেখে দিয়েছি, আর সেদিন কমল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দাশগুপ্ত এসে আমাকে দেখে — আমি কিন্তু কখনও এরকম বিপদে পড়িনি, আমি কমল দাশগুপ্তকে শ্রদ্ধা করি — সুধীরার ভাই, বিমল দাশগুপ্তের ভাই — আমি একেবারে আনন্দে বলছি যে, — 'আমি সুধীরার মতো গান শিখবো খুব ভালো করে' — আমি সেই আনন্দে ওখানে দাঁড়িয়েছি মা'র পাশে। তো মা বুঝি কমল দাশগুপ্তের জন্যে চা-টা এসব আনতে ভিতরে গেছে। আমাকে দেখে কিছুক্ষণ পর দেখি ও চুপচাপ করে বসে আছে — বেশি কথা বলতো না। বসে তারপর চিৎকার করছে, 'এসো, ঘরের মধ্যে।' মা শুধু আমাকে বলে গেলো যে, 'রেণু, তুমি ঐ ঠাকুরঘর থেকে ভাইফোঁটার ঐ থালাটা সাজানো আছে সেটা নিয়ে এসে কমল দাশগুপ্তের কপালে টিপ দিয়ে — ভাইকে টিপ দিয়ে তারপর গান শিখতে বসো। আজ প্রথম দিন, আজ তুমি ওর কপালে টিপ দিয়ে ভাইফোঁটা দিয়ে তারপর গান করো।' মা'র খুব ভয় ছিল যে, আমি বোধ হয় প্রেমে-ট্রেমে পড়ে যাবো। আমি ভাইফোঁটার থালাটি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। উনি চিৎকার করে উঠলেন — মানে বাইরের লোকও শুনতে পেয়েছে, বুঝলেন! এতো জোরে চিৎকার। চিৎকার করে বলছে, 'মা, মা, রেণুকে বারণ করুন। ভাইফোঁটা আমি নেবো না — ভাইফোঁটা যেন না দেয়। ওকে বারণ করুন।' 'বারণ করুন' — 'বারণ করুন' বলে চিৎকার করছে। মা এসে তারপর বলছেন, 'কী হলো — কী হলো!' 'না, মা — ' আমার সামনে, আমার সামনেই বলছে, 'রেণুকে ফোঁটা দিতে বারণ করুন। আমি ভাইফোঁটা ওর হাত দিয়ে নিতে পারবো না। আমি ঠিক করেছি ওকে বিয়ে করবো।' আমি তখন বলছি যে, 'মা, আমি শাদা কাপড় পরা তো, ও মনে করছে আমি বিধবা!' ও তো বলেই চলেছে, 'রেণুকে বিয়ে করবো।' আমি বললাম যে, 'আমি বিয়ে করবো না। আমি একটা ব্রত নিয়েছি। আমি সেই ব্রতটা পালন করছি। আমি সেজন্যে বিয়ে করতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারবো না।'

আহসান : আপনি বললেন, না আপনার মা বললেন?

যূথিকা : আমিই বললাম, মা বললো না — আমিই বললাম যে, 'আমি বিয়ে করবো না। বিয়ে করলে আমার গান শেখাটেখা সব শেষ হয়ে যাবে' — আমি তখন সবে শুরু করেছি গান শেখা — 'আমার গান শেখার কিছু হলো না, আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না।' আসলে গান পেলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। গান ছিল আমার প্রাণ। আমি বললাম যে, 'দেখুন, আমি কিন্তু বিয়ে করবো না।' উনি বললেন, 'আমি অপেক্ষা করবো, যতোদিন তোমার ব্রত না সারে।' আমি বললাম যে, 'না, অপেক্ষা করলেও আমি ছাড়বো না এই ব্রত।' তখন চুপ করে গেলেন। কিন্তু মনে মনে আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমাকে বাড়িতে এসে গান শেখাতেন, নানা রকমের সব কথা বলতেন — গলা সাধাতে আমি কাঁচা ছিলাম। প্রথম গান 'সাঁঝের তারকা' ওটা এমনি ভালো হলেও — হিট হলেও, আমি ঠিক গ্রামোফোন কোম্পানির বাঁধা শিল্পী তখনো হইনি। উনি এসে আমাকে ওগুলো করলেন। ভালোবাসতেন খুব। আমিও ওঁর কথা খুব ভালোবাসতাম — ওঁকেও ভালোবাসতাম। কিন্তু সে ভালোবাসাটা অন্য রকম — মানে যে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করতে হবে, নিজস্ব একটা সংসার চাই, ওটা না হলে হবে না — এ রকম না। হয়তো আমাকে বোম্বে-টোম্বে কোথাও যেতে দেবে না — 'না, কোথাও যাবে না। আমাদের এই রেকর্ড যা হবে, যতোদিন যা হবে, শুধু রেকর্ড করে যাও। আমি তোমাকে কথা দিলাম, আমি সারা বছর তোমার রেকর্ড করে যাবো।' কোথাও যেতে দেবে না। কেউ যদি ডাকতে আসে তার সাথে দেখা করতে দেবে না। তারপরে ওঁর তখনও মনে মনে ঐ ভাবটা আছে দেখে আমি বললাম যে, 'না আমি বিয়ে করবো না, আমার গান নষ্ট হয়ে যাবে।' আবার পরে আমি জানতে পারলাম,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে মনে একটু কষ্টও হলো যে, যাঁর এতো ইচ্ছে বিয়ে করার — ভালো তো বাসে। কিন্তু ওঁদের বাড়ির যে বউ হবে — ওঁদের বাড়ির নিয়ম, ওঁর মা'র নিয়ম, সেখানে গান গাইতে পারবে না। মানে বউরা গান গাইবে না — নিজের ছেলেমেয়ে শুধু গাইবে। আমি মাঝে মাঝে যেতাম, বোনেদের সঙ্গে আমার আগেই আলাপ ছিল। ঐ বোনদের সঙ্গে কথা-টথা বলতাম। তা দেখতাম, দাদা বিমল দাশগুপ্তের বউকে একেবারে ধুতি পরিয়েছেন — মানে বিমলদা মারা গেছেন, ছোট্ট কাপড় পরেছেন আট হাত কাপড় গায়ে খালি — বুঝেছেন! সবসময় রান্নাঘরে — সবসময়ে। আর প্রতিবছর বাচ্চা-কাচ্চা। আর বাচ্চা তো একেবারে মানে ভিখিরি — গায়ে জামা নেই — সব নোংরা। আমি বিয়ে করিনি। 'তুমি অপেক্ষা করো, আমার এই বারো বছর হয়ে গেলে তারপরে বিয়ে করবো' — আমি এইসব কিছু বলিনি — বলেছি, 'না, আমি বিয়ে করবো না।'

আহসান : এরপরে উনি আর কখনও এই প্রসঙ্গ তোলেননি?

যূথিকা : কখনোই তোলেননি। কিন্তু অনেক বছর পর্যন্ত উনি বিয়ে না করেই ছিলেন — আমার অপেক্ষায় ছিলেন। তারপরে ফিরোজার সঙ্গে বিয়ে হলো। আমাকে কিছু জানায়নি। পরে বাইরের লোক এসে আমাকে সব বলতো। কারণ ওরা তো জানতো যে, কমল দাশগুপ্ত রেণুর জন্যে অপেক্ষা করছে। আর তখন যা বয়েস হয়ে গেছে, তখন আমাদের বিয়ে করারও বয়েস না দুজনের। কারণ ওরা যে তলে তলে ওটা করছে — কমল দাশগুপ্ত আমাকে কোনোদিন এ বিষয়টা বললেন না। কমল দাশগুপ্ত আর ফিরোজা তখন কেউ আমাকে বলেননি — গোপন করেছে সব, আমার কানে যাতে না আসে। আমি অনেক পরে — এক বচ্ছর পরে জানলাম যে, ওরা এই করেছে। কমলদা আমার কাছে প্রায়ই আসে আমাকে গান শেখাতে, তা দেখি একেবারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসেই না। তারপরে শুনলাম যে, ফিরোজাকে বিয়ে করে নাকি ও ঢাকায় চলে গেছে — মুসলমান হয়ে ঢাকায় চলে গেছে।

আহসান : যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

যূথিকা : আমি কিচ্ছু জানি না। সেই যে চলে গেলো, আমাকে বলেও যায়নি। ফিরোজা আসতো তা-ও আমি জানতাম না, এতো লুকিয়ে লুকিয়ে ও যে এসে রেকর্ড করছে আমি জানতাম না। আসতো, গোপন করে — একেবারে গোপন করে রেখেছিল। তারপরে দেখি আসে না। আমার কাছে যখন মাঝে মাঝে আসতো না — আমি ভাবতাম আসছে না কেন — আসছে না কেন? তারপর শুনলাম যে চলে গেছে ঢাকায় মুসলমান হয়ে। সেইটে একটা মস্তবড়ো আমার মনে আঘাত — এরকম আঘাত আমি কারো কাছে পাইনি।

আহসান : তা আপনি এখনও কি কমল দাশগুপ্তের অভাব অনুভব করেন?

যূথিকা : না, আমি সেটা করি না। আমি এখন জোর করে সেটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি। যখন সে বিয়ে করেছে, নিজের ধর্মকে সে ছেড়েছে, আমি তখন ওকে মন থেকে মুছে ফেলেছি — ওর সুরকে আমি ভালোবাসি — এই পর্যন্ত । কিন্তু ওর সম্পর্কে কিছু ভাবতেও আমার আর ইচ্ছে করে না।

আহসান : এই প্রসঙ্গে আরেকটু জানতে চাই যে, কমল দাশগুপ্তের মনে যে আপনার প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল, অনুরাগ ছিল, একটা মোহ ছিল — এইরকম দুর্বলতা আর কারো মধ্যে কি ছিল?

যূথিকা : না, আর কারোর মধ্যে আমি পাইনি। তবে এই যেমন — মানে কাকার বিয়ে — তখন আমি ছোট — ঠাকুমা কিংবা পিসিমা — আমার সাত পিসি — তারা এই 'রেণুর সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া হবে' — এইসব বলতেন।

আহসান : রসিকতা করে বলতেন?

যূথিকা : রসিকতা না, মনে মনে ঠিক করতো। কিন্তু সে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাকে চায় কি না — তখন ওসব ভাবতো না — ওরাই সব রটাতো ওরকম করে — 'এই রেণুর সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। ও রোজ রোজ আসে রেণুকে পটাতে। দেখো নিশ্চয়ই ওরা বিয়ে করে চলে যাবে' — এরকম।

আহসান : তো আপনি কি এখন মনে করেন যে, আপনার এই একা থাকার সিদ্ধান্ত সঠিক?

যূথিকা : আমি বলছি, আমি যখন অতো বড়ো একটা সম্পদ পেয়েছি, তখন সঠিক। আমি যতো দুঃখই পাই না কেন — আমি যে কমলদাকে বিয়ে করবো না বললাম, সেটা আমার দুঃখও হয়েছিল, যে একটা লোকের আশা, হয়তো কতো আশা। আমি না হয় নিজের জীবনটা ছেড়ে দিয়ে ত্যাগ করলাম আমার ইচ্ছাটা। কিন্তু আমার গানকে আমি এতো ভালোবাসি যে ওর থেকেও আমি ভালোবাসি — যার জন্যে আমি পারলাম না — আমি ওকে 'না' বলে দিলাম।

আহসান : আপনি শিল্পী হিসেবে কি তৃপ্ত?

যূথিকা : শিল্পী কোনোদিন তৃপ্ত হয় না। এই এক শেখার অসীম জিনিস। এখনও কতো কিছু শিখবার আছে। আমি যতোটুকু, আমি যেটুকু শিখেছি সেটুকু কিছুটা — সামান্য — এই আমার মনে হয়। আমি যতোটুকু পেরেছি — ক্ল্যাসিক — বাংলা সবরকম তো আমি শিখতে পারিনি। আমার সময়ে তো আমি শিখতে পারিনি। আমার সময়ে তো সবটা হয়নি। আমি যতোটুকু সেই জিনিসটা ধরেছি আমি তাতে সাকসেসফুল, আমি সফল হয়েছি। এইটেই হচ্ছে আমার ঠাকুরের আশীর্বাদ।

আহসান : বাংলা গান এখন অবক্ষয়ের কবলে — এই ধরনের একটা আফসোস — এই ধরনের একটা অভিযোগ — কিংবা দুর্ভাবনা আমাদের সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে কাজ করে। এ সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

যূথিকা : হ্যাঁ, আমিও বলি — কেননা আমাদের সম্পদ অসীম, আর আমাদের যে সম্পদ অতো সুন্দর তা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনকে ভালো রাখে, সকলের সঙ্গে সমানভাবে চলতে পারে। কিন্তু সেই সম্পদকে ভুলে গিয়ে আজকাল আমাদের যে সমস্ত শিল্পকলার চর্চা হচ্ছে, — গান-বাজনা-নাচ — সব কিন্তু বাইরের, নকল হচ্ছে। এতে বাংলারই, আমার দেশেরই ক্ষতি — এটা আর কিছু না। আপনি দেখবেন এখনো একটা বাচ্চাকে বলুন তো সে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা বলতে পারে কিনা! ওটা জানেই না। ওরা হয়তো কোনো প্র্যাক্‌টিস করেনি, — গানে তাদের নাম হয়ে গেছে। টিভিতে ওদেরই প্রোগ্রাম হচ্ছে, ওদেরই রেকর্ড — ওরা সব নিজেরাই গান লেখে, নিজেরা শেখে, নিজেরা সুর দেয়, নিজেরাই মিউজিক করে — আর মিউজিক হচ্ছে সব ওয়েস্টার্ন মিউজিক। আমাদের দেশের মিউজিক — আমাদের দেশের মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট একটাও নেই — সব উঠে যাচ্ছে, তবলা উঠে যাচ্ছে, আপনার সেতার উঠে যাচ্ছে, এস্রাজ উঠে যাচ্ছে, তারপর জলতরঙ্গ — কতো রকম আমাদের আছে — সব উঠে যাচ্ছে।

আহসান : বাঁশি?

যূথিকা : হ্যাঁ, বাঁশি। আমরা তো ঐ দিয়েই গেয়ে এসেছি — সব ঐ।

আহসান : আপনাদের পরের কয়েক প্রজন্ম — তারাও কিন্তু বাংলা গানকে ধরে রেখেছিলেন। আপনাদের পরে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অখিলবন্ধু ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় — এরকম আরো অনেক নাম আসে আর কি। কিন্তু তারপরে তো একটা বিরাট শূন্যতা। কেন এই শূন্যতা? না ভালো গায়ক, না ভালো গীতিকার, না ভালো সুরকার — কেউই তো আর এলেন না। কেন?

যূথিকা : কারণ তারা নিজের সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে অপরের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওয়েস্টার্ন মিউজিক এইসব নিয়ে মেতে উঠেছে। তারা আধুনিক হতে চাইছে — তারা নিজেকে আরো স্মার্ট বানাতে চাইছে — আমাদের বাংলার যেটা সম্পদ সেটা পেতে গেলে খুব সাধনা করতে হয়, জীবন দিয়ে সাধনা করলে তবে এইটা পেতে পারে। কিন্তু এই কষ্টটা তারা নিতে চায় না। এই কষ্টটা তারা বাদ দিয়ে হঠাৎ একটা শিল্পী হতে চায় এবং নিজের সম্পদ নিজের জিনিসকে ছেড়ে তারা বাইরের জিনিসকে আয়ত্ত করছে। এইজন্যে মাঝখানে এতো গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের জিনিসই শুনতে পাই না। একটা ভালো কীর্তন আমি শুনতে পাবো না — সেরকম গায়ক-গায়িকাও নেই। তারা সকলেই তো ঐ দিকে। নিজেরাই গান বানাচ্ছে, কোনো ভালো লেখক খোঁজে না। আগে যখন আমাদের সময়ের কি তার আগে তারা কিন্তু বাড়ি বাড়ি গিয়ে — দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাড়ির থেকে টেনে বের করে নিয়ে যেতো শিল্পীকে — এরকম লোক থাকতো। তাদের অফিসাররাও সব চলে যেতেন, ওরকম খুঁজে বের করার জন্যে — যেমন মাধুর পণ্ডিতকে লখনউ থেকে নিয়ে আসলেন। এই করাচি থেকে একজনকে নিয়ে আসলেন। এমনি এমনি কেউ এখানে আসেনি। কিন্তু এরা জানতো — তাই নিজেরাই সব ঘরে ঘরে গিয়ে খুঁজে আনতো। আমাকে যেমন বাড়ির থেকে ভগবতীবাবু নিজেই নিয়ে আসলেন। তা নইলে তো আমি চলেই যেতাম হয়তো 'হিন্দুস্তানে'।

আহসান : আপনি ঠিকই বলেছেন যে, বাঙালি নিজের ঘরের সংস্কৃতিচর্চা থেকে দূরে সরে গেছে। যেমন একসময় বাংলা গানে কতো রকমের নিরীক্ষা হয়েছে। শচীনকর্তা — তিনি লোকগানকে আধুনিক গানের সঙ্গে মিশিয়ে একটা নতুন ধরনের গান সৃষ্টি করেছেন। রাগাশ্রয়ী আধুনিক বাংলা গানের চল তো তাঁর হাতেই। সেই যে একটা নিরীক্ষার সময় বাংলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গানের তা তো শেষই হয়ে গেছে। বাংলা গানের এই যে দুর্দশা, এর থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় নেই?

যূথিকা : না, মুক্তি পেতে গেলে আমাদের ঐ জিনিসটা ছেড়ে যদি আমাদের দেশের গানকে ঠিক মেনে নিতে পারে — তা তো পারে না। তা যারা পারে, তারাও যে চলে যাচ্ছে — এইটেই হচ্ছে সব থেকে দুঃখের। আমার মনে হয়, এরা এখন যারা গান করছেন, তারা টাইমটা খুব শর্টকাট করে নাম করতে চাইছেন। অল্প একটু সাধনা করবো, অল্প একটু গাইবো, কারো কাছে যাবো না — এই করে তারা আমাদের জিনিস — সত্যিকারের সম্পদটাকে হারিয়ে ফেলছে। এই জিনিসটা রাখতে গেলে — আমাদের আসল জিনিসটা রাখতে গেলে, আমাকে অনেকের কাছে যেতে হবে, আসল কোনটা সেটা আমাকে বুঝতে হবে, সেইভাবে আমাকে নিতে হবে আর সেইভাবে সাধনা করতে হবে — তাহলেই এই জিনিসটা পাবে। এই যে কষ্ট, এই যে মাথা নিচু করে গুরুর কাছে যাওয়া, এগুলো এখন যারা উঠছে তারা করতে চান না। তারা সেটা বাদ দিয়ে হঠাৎ নাম কিনবার একটা আশা — এটাতে তারও ক্ষতি এবং আমাদের দেশেরও ক্ষতি। আমার মনে হয় এই জিনিসটাকে একদম আইন করে বন্ধ করা উচিত। আগে আমাদের জিনিসটা শিখবে, তারপরে তুমি অন্য কিছু শেখো।

আহসান : যূথিকাদি, আমরা পুরোনো প্রসঙ্গে আবার একটু ফিরে যেতে চাই — আপনি তো নানা ধরনের বাংলা গান করেছেন, আধুনিক গান করেছেন এবং আধুনিক গানের একটা ধরন আপনি সৃষ্টি করেছেন। আপনি ভজন করেছেন, ফিল্মে গেয়েছেন — গীত-গজল এসব করেছেন। আপনি রজনীকান্তের, অতুলপ্রসাদের গান, নজরুলের গান করেছেন।

যূথিকা : রবীন্দ্রও করেছি। রবীন্দ্রসংগীতও আমি করেছি।

আহসান : এইটেই আমি জানতে চাইছিলাম যে, আপনি রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন কিনা?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যূথিকা : রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে আমার জীবনের শুরু। খুলনাতে একটি স্কুল ছিল, প্রবোধ মজুমদার — তিনি শান্তি নিকেতন থেকে পাশ করে খুলনাতে একটি স্কুল করেছিলেন। মেয়েদের একটা গ্রুপ ছিল সেখানে। আমার বাবা খুলনাতে যখন কাজ করতে যেতেন, আমাকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। সেখানে বাবার যিনি বস্, আমার গান শুনে তাঁরও খুব ভালো লাগতো। তিনি বলেছিলেন, 'এখানে রেণুকে — যূথিকাকে প্রবোধবাবুর স্কুলে ভর্তি করে দিন।' বাবার নাম সত্যেন্দ্রনাথ রায়, তো উনি বললেন, — 'সত্যেনবাবু, ওকে ঐ স্কুলে ভর্তি করে দিন। ওরা প্রতি ঋতুতে অনুষ্ঠান করে — বসন্তোৎসব-শারদোৎসব — এইসব প্রতিটা উৎসবে যে ঋতুর যে গান, সেইটে শিখিয়ে এই ছোট ছোট মেয়েদের দিয়ে করাচ্ছে। রেণুকে ওখানে ভর্তি করে দিন, ওসব রবীন্দ্রসংগীত শিখে নেবে।' বাবা আমাকে সেখানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন এবং আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আমি ছিলাম — তারাও যেতো ওখানে। আমিও যেতাম সেখানে — যখন আমাদের সেই উৎসবটা আরম্ভ হতো আমাকে ডাকতেন। সকলের একলা একলা গান ছিল না — যেমন একটা গ্রুপের মধ্যে দিয়ে গান হতো। একটু একটু করে সকলেই গাইছে, কিন্তু সেখানে আমি একলা গাইতাম। এবং শুনে শুনে আমার সব গানই শেখা হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে এসে স্টেজ করে নিজে নিজেই আমার ভাইবোনদের নিয়ে আমরা সেই উৎসব করতাম।

আহসান : পরে রবীন্দ্রসংগীতের সেই চর্চাটা রাখলেন না কেন?

যূথিকা : না, আছেই আমার। কিন্তু আমি রেকর্ড করতে পারিনি, তখন খুব কড়াকড়ি ছিল। কড়াকড়ি ছিল মানে ঐ শান্তিনিকেতনের থেকে শিখতে হবে। তারপর যখন স্যাম্পল আসবে তখন ওরাই জাজমেন্ট দেবে। এখন ওদের ভাবটা আমার এইসব আধুনিক গেয়ে-টেয়ে যদি উলটে যায়, বা ওদের কানে কিছু না লাগে —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেইজন্যে কমলদা বললেন যে, 'তুমি ওর মধ্যে আর যেয়ো না, হয়তো বাদ দিয়ে দেবে, বলবে — হয়নি।'

আহসান : লোকসংগীত আপনার কেমন লাগে?

যূথিকা : আমার খুব ভালো লাগে। আমি আব্বাসউদ্দীনের কাছে ভাটিয়ালি শুনতাম, রেকর্ডেও শুনেছি। ওনাকে সামনেও আমি দেখেছি — আমাকে উনি খুব স্নেহ করতেন। আব্বাসউদ্দীনের ঐ গানটা আমি ছোটবেলায় শিখেছিলাম — 'ও আমার দরদি, আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না'।

আহসান : এই গানটি কবি জসীমউদ্‌দীনের লেখা।

যূথিকা : তাই! ও গানটা আমি এখনও গাই। আমি যখন রেওয়াজ করতে বসি, ও গানটাও গাই — এতো ভালো লাগে। আব্বাসউদ্দীনের গান তখন খুব পপুলার ছিল। সে গানগুলো শুনে আমার এখন আর কারো গান শুনতেও ইচ্ছা করে না। তাঁর মুখে যেসব গান শুনেছি, সেগুলো আমার এখনও মনে পড়ে। সে গানগুলো আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল — এখনও লাগে।

আহসান : আব্বাসউদ্দীনই কি লোকগানের আপনার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী?

যূথিকা : আমার কাছে হয় তো তাই। আমি বলতে পারি আমার কাছে আব্বাসউদ্দীন সবচেয়ে প্রিয়।

আহসান : সব মানুষের জীবনেই স্বপ্ন থাকে এবং মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে স্বপ্ন দ্যাখে — তো আপনার জীবনের স্বপ্ন কী? তা কি পূরণ হয়েছে?

যূথিকা : আমার যতোদূর মনে পড়ছে যে, আমার জীবনের যা স্বপ্ন ছিল তার কিছুটা পূরণ হয়েছে। গানের শিল্পী হিসাবে, নানা রকম গান শেখার হিসাবে, যাঁদের যাঁদের গান আমি ভালোবাসতুম তাঁদের আমি ভাগ্যবশত ঠাকুরের আশীর্বাদে পেয়েছি। তাঁরা আমাকে অতি স্নেহ করে, একেবারে নিজের বোনের মতো করে আমাকে গান শিখিয়েছেন এবং আমার মনে হয় এটা আমার খুব বড়ো — [illegible] থেকে বড়ো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সফলতা। আমি যেটুকু শিখেছি, যতোটুকু আমি শিখেছি, যে গানই শিখেছি আমি — সারাদেশকে গান শোনাতে পেরেছি — এটা আমি কখনো ভাবতেও পারিনি। কিন্তু সেটা আমার ভাগ্যে এসেছে, সেটাও আমার একটা খুব বড়ো আশীর্বাদ ঠাকুরের। আর যেগুলো পারিনি সেটা হচ্ছে ক্ল্যাসিক্যাল গানটা আমার খুব ভালোভাবে শেখা হয়নি। আমার বাবারও ইচ্ছে ছিল যে, একবারে সম্পূর্ণভাবে শিখি, ঐটে নিয়েই থাকি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল গানটা আমি জানি কিছুটা — রাগরাগিণী কী রকমভাবে যাবে — আসবে সেগুলো আমি কিছুটা শিখেছি, কিন্তু সেটা আমার সম্পূর্ণ হয়নি। আমার মনে হয় যে, ওটা করবার জন্যে আমার যে সময়টা দেওয়া দরকার ছিল, তা আমি দিতে পারিনি। সেটা করতে গেলে আমার সারাজীবন শুধু ক্ল্যাসিক্যাল নিয়েই থাকতে হতো — তা সেটা আমার হয়নি। এটা আমার একটা আক্ষেপ। আর আরেকটা দিক ছিল, আমি ছোটবেলা থেকে ঠিক করেছিলাম যে, যাঁরা আমার গুরু হবেন, সে আমার পড়াশোনারই হোক — গানবাজনারই হোক, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করবো বা মাথা আমার সবসময়ই তাদের পায়ে নত হবে, কিন্তু আমি কখনো তাঁদের এই যে বিয়ে করবো — একটা বাঁধনের মধ্যে তাঁদের সাথে আমি কখ্খনো সেভাবে যাবো না। সেটা আমার হয়েছে। যাঁরা আমাকে শিখিয়েছেন, তাঁরা আমাকে সেই নিজের জন বলে আপনজনের মতো তাঁরা আমাকে সেইভাবে শিখিয়েছেন। এটাও আমার খুব বড়ো একটা মনের সান্ত্বনা। আর নানা দেশে ঘোরা, নানান রকম লোক — তাদের খাওয়াদাওয়া সবকিছু, অনেক রকম — যেটা আমি কখনো ভাবতে পারিনি সেটা হবে, সেটাও আমার পূরণ হয়েছে তাদের সঙ্গে মিশে। আর যাবার সময় জার্নিতে — ট্রেনেতেই আমার কতোরকম লোকের সঙ্গে দেখা হয় আর প্লেনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গেলাম — প্লেনে হয়তো কথা বলতে দেয় না। সেখানে আমার কিছু করার নাই। কিন্তু প্লেনটা কীভাবে যায়, তার নিয়মকানুন, কীভাবে সেখানে নামে, তারপরে কী রকমভাবে যেতে হয়। যেমন এখনো যদি আমি প্লেনে যাই হুইলচেয়ারে আমাকে অনেকখানি যেতে হয় আমার জিনিসপত্র আনতে বা ট্যাক্সিতে চড়তে। সেটা আমার পূরণ হয়েছে। যেসব জায়গায় আমি গেছি — সব জায়গা থেকে আমি প্রচুর সম্মান-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পেয়েছি। আমি সেখানে গিয়ে মনে করি না যে এরা তো আমার পর, আমি সেরকমভাবে চলি। তা তারা একেবারে আপন করে আমাকে নিয়েছে, সেটাও আমার একটা পূরণ হয়েছে। এটা তো সকলে পায় না। অর্থ, জিনিসপত্র — এসব হয়তো আসে যায়, পাওয়া যায় — কিন্তু এই যে এতো ভক্তি-ভালোবাস, এতো শ্রদ্ধা এখনও পর্যন্ত পাই। সেই ছোটবেলায় তখন মানুষ স্নেহ করতো, প্রাণভরে ভালোবাসতো, স্নেহ করতো, বুকে জড়িয়ে ধরতো — এখন কিন্তু তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে — ভালোবাসে। সে ভালোবাসার অন্য দাম। শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, ভক্তি করে — সবসময় তারা তাদের মাথা আমার পায়ে নত করে, যেটা আমি কোনোদিন ভাবিনি! এটা আমার পাওয়া উচিত কিনা — আমি তো অতোখানি উঠতে পারিনি। কিন্তু তাহলেও তারা যেটুকু যেভাবে করে আমি সেটা বারণ করি না। আমি তাদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন তাদের সব আশা পূর্ণ করেন এবং তারা যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে।

: গান গেয়ে জীবনে যা পেয়েছেন, তার মূল্যায়ন করবেন কীভাবে?

: হ্যাঁ, শুধু গানের জন্যেই আমি সাধু-সন্ন্যাসী যাঁরা তাঁদের কাছেও খুব প্রাণভরা ভালোবাসা পেয়েছি — আপন মনে করে তাঁরা আমাকে কাছে নিয়েছেন। আবার আমাদের দেশের যাঁরা স্বাধীনতা নিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে আছেন। মহাত্মা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গান্ধীজি আমার গান শুনতেন, সেটা আমার বড়ো পাওয়া। সরোজিনী নাইডু তিনিও আমার গান শুনতেন এবং তিনি নিজেই আমার কাছে এসেছিলেন আমাকে দেখবার জন্যে। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, 'মহাত্মাজি তোমার গান ভালোবাসেন, রেকর্ডে সব গান শোনেন এবং যখন প্রার্থনা হয় তখনও তোমার রেকর্ড বাজিয়ে তিনি প্রার্থনাসভা শুরু করেন। তুমি তাঁকে দেখবে?' এই যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু — তিনি তখন আমাকে চেনেনও না, দেখেনওনি, আমিও তাঁকে জানি না কিন্তু তিনি গানের মধ্যে দিয়ে আমাকে যে সম্মান দিয়েছিলেন স্বাধীনতা দিবসে পতাকা যখন তোলা হয় আমিই গেয়েছিলাম — ব্রডকাস্ট করেছিলাম। এগুলো সমস্ত আমার গানের জন্যেই হয়েছে — গানের ভিতর থেকেই হয়েছে। গান আমাকে সমস্ত নতুন রাস্তা দেখিয়েছে — নতুন আলোর রাস্তা, সেটা আরো ভগবানের কাছে — সাধনার মতো ভগবানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া — এগুলো আমি পেয়েছি। তা গান না হলে তো হতো না। আমার এই বয়সেও আজকে আমি যে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছি, এই বয়সেও যে এতো লোকের সঙ্গে আমি মিশতে পারছি, এখনও পর্যন্ত সেই একইভাবে তারা আমাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে — তারা আমাকে ভুলে যায়নি। আমি তো এখন গাইছি না — কবে আমি গেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে ভোলেনি। কেন? — এই ভজন গান, এই ভক্তিমূলক গান, নজরুলগীতি — এসবের জন্য তারা আমাকে এখনো মনে রেখেছে, এখনও আমাকে তারা সম্মান দেয়। সমস্ত প্রোগ্রামে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, আমার হয়তো বলতে কষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও তারা আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার হাত ধরে সব আমাকে নিয়ে যাচ্ছে — এটা আমার সব থেকে বড়ো আনন্দ। আর যদি বলেন যে, 'তোমার কি মনে হয়, তুমি কিছু পাওনি?' তাহলে বলবো,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম হচ্ছে শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পূর্ণভাবে আমি করতে পারিনি, সম্পূর্ণভাবে ঐটি নিয়ে থাকতে পারিনি — আমাকে নানা রাস্তা দেখতে হয়েছে চলবার জন্যে — এই একটা। আর একটা হচ্ছে, আমি যাকে বিয়ে করবো না বলেছিলাম, সে-ই আমার গুরু। কিন্তু তার কাছ থেকে আমি শেষের দিকে খুব বড়ো একটা আঘাত পেয়েছি — সেটা আমার জীবনের সব থেকে বড়ো একটা শূন্যতা, বড়ো অভাব আর সবসময় আমাকে সেটা খুব কষ্ট দেয়। সেটা ভাবলে আমার মন বড়ো বিষাদে ভরে যায়। আমি খুব কষ্ট পাই এটা ভাবলে যে, আমি যদি একটু জানতাম তাহলে হয়তো কোনোভাবে তাকে বাধা দিতে পারতাম — এইটেই আমার মনে হয়। তার সমস্ত জীবনটা ছিল গানের ভিতর দিয়ে — কতো সুর দিয়েছেন, কতো হাজার হাজার শিল্পীকে বানিয়েছেন — তুলেছেন, রেকর্ড করে তারা নাম-যশ পেয়েছে — তাকে কিন্তু আমার মনে হয় ঠিকমতো সম্মান দেওয়া হয়নি। তাকে সেরকমভাবে ভালোবাসতে পারেনি আমার দেশের লোকেরা — তাঁর যতোখানি গুণ তার উপযুক্ত কোনো সম্মান সে পায়নি এটাও খুব দুঃখের।

আহসান : জানতে খুব ইচ্ছে হয়, আপনি কি গান গাইতে গাইতে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চান?

যূথিকা : হ্যাঁ, আমি গান গাইতে গাইতে যদি যেতে পারি তাহলে আমার সব থেকে আনন্দ হবে — সব থেকে আনন্দ হবে। কিন্তু এটা তো আমার ইচ্ছের উপরে নয়, এটা হচ্ছে ঠাকুর যেভাবে আমাকে নেন, সেভাবেই আমি যাবো, তাতেই আমি খুশি। তবে আমি একটা জিনিস চাই না যে আমি অনেক বছর, অনেক দিন ধরে ভুগবো, ভুগতে ভুগতে বেঁচে থাকবো, — এটা আমি চাই না। আমার মৃত্যুটা যেন না ভুগে খুব তাড়াতাড়ি হয় — যা হবার হবে, আমি আনন্দে আনন্দে চলে যাবো।

আহসান : তাহলে কি গান গাইতে গাইতেই চলে যেতে চান?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যূথিকা : হ্যাঁ, গান গাইতে গাইতেই আমি চলে যাবো। আমি ভুগতে চাই না — সেটা আমার খুব বাজে লাগে।

আহসান : আপনার জীবনের শেষ ইচ্ছার কথা কি জানাবেন?

যূথিকা : আমার শেষ ইচ্ছা — এখন আমি সবসময় চাই, আমার গান যেন বেঁচে থাকে। তার সঙ্গে কমল দাশগুপ্ত, কাজীদা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেই যেন আমার সঙ্গে থাকেন — তাঁদের নামও যেন চির অক্ষয় হয়, আর আমিও যেন তাঁদের সঙ্গে থাকি। এই যে আমাদের এতো সুন্দর সময় ছিল — আমি তখনই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম যে, ঠাকুর আমাকে যে আনন্দটা দিয়েছেন, এই এতো সব গুণীর মাঝখানে আমি তাঁদের কাছে শিখতে পারছি, শুনতে পারছি, আমাকে কতো কিছু শেখাচ্ছেন, এই যে নতুন নতুন সব সুর পাচ্ছি, নতুন নতুন গান পাচ্ছি, আমার এই আনন্দটা তুমি কখ্খনো কেড়ে নিয়ো না। আমি যেন এর মধ্যেই ডুবে থাকি। এইটেই সেই প্রথম থেকে আজও আমি চাইছি।

আহসান : আপনারই গাওয়া যে-কোনো একটি প্রিয় গানের দু-একটি পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করে — গেয়ে না — আপনার কষ্ট হচ্ছে, গলা ধরে এসেছে — আপনি আমাদের এই আলোচনা শেষ করবেন তার সঙ্গে দু'একটি কথা বলে।

যূথিকা : সেটি হচ্ছে — 'ঘুঁঘট্ কা প্যট খোল্ রে' — 'কপাট খোল্ রে তোহে পিয়া মিলেঙ্গে'। — এর অর্থ হচ্ছে যে, 'তোমার মনে যে পর্দা আছে সেটা সরিয়ে ফেলো। কেন? — তোমার ইষ্টকে পাবার জন্যে।' মানে ইষ্ট তো তোমার মনেই আছেন, ভগবান সকলের মনেই আছেন — কিন্তু সে পর্দাটাকে তোমাকে সরাতে হবে। কেউ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না।

আহসান : ভজন?

যূথিকা : হ্যাঁ, এটা কবির-ভজন। এটা দরকারি কানাড়া।

আহসান : সাধক কবিরের?

যূথিকা : কবিরের ভজন। খুব পপুলার ভজন। তা এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিরের ভজন দিয়েই আমাদের আজকের এই আসর এখানেই শেষ করছি।

: মরমি কবিরের মতো আমরাও চাইবো, মনের আঁধার-পর্দা সরিয়ে মানুষ যেন অন্তরের ভেতরে 'মনের মানুষ'কে দেখতে পায়। ধন্যবাদ যূথিকাদি, আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ও অবেলায় অনেকখানি সময় দেওয়ার জন্যে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক ম ল দা শ গু প্ত

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে

বাংলা গানের ভুবনে, বিশেষ করে রেকর্ডসংগীত ও চলচ্চিত্রে, কমল দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৭৪) এক অসামান্য কীর্তি ও অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু এই যুগন্ধর সুরসাধকের যথার্থ মূল্যায়ন তো দূরে থাক, তাঁকে একাল স্মরণ পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত। এই বছর (১৯১২) তাঁর জন্মশতবর্ষ, কিন্তু কী ভারত কী বাংলাদেশ — কোনো দেশেই এই উপলক্ষে উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো উদ্‌যোগ গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশ তাঁর জন্মভূমি, এই মাটিতেই তাঁর সমাধি রচিত হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা তাঁর সংগীতজীবনের লালন ও বিকাশের ক্ষেত্র। সংগীত-সংস্কৃতির এই মহান সাধকের প্রতি এই অবহেলা ও ঔদাসীন্য দুঃখজনক ও অমার্জনীয়।

দুর্ভাগ্য অন্য জায়গাতেও। কমল দাশগুপ্ত অখ্যাত-অজ্ঞাত কেউ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের সঠিক তথ্যের অভাব বড়োই বিস্ময়কর ও দুঃখজনক। তিনি কোথায় জন্মেছিলেন, তাঁর বংশপরিচয়, লেখাপড়া কতদূর ও কোথায় করেছেন, শৈশব-কৈশোর ও পেশাগত জীবনে প্রবেশের আগ পর্যন্ত কোন কোন জায়গায় থেকেছেন, বিয়ের বছর, কোন সালে কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন — এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য মেলে না, যাও বা মেলে তা পরস্পরবিরোধী — একজনের সঙ্গে অন্যজনের কথার মিল হয় না। নিজের স্মৃতিকথা লেখেননি, শোনা যায় সাংবাদিক বা অন্য কাউকে সাক্ষাৎকার দিতেও আগ্রহী ছিলেন না। তাই এই বিভ্রান্তি মোচনের দায় তাঁর স্ত্রী ও স্বজনদের ওপরই অনেকখানি বর্তায়। প্রায় বছর সাতেক আগের এক রমজান মাসে আমি ঢাকার ইন্দিরা রোডের কালিন্দী অ্যাপার্টমেন্টে শ্রদ্ধেয়া শিল্পী ফিরোজা বেগমের সঙ্গে দেখা করি। কমল দাশগুপ্ত সম্পর্কে কাজ করার জন্যে তাঁর সহায়তা চাই। জবাব দেন যে তিনিই লিখবেন, শিগগিরই শুরু করবেন। খুশি হই এই ভেবে যে, কমল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দাশগুপ্ত সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা, অধিকার ও তথ্যজ্ঞান ফিরোজা বেগমের চেয়ে আর কারই বা বেশি আছে! তবে এরপরে আর জানা হয়নি, তিনি কিছু লিখেছেন কিনা বা তা কোথাও প্রকাশ পেয়েছে কিনা!

প্রচলিত তথ্যানুসারে কমল দাশগুপ্তের জন্ম সেকালের যশোর জেলার নড়াইলের কালিয়া থানার বেন্দা গ্রামে, ১৯১২ সালের ২৮ জুলাই। আবার কোনো সূত্রের উল্লেখ ছাড়াই অভীক চট্টোপাধ্যায় সাল-তারিখ ঠিক রেখে বলেছেন, তাঁর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারে (*শিল্প ও শিল্পী* : ৮০)। যতটুকু জানা যায়, পিতা তারাপ্রসন্ন ব্যবসায়ের সূত্রে একসময়ে কুচবিহার ও পরে কুমিল্লা শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। কমল দাশগুপ্তের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান পর্ব এখানেই কাটে। তিনি ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র — এই প্রতিষ্ঠানেরই স্নাতক। এরপর দাশগুপ্ত পরিবার কলকাতায় চলে আসেন। শুরু হয় কমলের জীবনের নতুন পর্ব।

গানের বাড়িতেই কমলের জন্ম। পরিবারের সংগীতচর্চার ঐতিহ্য বেশ কয়েক পুরুষের। পিতামহ কামিনীরঞ্জন, পিতা তারাপ্রসন্ন ও পিতৃব্য কিরণপ্রসন্ন গান-বাজনার সঙ্গে গভীরভাবেই জড়িত ছিলেন। পিতামহ ও পিতা উচ্চাঙ্গসংগীতের চর্চা করতেন। কমলেরা তিন ভাই ও তিন বোন : বিমল, কমল, সুবল, ইন্দিরা (সেন), সুধীরা (সেনগুপ্তা), কনিষ্ঠার নাম জানা যায়নি। এঁরা সবাই গান-বাজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধু কনিষ্ঠা ছাড়া আর সবারই কৃতির পরিচয় মেলে। কলকাতায় আসার আগে নড়াইল বা কুচবিহার বা কুমিল্লা বা অন্য যেসব জায়গায় কমল ছিলেন, সেই জীবনের কথা বলতে গেলে সামান্যই জানা যায়, তাও খুবই অস্পষ্ট। এই পর্বে কলেজজীবনের লেখাপড়া ছাড়া, তাঁর সংগীতজীবনের কথা, পিতা বা অগ্রজ ছাড়া আর কার কাছেই বা গান শিখেছেন, কুমিল্লায় থাকার সময়ে সেখানকার সংস্কৃতি-অঙ্গনের শচীন দেববর্মন-অজয় ভট্টাচার্য্য-হিমাংশু দত্ত-সুশীল মজুমদার — এঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় বা সংযোগ গড়ে উঠেছিল কিনা — এসব কোনো খবরই জানা যায় না।

দুই

আমরা চটজলদি এই গানের পরিবারের কিছুটা পরিচয় জেনে নিই। কমলের অগ্রজ বিমল দাশগুপ্ত বহুমুখী প্রতিভার মানুষ ছিলেন। সংগীত ও জাদুবিদ্যা — উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর আগ্রহ ও অধিকার ছিল। জাদুবিদ্যা শেখার জন্যে ইয়োরোপ ও আমেরিকাতেও যান এবং সেখান থেকে কিছু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বীকৃতি-সম্মাননামূলক উপাধিও পান। জাদুবিদ্যার সুবাদে তিনি 'প্রফেসর' উপাধি লাভ করেন এবং প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত নামেই সবার কাছে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন দারুণ ভোজনরসিক — এসব গল্প পরিচিতজনদের মুখে মুখে ফিরতো — গীতিকবি প্রণব রায়ও এ-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে সরস সাক্ষ্য দিয়েছেন। হাসির গানের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। অন্য গীতিকারের পাশাপাশি নজরুলেরও বেশকিছু হাসির গানের রেকর্ড করেছিলেন। কমিক কথিকা-গল্প-গানের অদ্বিতীয় এই শিল্পী ভাটিয়ালি, ঝুমুর-ভক্তিগীতি-শ্যামাসংগীতও রেকর্ডে গেয়েছেন। তাঁর কমিক-রেকর্ড 'ভ্যাবাকান্ত', 'পেটুক চাণক্য', 'দারোগার সম্বন্ধী', 'বিদ্যার্ণবের বিদ্যের দৌড়' এবং কমিক-গান 'বিয়ের আগে' ও 'বিয়ের পরে' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। রঞ্জিত রায় ও নবদ্বীপ হালদারকে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি বলা যায়। বিমল দাশগুপ্ত এইচএমভির অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান টুইনের ট্রেনার হিসেবেও কাজ করেছেন বেশ কিছুকাল। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি মহিষাদলে এক প্রদর্শনীতে জাদু দেখাতে গিয়ে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঞ্চেই অকালে প্রয়াত হন।

সুবল ছিলেন কমলের অনুজ। গাইয়ে-বাজিয়ে এবং সবার ওপরে সুরস্রষ্টা। তাঁর সুরে গেয়েছেন কুন্দনলাল সায়গল, জগন্ময় মিত্র, রবীন মজুমদার, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, বেচু দত্ত এবং আরো অনেকে। সুবলের সুরারোপিত সায়গলের 'এখনি উঠিবে চাঁদ' ও 'নাই বা ঘুমালে প্রিয়', জগন্ময় মিত্রের 'সাতটি বছর আগে', 'সাতটি বছর পরে' ও 'চিঠি', রবীন মজুমদারের 'চাঁদের আলোর দেশে গো', গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের 'সেই মধুরাতে আধখানা চাঁদ' ও 'আমি আর প্রেম জেগে আছি', বেচু দত্তের 'যাই তবে চলে যাই' — এইসব গানে যে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন, তা এক কথায় কালজয়ী। বাংলা ছাড়াও অনেক হিন্দি গীত ও গজলে সুবল দাশগুপ্ত সুর দিয়েছেন। সুরসৃষ্টিতে মগ্ন থাকার কারণে গায়ক হিসেবে নিজের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে — বিকশিত হতে পারেননি সংগীতশিল্পী হিসেবে, অথচ তাঁর খেয়াল ও ঠুমরির সমঝদার ছিলেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রাইচাঁদ বড়ালের মতো সংগীতগুণীরা।

কমলের সহোদরাদের মধ্যে ইন্দিরা সেন ও সুধীরা সেনগুপ্তাও ভালো গাইতেন। দুজনেই নজরুলের স্নেহানুকূল্য লাভ করেছিলেন। নজরুল-গবেষক আসাদুল হক ইন্দিরার যে-দুটি রেকর্ডের সন্ধান পেয়েছেন সে গান নজরুলেরই লেখা। গায়িকা হিসেবে সুধীরার নাম আরো ছড়িয়েছিল। তিনি নজরুলের গান করেছেন বেশ কয়েকটি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নজরুলের 'প্রেম নূপুর বাঁধি', 'সুন্দর নন্দদুলাল', 'মা এসেছে মা এসেছে', 'দশ হাতে ঐ দশ দিকে মা' — এই গান চারটিতে কমল, সুবল ও সুধীরা এই তিন ভাইবোনই কণ্ঠ দিয়েছিলেন। কমল দাশগুপ্তের সুরে সুধীরা যূথিকা রায়ের সঙ্গেও গান রেকর্ড করেছিলেন — 'জাগ্রত ভারতবর্ষ'। তাঁর অকালে চলে যাওয়ায় একটি সংগীত-প্রতিভার সম্ভাবনারও মৃত্যু ঘটে।

তিন

কমল দাশগুপ্ত ছিলেন পরিপূর্ণ সংগীতমগ্ন এক সাধক। সুরের ভুবনে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন গায়ক, যন্ত্রী, সুরকার ও পরিচালক-প্রশিক্ষক হিসেবে। গ্রামোফোন কোম্পানি, বেতার ও চলচ্চিত্র — এই তিন মাধ্যমেই জড়িত থেকে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেন। কীভাবে সংগীতজগতে এসেছিলেন তার অনুপুঙ্খ বিবরণ মেলা ভার। পরিবারে সংগীতচর্চার একটি আবহ ছিল। সংগীতপ্রেমী পিতা তারাপ্রসন্নের কাছেই তাঁর গানের হাতেখড়ি। এরপর অগ্রজ বিমল দাশগুপ্ত তাঁকে গান শেখান। কলকাতায় গিয়ে ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে নাড়া বেঁধে উচ্চাঙ্গসংগীতের তালিম নেন। কাজী নজরুল ইসলামের কাছেও গান শেখেন। তাঁর গানের গুরুদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে ও দিলীপকুমার রায়ের নামও করতে হয়। এইচএমভির অর্কেস্ট্রা-পরিচালক নিউম্যানের কাছে কমল পাশ্চাত্যসংগীত ও 'অর্কেস্ট্রার মিউজিক রচনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শিখেছিলেন' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ৭৮)। তবে গানের জগতে কমল দাশগুপ্তের পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার পেছনে নজরুলের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বড়ো। নজরুলের নির্দেশনা, পরামর্শ ও আনুকূল্যও তাঁর খ্যাতির সহায়ক হয়েছিল। অগ্রজ বিমল দাশগুপ্তের সহকারী হিসেবে কমল-সুবল দুই ভাইয়ের প্রায় কৈশোরেই গ্রামোফোন কোম্পানিতে আসা-যাওয়া শুরু হয়। এরপর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে পাকাপাকি যুক্ত হন। কিছুকাল নজরুলের সহযোগী ছিলেন। এরই ফাঁকে অগ্রজ বিমল দাশগুপ্তের অনুপস্থিতির কালে কমল গানে সুর দিতেও শুরু করেন। তাঁর সুর দেওয়া দুটি গান নজরুলের সুপারিশে সত্যবতী (পটল) নামের এক শিল্পী রেকর্ডও করে ফেলেন। কমল দাশগুপ্তের সুরে এটিই প্রকাশিত প্রথম রেকর্ড এবং সেই গান নাকি 'সেই সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল' (*পুরাতনী* : ৭১)। তারপর তিরিশের দশকের প্রায় গোড়াতেই হিজ মাস্টার্স ভয়েসে সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে রাখা প্রয়োজন, তাঁর এই সুযোগ ও প্রতিষ্ঠা সহজ ছিল না, কেননা তখন খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, তুলসী লাহিড়ী, হীরেন বসু, পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, শচীন দেববর্মন, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, তিমিরবরণ, অনুপম ঘটক, দুর্গা সেনের মতো বাংলা গানের মহান সুরস্রষ্টারা। কমলের প্রতিভা ও নিষ্ঠার ফলে অল্পদিনেই বাংলা মুলুক ছাড়িয়ে তাঁর নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কমল দাশগুপ্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু গীতিকার প্রণব রায় কমলের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির পেছনে নজরুলের ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন এইভাবে : 'কমল দাশগুপ্তের সুরের ওপর কাজীদার খুবই একটা ভাল ধারণা শুধু বলব না, কমলের সুরকে কাজীদা আদর করতেন। সেইজন্যে অনেক ভাল ভাল গান লিখে কমলকে দিতেন। তার মধ্যে মনে আছে যূথিকা রায়ের রেকর্ড করা গান — 'তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম' (*দেশ* : বিনোদন সংখ্যা ১৯৮৪; ৬৬-৬৭)। কমলের প্রতি নজরুলের আস্থা এমনই প্রবল ছিল যে, তিনি লিখিতভাবে 'কেবল কমল দাশগুপ্তকেই দিয়েছিলেন অনুমোদন ছাড়াই তাঁর গানে সুর করার অধিকার' (*প্রথম আলো* : ২৯ জুন ২০১২)।

তবে সংগীতের জগতে কমল দাশগুপ্তের আবির্ভাব কিন্তু প্রথমে যন্ত্রী ও গায়ক হিসেবে, সুরকারের ভূমিকায় আসেন পরে। নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চাঙ্গসংগীত শেখেন। খেয়াল, ঠুমরি ও গজলে তাঁর বিশেষ দখল ছিল — গানের রেকর্ডও প্রকাশ পেয়েছিল। এরপর কমল একক ও দ্বৈতকণ্ঠে অনেক বাংলা ও হিন্দি গান রেকর্ড করেন। এইসব গানের মধ্যে আছে নজরুলগীতি, আধুনিক, কীর্তন, গীত, গজল, ভজন, নাত। এসব গানে তাঁর সহশিল্পীদের মধ্যে ভাই সুবল ও বোন সুধীরা বাদে যূথিকা রায়ের নামই প্রধানত করতে হয়। রবীন্দ্রসংগীতও নিষ্ঠা-ভ'রে শিখেছিলেন ব্রজেন গাঙ্গুলি ও অনাদি দস্তিদারের কাছে। পাশাপাশি পাশ্চাত্যসংগীতের কিছু জ্ঞান ও ধারণা পেয়েছিলেন দিলীপকুমার রায়ের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের গান-শেখা যে তাঁর সুরসৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে, সেই কথাটি বিমান মুখোপাধ্যায়ের ভাষ্য থেকে বেশ বোঝা যায় : '... তাঁর কতো বিখ্যাত গানের ভেতর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ঢুকে গেছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি ...। কমল দাশগুপ্তর নিজের গাওয়া 'এসেছিল মধুযামিনী' গানের অন্তরা, 'দুজনার মুখ পরে আসি / পড়েছিল জোছনার রাশি'-এর সুরের সঙ্গে পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায় / বিজলি থেকে থেকে চমকায়' মিলিয়ে দেখো। দেখবে কি মিল। এ ত হবেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি তো জানি যে অন্তত শ'পাঁচেক রবীন্দ্রসঙ্গীত কমল দাশগুপ্তর কণ্ঠস্থ ছিল, বুকের ভেতর ভরা ছিল' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ৭৮)। রবীন্দ্রনাথের গানে মগ্ন থাকলেও কমল রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড কখনো করেননি, কারণ তাঁর কণ্ঠ রবীন্দ্রসংগীতের উপযোগী ছিল না। তবে রবীন্দ্রপ্রয়াণে কমল দাশগুপ্ত নিজের সুরে যূথিকা রায়ের সঙ্গে মিলে দুটি গান গেয়েছিলেন রেকর্ডে — একটি প্রণব রায়ের লেখা — 'দিন চলে যায়, হে কবি বিদায়' — দ্বিতীয়টির কথা শৈলেন রায়ের — 'সন্ধ্যা নামিল গঙ্গার তীরে'। কথা, সুর ও গায়কিতে গান দুটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

নজরুল ছিলেন কমল দাশগুপ্তের সংগীতজীবনের ধ্রুবতারা। নজরুলের কাছে গান শিখেছেন, তাঁর গানে সুর দিয়েছেন, সুরসৃষ্টিতে পেয়েছেন স্বাধীনতা, কাজ করেছেন তাঁর সহকারী হিসেবে এবং সেইসঙ্গে তাঁর গানও নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করেছেন। নজরুলের কতো গান তিনি রেকর্ডে গেয়েছেন, তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় নানা সূত্রে : 'আধো আধো বোল' (১৯৩৪), 'প্রিয়তমা এস ফিরে' (১৯৩৪), 'চল রে চপল তরুণদল' (১৯৩৪), 'শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে' (১৯৩৪), 'এস আনন্দিতা ত্রিলোক' (১৯৩৫), 'ওরে আলয়ে আজ' (অন্য শিল্পীদের সঙ্গে, ১৯৩৫), 'চম্পা পারুল যূথি' (১৯৩৬), 'জাগ অমৃতপিয়াসী চিত মোর' (১৯৩৬), 'তোমার হাসিতে জাগে' (১৯৩৬), 'প্রভাত-বীণা তব বাজে হে' (১৯৩৬), 'পরম পুরুষ সিদ্ধযোগী' এবং 'জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর' (যূথিকা রায়ের সঙ্গে, ১৯৩৭), 'প্রিয় আসিল রে' (যূথিকা রায়ের সঙ্গে, ১৯৪১), 'মোরা কুসুম হয়ে কাঁদি কুঞ্জবনে' (যূথিকা রায়ের সঙ্গে, ১৯৪১), 'আমি চাঁদ নহি অভিশাপ' (১৯৪১), 'বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে' (১৯৪২), 'তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো' (১৯৪২), 'তুমি হাতখানি যবে' (১৯৪৪), 'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙ্গে যায়' (১৯৪৫), 'মাধব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ মুরারী' (কমল-সুবল-সুধীরা, ১৯৫০), 'বইল যখন প্রেমের হাওয়া', 'ভালো লাগার স্মৃতি', 'মোরা কুসুম হয়ে' ও 'রুমঝুম রুমঝুম' (যূথিকা রায়ের সঙ্গে)।

নজরুলের পরে কমল দাশগুপ্ত সবচেয়ে বেশি গান রেকর্ড করেছেন বন্ধু প্রণব রায়ের কথায়। প্রণবের রচনা আর কমলের সুর — এই দুইয়ে মিলে বাংলা গানকে অনিবার্যভাবে আবেদনময় ও জনপ্রিয় করে তুলতো। প্রণব-রচিত যেসব গানে সুরারোপ করে কমল গেয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা গেল : 'ঝুমকো লতার চিকন পাতায়' (১৯৩৪), 'তোমার হাসিতে জাগে' (১৯৩৪),

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ফুরাবে এ মধু চৈতালী বেলা' (১৯৩৬), 'মিনতি রাখ প্রিয়' (১৯৩৬), 'যোগী ফিরে আয় ফিরে আয়' (১৯৩৬), 'এসেছিল মধুযামিনী' (১৯৪২), 'কতদিন দেখিনি তোমায়' (১৯৪৪), 'কণ্ঠে আমার নিশিদিন' (১৯৪৫)। শৈলেন রায়-রচিত আধুনিক গানও কিছু গেয়েছেন। 'ওই বাজে বাঁশী বাজে' ও 'মন্থরগতি চঞ্চলমতি' — এই ধরনের কীর্তনের রেকর্ডও বেরিয়েছে তাঁর।

কমল দাশগুপ্ত শুধু যূথিকা রায়ের সুরের গুরুই নন, একসঙ্গে অনেক বাংলা ও হিন্দি গীত-গজল-ভজনেও কণ্ঠ দিয়েছেন। যেমন ১৯৩৬-এর অক্টোবরে যুগল কণ্ঠে এইচএমভি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এই ভজন গান দুটির রেকর্ড : 'এস হে পূজার ভবন তেয়াগি' এবং 'কৃষ্ণজী প্রিয় বন্ধু মম'। একের পর এক প্রণব রায় কিংবা শৈলেন রায়ের লেখা গান দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছেন কমল ও যূথিকা — তারই কয়েকটির নমুনা : 'সবি মায়ার স্বপন ভুল মন ভুল রে', 'মিছে তুই আশার কুহকে ভুলে', 'ওগো সুন্দর দেবতা', 'চিত নন্দন দিল ধরা', 'এস কৃষ্ণমুরারী ব্রজবিহারী', 'আজি অভিনব সাজে সাজাব তোমারে', 'রাঙা মাটির তিলক দিলাম', 'এই বকুল তলে হেথা গাঙের তীরে', 'মরমিয়া শোনাও মধুর গান', 'ওগো সোনার বরণী', 'নন্দদুলাল আয় রে আয়', 'মোদের কানাই আজি', 'নাই নাই, নাই অবসর'। শুধু বাংলা নয়, হিন্দি ও উর্দুর পাশাপাশি তামিল ভাষার গানও দুজনে একসঙ্গে গেয়েছেন, রেকর্ড করেছেন। দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছেন ভজন-শিব ও নারায়ণস্তুতি-উর্দু হাম্‌দ-নাত, আবার সেইসঙ্গে দিওয়ালি বা দেশবন্দনার গানও। মীরার ভজনের কথা তো আলাদা করেই বলতে হয়। 'হোলি আয়ি পেয়ারি' ও 'খেলুঙ্গি ম্যয় হোরি' — মীরার এই ভজন কমল-যূথিকার কণ্ঠে এক অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করে শ্রোতাকে পরম প্রাপ্তির গন্তব্যে পৌঁছে দিত। আর এই যে গানের উল্লেখ করা হলো, এর সবগুলোরই সুরস্রষ্টা কমল দাশগুপ্ত। কমল একেবারে কম গান রেকর্ড করেননি তাঁর নিজের কণ্ঠে। কিন্তু গায়ক হিসেবে খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা তাঁর তেমন জোটেনি বললেই চলে। সুরস্রষ্টার অতুলনীয় খ্যাতি তাঁর অন্য সাংগীতিক গুণকে চাপা দিয়েছে।

গান গাওয়া ও সুর-যোজনার পাশাপাশি কমল দাশগুপ্ত কিছু গানও লিখেছিলেন। হয়তো তাঁর এই গান-রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন গুরু নজরুল, নয়তো গীতিকার-বন্ধু প্রণব রায়ের কাছ থেকে। 'মম যৌবন সাথী বুঝি এলো', 'বিফলে যামিনী যায়', 'কে আজি দিল দোলা' — কমল দাশগুপ্ত নিজের লেখা এই গান তিনটিতে সুর বসিয়ে ১৯৩৪ সালে রেকর্ড করেন। প্রথম গানটি তিনি নিজেই গেয়েছিলেন। পরের গান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুটিতে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছিলেন অনুজ সুবল দাশগুপ্ত। কমল বেশকিছু হিন্দি গীত-হোরি-ভজনও লিখেছিলেন, তাঁর সুরে এগুলোর বেশিরভাগই গেয়েছিলেন যূথিকা রায় — তাঁর সঙ্গে তিনিও কয়েকটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। যূথিকা রায়ের পরে তাঁর সুরে জগমোহন নামে হিন্দি গীত-গজল গেয়ে সর্বভারতীয় খ্যাতি ও পরিচিতি পান জগন্ময় মিত্র। ভারতের বাইরেও এ-দুজনের নাম পৌঁছে গিয়েছিল। যাই হোক, একটি কথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন — কমল দাশগুপ্ত সুরকার, গায়ক বা গীতিকার হিসেবে কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানিতে প্রবেশ করেননি; কমল ও তাঁর অনুজ সুবল তবলাবাদক হিসেবেই 'টুইন' কোম্পানিতে যোগ দেন। কমল তবলার পাশাপাশি ভালো ম্যান্ডোলিন ও জাইলোফোনও বাজাতে পারতেন। কমল এরপরে তাই ম্যান্ডোলিন ও জাইলোফোন-বাদক হিসেবে এলেন এইচএমভিতে। এইচএমভির এক অর্কেস্ট্রার রেকর্ডে কমল দাশগুপ্তের ম্যান্ডোলিন-বাজনা স্থান পেয়েছিল। সংগীতপেশার সূচনাপর্বে বাদ্যযন্ত্রী হিসেবেই মূলত তাঁর পরিচিতি ছিল। একটি অর্কেস্ট্রার দলও নামি বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। পরে তাঁর সাংগীতিক অন্য গুণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। এইচএমভির কাজের অবসরে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যা যূথিকা রায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নিয়মিত গান শেখাতেন। পাশাপাশি তিনি কলকাতার 'কস্তুরবা সংগীত বিদ্যালয়ে'ও গান শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসেবেই কমল দাশগুপ্তের সংগীত-ভুবনে খ্যাতি, পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা। প্রথমে গ্রামোফোন কোম্পানি, পরে চলচ্চিত্রজগতে সুরসৃষ্টির জনক হিসেবে যুক্ত হন। তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তি, মৌলিক প্রতিভা, নিরীক্ষাপ্রিয়তা ও অসামান্য মেধা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায় — তিনি হয়ে ওঠেন অনন্য এক সুরস্রষ্টা। পারিবারিক সূত্রেই সংগীত তাঁর রক্তে যেন মিশে গিয়েছিল। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠার পথ মসৃণ হয়ে উঠেছিল মূলত নজরুলের সান্নিধ্যে এসে — তাঁর মনোযোগ, আনুকূল্য, নির্দেশনা, পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে। শুধু বাংলা নয়, কমল হিন্দি, উর্দু, তামিল, মারাঠি — নানা ভাষার গানে সুর দেন। তাই তাঁর নাম সুরকার হিসেবে বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। টুইন ও এইচএমভিতে তিনি ঢুকেছিলেন সামান্য বাদ্যযন্ত্রী হয়ে, পরে ক্রমে প্রশিক্ষক-সুরকারের সহকারী, সুরকার, প্রশিক্ষক ও সংগীত পরিচালক হিসেবে ধাপে ধাপে উঠে আসেন।

কমল দাশগুপ্ত যাঁদের লেখা গানে সুর দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নজরুলই প্রধান — নজরুলের কথাই প্রথমে বলতে হয়। নজরুলের গানই তাঁকে খ্যাতির ভিতটা গড়ে দেয়। এরপর যেসব গীতিকারের গানে সুর-যোজনা করে কমল তাঁর মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে বাংলা গানের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : প্রণব রায়, অজয় ভট্টাচার্য্য, শৈলেন রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, মোহিনী চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত। পাশাপাশি তিনি প্রচলিত পদাবলি কীর্তনেও সুরারোপ করেছেন। সুর দিয়েছেন মীরার ভজন, কবিরের ভজন, সুরদাসের ভজনে। এছাড়া সমসাময়িক বিশিষ্ট হিন্দি-উর্দু গীতিকবি পণ্ডিত মাধুর, ভূষণ, কামাল আমরোহি, মহম্মদ বক্‌স, ফৈয়াজ হাশমি, রাজেশ্বর গুরু, মুনির আলম, হসরত জয়পুরির গীত-গজল-ভজনে সুরারোপ করেছেন কমল দাশগুপ্ত।

কী বাংলা কী হিন্দি — কী ফিল্ম কী নন-ফিল্ম — কমলের সুর-যোজনার অনেক গানই কালজয়ী সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে। সেই তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ। কমল দাশগুপ্ত সেই বিরল সুরস্রষ্টাদের একজন — যাঁর গান কালে-কালান্তরে মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। দৈবচয়নের মতো আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করি : 'আমি ভোরের যূথিকা' (যূথিকা রায়), 'সাঁঝের তারকা আমি' (যূথিকা রায়), 'শতেক বরষ পরে' (যূথিকা রায়), 'এমনি বরষা ছিল সেদিন' (যূথিকা রায়), 'মেনেছি গো হার মেনেছি' (জগন্ময় মিত্র), 'আমি ভুলে গেছি তব পরিচয়' (জগন্ময় মিত্র), 'তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন' (জগন্ময় মিত্র), 'ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে' (জগন্ময় মিত্র), 'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়' (জগন্ময় মিত্র), 'আমার দেশে ফুরিয়ে গেছে ফাগুন' (জগন্ময় মিত্র), 'পৃথিবী আমারে চায়' (সত্য চৌধুরী), 'যেথা গান থেমে যায়' (সত্য চৌধুরী), 'কথার কুসুমে গাঁথা' (বেচু দত্ত), 'মোর হাতে ছিল বাঁশী' (গৌরীকেদার ভট্টাচার্য), 'তোমার জীবন হতে' (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়), 'ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে' (তালাত মাহমুদ)। এইসব গানের সুরের সম্মোহন শ্রোতাকে চিরকাল আবিষ্ট করে রাখবে।

উত্তরকালের খ্যাতিমান বেশ কজন গীতিকার ও গায়কের অভিষেক হয়েছে কমল দাশগুপ্তের সুরে। যূথিকা রায়ের প্রথম রেকর্ডের (১৯৩৪) গান লিখেছিলেন প্রণব রায় আর সেই গানে, 'আমি ভোরের যূথিকা' ও 'সাঁঝের তারকা আমি', সুর দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত। জগন্ময় মিত্রের প্রথম রেকর্ড বের হয় ১৯৩৯-এ — প্রণব রায়ের লেখা 'প্রিয় হতে প্রিয়তর' ও 'তোমার মতন কত না নয়ন' এই গান দুখানি নিয়ে। এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গানেরও সুরারোপ করেন কমল দাশগুপ্ত। প্রণব রায়ের লেখা প্রথম গানের ('ও বিদেশী বন্ধু' ও 'যেথায় দূরে গাঙের চরে') যে রেকর্ড ১৯৩৪-এর পূজায় কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে বের হয় সে-ও কমল দাশগুপ্তের সুর-যোজনাতেই। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম রেকর্ডটিও ('শুধু জাগিতে এসেছি, জাগাতে আসিনি গো' এবং 'তোমার আমার মিলনে শতেক বাধা') প্রকাশিত হয়েছিল কমল দাশগুপ্তের সুরে ও সৌজন্যে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম হিন্দি গীতের রেকর্ড প্রকাশের মূলেও ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। এক্ষেত্রে ফিরোজা বেগমের নামও উল্লেখ করতে হয়। অসিতবরণের কথাই বা বাদ যায় কী করে!

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা হতো রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারি, নজরুলের গানের ক্ষেত্রেও এমন আখ্যা পেতে পারেন কমল দাশগুপ্ত। নজরুলের সবচেয়ে বেশি গানে সুরারোপ করেছেন কমল দাশগুপ্ত এবং সেই সংখ্যা অন্য কারো কারো মতো মোহাম্মদ আসাফউদ্দৌলাহ্ও ৪০০ বলে উল্লেখ করেছেন (*প্রথম আলো* : ২৯ জুন ২০১২)। আরেকজন একটু নেমে এসে সংখ্যা জানালেন 'প্রায় চারশো' (*শিল্প ও শিল্পী* : ৮৩)। এঁরা কোন সূত্র থেকে এই তথ্য পেয়েছেন তা জানাননি। এই সংখ্যা শুধু অতিরঞ্জিতই নয়, কল্পিতও — কমল দাশগুপ্ত নজরুলের যেসব গানে সুর দিয়েছেন তার সংখ্যা কোনোক্রমেই দুশো ছাড়িয়ে যাবে না। পঞ্চাশজনেরও বেশি সুরকার নজরুলের গানে সুর দিলেও নজরুল নিজেই যে তাঁর সবচেয়ে বেশি গানে সুর দিয়েছেন, কাগুজে তথ্য এই বক্তব্য সমর্থন করে। তবে এ-কথা কবুল করতে দ্বিধা নেই যে, কমল-সুরারোপিত নজরুলের প্রায় সব গানই অসামান্য সমাদর ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাই আলাদা করে এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নজরুলের লেখা গান সংযোজিত একটি পালা-রেকর্ডের উল্লেখ না করলেই নয়। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-বিরচিত ও প্রখ্যাত নট নির্মলেন্দু লাহিড়ী-অভিনীত 'সিরাজদ্দৌলা' রেকর্ডনাট্যের গানগুলোয় সুর দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত। নাটকের কাহিনির সঙ্গে গানগুলো কথা ও সুরে এমন সংগতির আবহ রচনা করেছিল যে তা সহজেই শ্রোতার মন জয় করে। সব মিলিয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল পালাটি এবং তার মূলে গানেরও একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

বেসিক ডিস্কের মতো ফিল্মের গানেও কমল দাশগুপ্তের সাফল্য বিশেষ স্মরণযোগ্য। তিনি বেশকিছু বাংলা ও হিন্দি ফিল্মের সংগীত পরিচালনা করেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি হলো : *পণ্ডিত মশাই*, *গরমিল*, *শেষ উত্তর*, *যোগাযোগ*, *চন্দ্রশেখর*, *নববিধান*,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাবীকাল, *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য*, *বিদেশিনী*, *প্রার্থনা*, *মন্দির*, *বঞ্চিতা*, *রাঙ্গামাটি*, *গিরিবালা*, *মেঘদূত*, *মধুমালতী*, *গোবিন্দদাস* ও *বধূবরণ*। সুরকার হিসেবে যেসব হিন্দি ছবির সঙ্গে কমল দাশগুপ্ত জড়িত ছিলেন তার মধ্যে আছে : *জবাব*, *হস্‌পিটাল*, *প্যাহেচান*, *ইরান কি এক রাত*, *অ্যারাবিয়ান নাইটস্‌* ইত্যাদি। কমল দাশগুপ্ত বন্ধু গীতিকার প্রণব রায়ের সহযোগে *প্রার্থনা* নামে যে ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন তা একদমই চলেনি। ফলে দুই বন্ধুই আর্থিক দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় একসময় চলচ্চিত্র-নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তিনি *পাতালপুরী* নামে যে ছবিটি তৈরি করেন, তার সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই ছবির সংগীত পরিচালনায় নজরুলের সহকারী ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। ছায়াছবির সঙ্গে এইভাবে যুক্ত হন কমল। এরপর ১৯৩৬-এ স্বাধীনভাবে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পান *পণ্ডিত মশাই* ছবিতে। ফিল্মের বাইরে যেমন ফিল্মেও তেমনি কমল দাশগুপ্ত আলাদা ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেছেন। কানন দেবী তখন অভিনয় ও গানের জগতে অসাধারণ খ্যাতি ও পরিচিতি পেয়েছেন। সেই কানন দেবীকে প্রমথেশ বড়ুয়ার *শেষ উত্তর* ছবিতে কাজ করতে হবে — অভিনয়ের পাশাপাশি গানও করতে হবে। ছবির সংগীত পরিচালক ও সুরকার অচেনা কমল দাশগুপ্ত। গম্ভীর, রাশভারী, স্বল্পবাক কমল কাননের পরীক্ষা নিয়ে কোনো ভূমিকা ছাড়াই সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিলেন : 'দেখুন, আপনার গলাটা একটু ঘষামাজা করতে হবে আমার গান গাইবার জন্যে'। কানন বুঝে গেলেন, সাগরে এসে পড়েছেন। বিনয়ী ও জাতশিল্পী কাননও কমলের কথার যোগ্য জবাব পেশ করলেন এইভাবে : 'এতে আমি অভ্যস্ত। যখন যে মিউজিক ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করেছি, তাঁর মত করেই আমাকে গলা তৈরি করতে হয়েছে। এখনও আমি তাই করব' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ৫২)।

চলচ্চিত্রের গানের সঙ্গে কাহিনির সিচুয়েশনের একটি গভীর যোগ আছে। এই বিষয়টি কমল দাশগুপ্ত খুব ভালো বুঝতেন। কানন দেবীর কাছ থেকে শুনে বিমান মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন : '... তখনকার দিনের সঙ্গীত পরিচালকদের অন্য আর একটা নাম ছিল, সেকেন্ড ডিরেক্টর অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিচালক। তার মানে ছবি তৈরি করার ব্যাপারে সঙ্গীত পরিচালকের শুধু গানের ব্যাপারে নয় — সামগ্রিকভাবে ছবিকে ভাল করার ব্যাপারে, সঙ্গীত পরিচালকের কথার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। একটা ঘটনার কথা বললেই পরিষ্কার হবে। কানন দেবী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন — *শেষ উত্তর* ছবিটা তোলা শেষ হয়ে গেল। তখন বিশ্বযুদ্ধের সময়। সিনেমার কাঁচা ফিল্ম আমদানী করে আনতে হয় তাই র-ফিল্মের খুব অভাব। অপচয় এড়াতে বুঝেসুঝে ফিল্ম খরচ করতে হয়। *শেষ উত্তর* ছবিটার উদ্বোধনের পোষ্টার পর্যন্ত সব জায়গায় শোভা পাচ্ছে। বড়ুয়া সাহেবের বাড়িতে ছবিটার একটা প্রাক-উদ্বোধন শো হল। ছবিটার একটা জায়গা দেখিয়ে কমলবাবু বড়ুয়া সাহেবকে বললেন, এই জায়গাটার সিচুয়েশনে আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, এইখানে একটা গান থাকলে ভাল হত। বড়ুয়া সাহেব বুঝলেন যে কমলবাবুর কথাটা ফেলবার মত নয়। কিন্তু ছবির টাইটেল কার্ড তৈরি হয়ে গেছে — ছবি শেষ। এখন একটা গান ঢুকিয়ে নতুন করে শুটিং করা বাড়তি অনেক খরচের ব্যাপার। প্রোডিউসারের কাছে রাজার ছেলে বড়ুয়া সাহেবের খাতির অন্যরকম। তারা বলল আপনি কিছু ভাববেন না। খরচ যা লাগে হবে। আপনার মনোমত করে কাজটা শেষ করুন। প্রণব রায়ের লেখা একটা গান তৈরি হল। বড়ুয়া সাহেব কমলবাবুকে বললেন এ গানটা আপনি লাগাবার ব্যবস্থা করুন। এদিকে টাইটেল কার্ডে সব গানের গীতিকার হিসেবে শৈলেন রায়ের নাম। সেখানে তো প্রণব রায়ের নাম আর ঢোকানো যাবে না। তা হোক্, বড়ুয়া সাহেব সিনারিও পাল্টালেন। ... যুদ্ধের কাজের তৎপরতার মত নতুন গান, দৃশ্য তোলা হয়ে গেল, ছবিতে জোড়া হল। শুধু ওই গানটার গীতিকার প্রণব রায়ের নাম আর ছবিতে দেওয়া গেল না। তবে রেকর্ডে অবশ্য যথাযথভাবেই ওঁর নাম ছাপা হল। কানন দেবীর গাওয়া 'আমি বনফুল গো — গীতিকার প্রণব রায়'। কমলবাবুর কথায় এই গানটা যে ছবিটা[কে] কতো দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা এই ষাট বছর পরে এখনও গানটার জনপ্রিয়তা থেকে বোঝা যায়' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ৫২-৫৩)। রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক ও কমল দাশগুপ্ত — এই তিন সংগীত পরিচালকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে — এমন প্রশ্নের জবাবে নিজের অভিজ্ঞতায় কানন দেবী যা বলেছিলেন, তা স্মরণযোগ্য : 'রাইবাবুর কাছে যখন শিখেছি তখন মনে হয়েছে হিমালয়ের কোলে বসে কৈলাসের মহাদেবকে দেখছি। পঙ্কজ মল্লিকের কাছে যখন 'সবার রঙে রঙ মেশাতে' শিখেছি তখন মনে হয়েছিল যে ... পঙ্কজদা যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাতে পঙ্কজদাকে মনে হয়েছিল তিনি একজন রবীন্দ্রাত্মা পুরুষ, আমার জীবনদেবতা। আর কমলবাবুর কাছে এসে যখন শিখেছি, তখন মনে হয়েছে সপ্তসাগরের সঙ্গমে এসে আমি ডুব দিচ্ছি, শিখছি। এক একজনের রূপ তাঁর নিজের মত —

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এঁদের তল পাওয়া ভার' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ৫৩)।

বাংলা গানের আরেক দিকপাল হীরেন বসু 'বাংলা সিনেমার গান' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কমল দাশগুপ্ত সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তার গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন : 'একদিন যাঁর গানের সুর বাংলার ঘরে ঘরে ফিরত — একটা সময়ে সেই মানুষটির সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে যেন কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখা হ'ল। অথচ তাঁকে আরো বেশি করে পেতে পারত বাংলা সিনেমার গান' (*দেশ* : বিনোদন সংখ্যা ১৯৮৪; ১৭১)। অবশ্য এর কিছু কারণও আছে। ফিল্মে রাইচাঁদ বড়ালদের মতো প্রধান মাধ্যম হিসেবে একনাগাড়ে কাজ করেননি কমল দাশগুপ্ত। মনে হয়, গুরু নজরুলের মতোই গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাজ করতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তবু যে কোনো কোনো ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য ও জনপ্রিয়তার পেছনে তাঁর গানেরও একটা বড়ো ভূমিকা ছিল সেকথা স্বীকার করতেই হয়। বহুকাল পেরিয়ে আজো তাঁর সুরসৃষ্টির অমর ফসল কানন দেবীর 'আমি বনফুল গো', 'যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে', 'যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন', রবীন মজুমদারের 'এই কি গো শেষ দান, বিরহ দিয়ে গেলে' কিংবা কানন দেবী-অশোককুমারের দ্বৈতকণ্ঠে 'অনাদিকালের স্রোতে ভাসা, মোরা দুটি প্রাণ' এবং তাঁর সুরে ছায়াছবির আরো অনেক গান মানুষকে মুগ্ধ-অভিভূত করে।

চার

কমল দাশগুপ্ত সুরকার, সংগীত পরিচালক ও প্রশিক্ষক হিসেবে এমন একপর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে নিয়ে অনেক 'মিথ'ও তৈরি হয়েছিল। যেমন শোনা যায়, কানন দেবীকে গান শেখাতে গিয়ে কোনো কারণে — হয়তো মহলায় উপস্থিতির বিলম্ব, গান-শেখায় অমনোযোগ, নিবিষ্টতার অভাব কিংবা অনুধাবন করতে না পারা — এর কোনো একটা কারণে নাকি কমল দাশগুপ্ত তাঁকে চড় মেরেছিলেন। ভাবা যায়! কমলের সজাগ কানে একবার তবলাবাদক ও পরে চলচ্চিত্রের নায়ক অসিতবরণের গুনগুনিয়ে গাওয়া গানের সুর ভেসে আসে। কমল দাশগুপ্ত সুকণ্ঠ অসিতবরণকে শেষ পর্যন্ত গায়ক বানিয়ে ছাড়েন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অসিতবরণ প্রথম রেকর্ড করেন এই গানটি — 'আমার প্রথম গান তোমারে শোনাব বলে'। প্রথম গানেই গায়কখ্যাতি জুটে গেলো। কমল দাশগুপ্তের আবিষ্কার অসিতবরণ এরপর বেসিক রেকর্ড ছাড়াও অনেক বাংলা ও হিন্দি ছবিতে গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এমন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গুণগ্রাহিতার দৃষ্টান্ত একেবারে কম নেই। রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন থেকে মাসে অন্তত দু'বার কলকাতায় আসতেন কমল দাশগুপ্তের কাছে নজরুলের গান শেখার জন্যে (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ২২৫)। সুধীরলাল চক্রবর্তীর কতো না আবদার-আরজি হাসিমুখে শুনতে হয়েছে তাঁকে।

সংগীতশিক্ষক ও পরিচালক হিসেবে কমল দাশগুপ্ত ছিলেন একেবারে ভিন্ন ধাতের মানুষ — নিয়মনিষ্ঠ, সময়ানুবর্তী, স্বাধীনচেতা, স্পষ্টভাষী, নিবেদিতপ্রাণ, উদার গুণগ্রাহী, নিখুঁত কর্মিষ্ঠ, নিরীক্ষাপ্রিয়। সংগীতজগতের খ্যাতিমান ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বদের কথায় তাঁর চরিত্রের এইসব বৈশিষ্ট্য নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর নিষ্ঠা ও যোগ্যতা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। তাঁর কাজের ধারাও ছিল ভিন্ন রকমের। বিবেকের বিপক্ষে গিয়ে কখনো আপস করতেন না। বিমান মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে জানা যায় : '... *আলিবাবা* ছবি করার সময় পরিচালক মধু বসু কমল দাশগুপ্তকে ডেকেছিলেন সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করবার জন্যে। মধু বসু বলেছিলেন — কমলবাবু, আপনি *আলিবাবার* গানগুলোর জন্যে নতুন করে সুর করুন — আমার ছবিতে, নতুন সুরের গানগুলো দেব। কড়া ধাতের মানুষ কমল দাশগুপ্ত একেবারে সোজা বলে দিলেন — তাহলে আপনি অন্য মিউজিক ডিরেক্টর দেখুন, অন্য লোক দেখুন। আমি ওতে নেই। দেবকণ্ঠ বাগচী আর রামতারণ সান্ন্যাল এই দুজনে মিলে যে সুর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে করে গেছেন সে সুর এখনো লোকের মুখে মুখে। ওই সুর কিছুতে পাল্টাতে পারবেন না — লোকে গায়ে থুথু দেবে। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল মধু বসু আর সে চেষ্টা করেননি' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ১৩০)।

ফিল্ম ও গানের জগতের মানুষেরা কমল দাশগুপ্তকে মান্য-শ্রদ্ধা-সমীহ যথেষ্টই করতেন। অবশ্য উপেক্ষা-অবজ্ঞাও যে পাননি তা নয়। যেমন সংগীত পরিচালক-জীবনের শুরুতেই, তাঁর বয়স যখন একুশ-বাইশ, তাঁর সুরে গান গাইতে কমলা ঝরিয়া সরাসরি অস্বীকার করেন। কিন্তু এর উল্টোটাও আছে। কানন দেবীর মতো এতোবড়ো গায়িকাও গান শিখতে ও তুলতে গিয়ে কমল দাশগুপ্তের সামনে সহজে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারতেন না। সুধীরলাল চক্রবর্তীর মতো গুণী শিল্পীও কমল দাশগুপ্ত ও আরো দুয়েকজনের কাছে 'অনুরোধে, আবদারে বরাবর অনুগত থেকেছেন' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ২১০)।

ভারতের কিংবদন্তি সুরস্রষ্টা নৌশাদ কমল দাশগুপ্তকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন — তাঁর সৃষ্টিকে কতখানি মূল্য দিতেন, তা বোঝা যায় যখন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর সম্পর্কে জগন্ময় মিত্রের কাছে মন্তব্য করেন : 'What a composer – what a composer' (*শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে* : ৩৫)।

আধুনিক বাংলা গানের চিরায়তরূপ যে সামান্য কয়জন শিল্পীর অবদানে প্রতিষ্ঠিত, জগন্ময় মিত্র তাঁদেরই একজন। এই জগন্ময়ও শিল্পী হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার জন্যে কমল দাশগুপ্তের কাছে গভীরভাবে ঋণী। তাঁর নিজের কথাতেই বিষয়টি খোলাসা হয়ে যায় : 'কমলদার কাছে আমি ঋণী। হ্যাঁ, এতই ঋণী যে মনে হয় জন্মান্তরেও সে ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। শুধু আমি কেন? শিল্পীজগতের অনেকেই ঋণগ্রস্ত। ... মানুষ হিসেবে তিনি কত উদার ও মহৎ তা বর্ণনা করতে গেলে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যতই মাপা যাবে ততই দেখা যাবে তিনি মাপকাঠির ওপরে অবস্থান করছেন। ... আমার খেদ এই শ্রীকমল দাশগুপ্তের মতো এক অসামান্য প্রতিভার এতটুকু মূল্যায়ন বাংলা করতে পারল না বা করল না। পাপপুণ্যের বিচার আমি করতে চাই না — কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি তাঁর দানের মর্যাদা না দিতে পারায় বাংলা কলঙ্কিত হয়েছে। এই মহান সুরস্রষ্টা কত শিল্পীর জীবনকে উজ্জীবিত করেছেন তারই বা হিসেব কোথায়? ক'জনই বা তাঁর অফুরন্ত দানের প্রতিদানে মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে? রেকর্ড কোম্পানিও আজ কার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী? আমি ওই দোষে যাতে দোষী না হই তাই জানাতে চাই যে রেকর্ড জগতে যে 'আমি' তা আমার কিছুই নয় — সবই ওই বিশাল ব্যক্তিত্বের দানের কণামাত্র যা আমি অতি সামান্য গ্রহণ করতে পেরেছি। এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই আজও শ্রীকমল দাশগুপ্তের সম্পদই রেকর্ড কোম্পানির নাভিশ্বাস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে' (*শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে* : ৩৫)। জগন্ময়ের এই মন্তব্যই নির্দেশ করে মানুষ ও সুরসাধক হিসেবে কমলের বিশালত্ব।

কমল দাশগুপ্ত যে কত বড়ো মাপের সুরস্রষ্টা ও পরিচালক ছিলেন, প্রতিভা-অন্বেষণে ছিলেন কেমন খাঁটি জহুরি — সে সাক্ষ্য দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বলেছেন তিনি : '... আমি প্রথম থেকে যেসব বড় বড় সঙ্গীত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছি তখন তাঁদের সময়ে অত পাবলিসিটি ছিল না, কাজের এত পরিধিও ছিল না। ... আমি তো কাজী নজরুলের সঙ্গে কাজ করেছি, কখনো কিছু ভাবতে হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে। আমাদের সময়ে সেই ১৯৪০-এর কালে, সারা ভারতে কমল দাশগুপ্তের নামে থরহরি কম্প হোত। মানে, তাঁর এত নামডাক, দুর্দান্ত প্রতিপত্তি ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবাই ধরে নিত যে, একবার কমল দাশগুপ্তর সুরে-পরিচালনায় রেকর্ড করতে পারলে, শিল্পীর ভবিষ্যৎ একেবারে তৈরি হয়ে যাবে। তখনকার দিনের শিল্পীদের যেমন এরকম একটা বিশ্বাস ছিল, তেমনি বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর মালিকদেরও এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল'। (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ১৮০-৮১)। এই হেমন্তকে গড়ে তোলার পেছনে কমল দাশগুপ্তের অবদান কে অস্বীকার করবে! তাঁর কল্যাণেই হেমন্ত স্বরলিপি-পাঠ এবং তা থেকে গান তুলতে শিখেছিলেন। তাঁর রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির মূলেও যেমন কমল দাশগুপ্ত, তেমনি হিন্দি গীত-গজল গাওয়ার শিক্ষা ও প্রেরণাও পেয়েছেন তাঁরই কাছ থেকে, নতুন ধরনের বাংলা গান গাওয়ানোর গুরুও তিনি। 'ও প্রীত নিভানে ওয়ালে' এবং 'কিত্‌না দুখ ভুলায়া তুম্‌নে পেয়ারি' — হেমন্তের এই প্রথম হিন্দি গীত-গজলের প্রথম প্রিন্ট ছিল কুড়ি হাজার — তারপর ক্রমে কয়েক লক্ষ রেকর্ড বিক্রি হয়। 'সেদিন নিশীথে বরিষণ শেষে, চাঁদ উঠেছিল বনে' — সুবোধ পুরকায়স্থ রচিত এই গানটি কমল দাশগুপ্ত হেমন্তকে দিয়ে গাইয়েছিলেন। এ-বিষয়ে হেমন্তের মন্তব্য : 'আমার জীবনের স্মরণীয় গানগুলোর মধ্যে এটাও একটা। পরবর্তীসময়ে গ্রামোফোন কোম্পানী আমায় যখন, আমারই আগেকার গাওয়া কিছু গান রি-মেক করতে বলেছিল তখনও আমি ... এই গানটা আবার গেয়েছিলুম' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ১৮২)।

পাঁচ

গানের জগতের যাঁরাই কমল দাশগুপ্তের কথা বলেছেন — তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন, সকলেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ বারবার করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য সহজেই সবার সমীহ আদায় করে নিত। রেকর্ড কোম্পানিতে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা মুখে মুখে ফিরত। তাঁর সম্পর্কে সন্তোষ সেনগুপ্তের মূল্যায়ন এইরকম : 'কলকাতা শহরে এযাবৎ যে-কয়জন বিশিষ্ট সুরকার রেকর্ডে ও ফিল্মে সুর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কমলবাবু একজন প্রধান তো বটেই অনেকক্ষেত্রে তিনি অগ্রগণ্য' (*আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন* : ৭৬)। তাঁর মেজাজ-মর্জি, কাজের ধারা, রেকর্ড কোম্পানিতে সমাদর-মর্যাদা — এসব বিষয়ে আরো জানা যায় : 'আগেকার দিনে নলিন সরকার স্ট্রীটের HMV রিহার্শাল রুমের দোতালায় শ্রেষ্ঠ ঘরখানা কমলবাবু ব্যবহার করতেন — সে ঘরে কমলবাবুর শিল্পী ছাড়া আর কারো রিহার্শাল হত না। কমলবাবু বরাবরই রাশভারী লোক ছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর সামনে কেউ কোনোরকম প্রগল্‌ভতা করতে পারেনি। ... প্রতিটি রিহার্শালের সময় তিনি নির্ধারিত করে দিতেন এবং প্রতিটি শিল্পী ও যন্ত্রীদের সেইসময়ে উপস্থিত থাকতে হত। কমলবাবু কারো কাছ থেকে এতটুকু শিথিলতা বা অমনোযোগিতা সহ্য করতেন না — তা সে যতবড় খ্যাতিমান শিল্পীই হোন না কেন। ঠিক সময়ে না এলে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যেত, পরে এসে সেই দরজা খুলে ঢুকবার মতো সাহস কারো ছিল না। HMV-র কর্তৃপক্ষরা তখন অধিকাংশই ইংরেজ ছিলেন। তাঁরা কেউ দমদম থেকে রিহার্শাল রুমে এলে নিচে থেকে বেয়ারা পাঠিয়ে কমলবাবুর অনুমতি নিয়ে দেখা করতে আসতেন।

'তাঁর সবরকম কাজেই একটি অসাধারণ নিয়মানুবর্তিতা বা ডিসিপ্লিন ছিল। সে জন্য তাঁর সঙ্গে যাদের কাজ করতে হত তাদেরও অনুরূপ ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হত। কোনো খ্যাতিমান শিল্পীকে তিনি এতটুকু প্রশ্রয় দেননি — বা কোনো নূতন শিল্পীকেও তিনি এতটুকু অবহেলা করেননি। সুরকার হিসেবে তাঁর এতই দক্ষতা ছিল যে একবার পুজোর সময় তিনি একাই ৩০ খানা গানেতে সুরারোপ করেছিলেন' (*আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন* : ৭৬)।

প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। খুব কাছ থেকে দেখেছেন কমল দাশগুপ্তকে — পেয়েছেন তাঁর অপার স্নেহ ও আনুকূল্য। কমল দাশগুপ্তের সহায়তাতেই রামকুমারের প্রথম রেকর্ড বের হয়। কমলের কাজের ধরন সম্পর্কে রামকুমার বলেছেন : 'কমল দাশগুপ্ত ট্রেনার হিসেবে ছিলেন খুব কড়া ধাঁচের। বিষ্ণুভবনের থেকে নলিন সরকার স্ট্রিটের রিহার্সাল রুমের নিয়মকানুন বদলে গেল অনেক। কারণ কমল দাশগুপ্ত খুব ঘড়ি ধরে কাজ করতে ভালোবাসতেন। তাঁর নির্দেশে রিহার্সাল রুমে ঢোকা এবং বেরনো অনেক কঠোর হল। ... কমল দাশগুপ্ত গ্রামোফোন কোম্পানির পুরো রিহার্সালটাই একটা নিয়মে বেঁধে দিলেন। আর এই নিয়ম নড়চড় করাটা বেশ কঠিন ছিল। উনি কোন শিল্পী কখন গান গাইবেন, তার একটা রুটিন করে দিয়েছিলেন। সেই সময়ের বাইরে যদি কখনও কোনও শিল্পী চলে যেতেন, তিনি তাঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন' (*পুরাতনী* : ৬৮)। এতে শিল্পীদের মধ্যে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও তাতে কোনো লাভ হতো না, কেননা কমল দাশগুপ্ত তখন এইচএমভির জন্যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা গানে কমল দাশগুপ্তের অবদান ও অবস্থান সম্পর্কে রামকুমার যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে কোনো সংগীতগুণীরই দ্বিমত পোষণের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুযোগ নেই : 'কমল দাশগুপ্ত গ্রামোফোন কোম্পানির মাধ্যমে বাংলা গানকে এক উচ্চাসনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এত বড় সুরকার সেইসময় ভারতবর্ষেও খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। বাংলা সংগীতের যে আকাশছোঁয়া সমৃদ্ধি তা কমল দাশগুপ্তের যাদুতে সোনার রূপ ধারণ করে' (*পুরাতনী* : ৭০)।

পঙ্কজকুমার মল্লিকও এই অনুজ সুরস্রষ্টা সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এইচএমভি ও কলম্বিয়ার একক প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক আলাদা হয়ে গেলে কমল দাশগুপ্ত এইচএমভির চিফ্ ট্রেনারই থেকে যান। কলম্বিয়ার পক্ষ থেকে তখন পঙ্কজকুমার মল্লিককে চিফ্ ট্রেনার হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু রেডিও ও নিউ থিয়েটার্সের চাকরির দায়বদ্ধতার কারণে পঙ্কজকুমারের পক্ষে কলম্বিয়ায় যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি কলম্বিয়া-কর্তৃপক্ষকে কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। তাঁরা জানান, কমল সহায়তা করবেন, পাশাপাশি পঙ্কজকেও কলম্বিয়া চায়। পঙ্কজ মল্লিক তাঁদের বলেছিলেন : '... ওর অনেক ক্ষমতা। কমল ইচ্ছে করলে একটা কেন দশটা কোম্পানির কাজই সে অনায়াসে করতে পারে। আসলে কমল is such a music director, who is a trainer of trainers' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ৭৬-৭৭)। পাশাপাশি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ যে বিনয়মিশ্রিত মন্তব্য করেছিলেন তাও স্মরণ করতে হয় : 'কমল সব তৈরি করে আর আমরা সবাই মোট বই। আমরা সব মুটে' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ২১৬)। সমকালীন সংগীত-মহাজনদের এইসব মন্তব্য সংগীতজগতে কমল দাশগুপ্তের গুরুত্ব ও স্থান স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে দেয়।

কথায় ও সুরে বাংলা গানে বৈচিত্র্য ও নতুন ধারা এনেছিলেন প্রণব রায় ও কমল দাশগুপ্ত — দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এই বাল্যসখা দুজনের সৃষ্টির নতুন পর্ব শুরু হয় গ্রামোফোন কোম্পানির বিষ্ণুভবনে। প্রণব বলেছেন : 'বিষ্ণুভবনের দোতলার একটা ঘরে বসতেন কাজী সাহেব আর তিনতলায় একটা ঘরে বসত কমল দাশগুপ্ত। আমারও আড্ডা হল সেই ঘরে। আমি গান লিখতাম, কমল সুর করতো। এইভাবে চলল বছরের পর বছর। (*দেশ* : বিনোদন সংখ্যা ১৯৮৪; ৬৬)। এরপর 'বিষ্ণুভবন থেকে রিহার্সাল রুম এলো নলিন সরকার স্ট্রীটে। ... এই রিহার্সাল রুমেই আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু গীতিকারজীবনের ঘনিষ্ঠতম সাথী কমল দাশগুপ্তের সুরকার জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হয়েছে (*দেশ* : বিনোদন সংখ্যা ১৯৮৪; ৭০)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছয়

কমল দাশগুপ্তের ব্যক্তিগত ও সংগীতজীবনে দুই নারী গভীরভাবে জড়িয়ে আছেন — একজন যূথিকা রায়, অপরজন ফিরোজা বেগম। তাঁর জীবনচলার পথ যে কালক্রমে ছন্দহীন ও অবিন্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তা মূলত যূথিকার প্রেম-প্রত্যাখ্যানের কারণেই। সেই ডুবন্ত কমলকে আরেকজন হাত বাড়িয়ে টেনে তুলেছিলেন বাঁচিয়ে তোলার প্রত্যাশায়। কিন্তু তখন তাঁর জীবন-ট্র্যাজেডির প্রায় শেষাঙ্কের অভিনয় শুরু হয়েছে।

যূথিকা রায় কমল দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নজরুল ভিতটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তবে যূথিকার প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির পেছনে কমলের আগ্রহ ও অবদানই সবচেয়ে বেশি। নিজে গান শিখিয়েছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, কণ্ঠের উপযোগী গান নির্বাচন করেছেন, গায়কির নিরীক্ষা করেছেন। 'আধুনিক বাংলা গানে'র সূচনা যূথিকার কণ্ঠে, আর তা সম্ভব হয়ে ওঠে প্রণব রায়ের কথা ও কমল দাশগুপ্তের সুরে। যূথিকার রেকর্ডে গাওয়া ১১০টি বাংলা ও ২০৯টি হিন্দি গীত-গজল-ভজন-নাতের সুর করেন তিনি। কমল এককভাবে কোনো শিল্পীর গাওয়া গানের সবচেয়ে বেশি সুরযোজনা করেছেন যূথিকার গানের। এই সংখ্যার তথ্য থেকেও বোঝা যায় যূথিকার প্রতি কমলের মনোযোগ কতো বেশি ছিল। এইচএমভিতে মহিলা শিল্পীর গান রেকর্ড করার ক্ষেত্রে কমল পক্ষপাতিত্ব করে প্রতিশ্রুতিশীল অনেক শিল্পীকে বসিয়ে রেখে যূথিকাকে সবচেয়ে বেশি সুযোগ দিয়েছেন — সমকালে এমন অভিযোগও উঠেছিল। ধীরে ধীরে যূথিকার প্রতি তাঁর দুর্বলতা জাগে এবং তা একতরফা প্রণয়ের জন্ম দেয়। কমলকে ফিরিয়ে দেওয়ার কারণে যূথিকার সংগীতজীবনে কী এই ঘটনা কোনো বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল! বিমান মুখোপাধ্যায় কিছুটা অনুযোগের সুরেই বলেছেন, যূথিকাকে দিয়ে কমল এক অজ্ঞাত কারণে ফিল্মের গান গাওয়াননি, কিছুটা অবিচারই করেছেন! কিন্তু আবুল আহসান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতায় যূথিকা বলেন, তিনি নিজেই চলচ্চিত্রে গান গাইতে আগ্রহী ছিলেন না (*কালি ও কলম* : ১৫৭)। কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে যূথিকা রায়ের সঙ্গে ২৩ মে ২০১০ ও ২৬ নভেম্বর ২০১১ তাঁর উত্তর কলকাতার বাড়িতে বসে আমার একান্তে আলাপের সুযোগ হয়। সুরের গুরু কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গে তাঁর কণ্ঠে হতাশা, বেদনা ও ক্ষোভের সুর বেজে ওঠে। যে 'কমলদা'কে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন — মূল্য দেননি তাঁর আবেগ-ভালোবাসার, সেই কমল দাশগুপ্ত যখন তাঁর বিপন্নকালে তাঁরই আরেক প্রতিভাময়ী শিষ্যা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিরোজা বেগমকে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে বিয়ে করলেন, তখন তিনি সেটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি — মনে মনে প্রচণ্ড আহত ও ক্ষুব্ধ হন। এ-বড়ো রহস্যের কথা — বিস্ময়ের ব্যাপার! বাইরে প্রত্যাখ্যান করলেও ভেতরে ভেতরে তাঁর জন্যে তবে কী একটা দুর্বলতা থেকেই গিয়েছিল যূথিকার! তাঁকে তিনি গ্রহণও করবেন না, আবার ত্যাগও করবেন না — এ-এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব!

যূথিকার প্রত্যাখ্যান কমলের বুকে বড়ো বেজেছিল। তিল তিল করে ভালোবাসা-প্রীতি-মমতা দিয়ে যাঁকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন — যাঁকে নিয়ে গান লিখে নিজেই রেকর্ড করেছিলেন — 'মম যৌবনসাথী বুঝি এলো' — তাঁর এই অস্বীকৃতি ছিল কমলের ভাবনার বাইরে। এতো বড়ো বেদনা কমলের শিল্পী-মনকে গভীরভাবে আহত করেছিল — তাঁর সংবেদনশীল প্রেমিক অন্তরের গোপন রক্তক্ষরণ তাঁর সৃষ্টিশীল স্বাভাবিক জীবনের ওপর ছায়া ফেলেছিল। কমল ধীরে ধীরে আত্মক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যান — নেশা তাঁকে হয়তো বিরহ ভোলার প্রলোভন দেখায়। তিনি নিয়মিত মরফিন ইন্‌জেকশন নিতে অভ্যস্ত হয়ে যান। কেউ কেউ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের দোহাই দেন এই মরফিনের ব্যাপারে। সেই মহান সুরস্রষ্টা কাজ ভুলে গেলেন। ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস, অর্থ নেই হাতে, কাজের তাড়া নেই, মন নেই কাজে। কাছের মানুষেরা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগলেন — গ্রামোফোন কোম্পানিতেও কদর কমলো — ফিল্মের কাজেও আর ডাক পড়ে না। একে একে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হতাশায় আচ্ছন্ন ভাগ্যহীন হতদরিদ্র এক ছিন্নমূল প্রৌঢ় বাঙালির প্রতিকৃতি হয়ে গেলেন কমল দাশগুপ্ত। এ কোন্ কমল — গ্রামোফোন-চলচ্চিত্র-বেতারের সেই দাপুটে মানুষটি কোথায় হারিয়ে গেলেন!

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চোখ দিয়ে আসল কমল দাশগুপ্তের ছবিটা কেমন তা খানিকটা দেখা যাক : 'খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন কমলদা। তখন তাঁর অবস্থাও সচ্ছল। ফলে প্রায় রোজই পাটভাঙা ধুতি ও হাফ শার্ট পরে কাজের জগতে আসতেন। বাংলা গানের সঙ্গে সঙ্গে পোশাকেও তিনি বাংলায় এক নতুন স্টাইল তৈরি করেছিলেন, ধুতির সঙ্গে ফুল/হাফ/হাতা শার্ট তিনি পরতেন, হাফহাতা পাঞ্জাবি পরতেন না। পরবর্তীকালে হেমন্তবাবু ওঁর ওই স্টাইলটি লুফে নেন। কমলদা বিদেশি সেন্ট ছাড়া মাখতেন না, গাড়ি ছাড়া ঘুরতেন না' (*পুরাতনী* : ৭৩)। অঢেল উপার্জন করেছেন একসময়। ১৯৪৬ সালে যিনি সাঁইত্রিশ হাজার টাকা আয়কর দেন, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় তাঁর আয়ের পরিমাণ কেমন ছিল!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যূথিকার বিরহযাতনা এবং সেইসঙ্গে কিছু পারিবারিক সংকট কমলকে নেশা ধরিয়েছিল। দেদার টাকা উড়ে যেতে লাগলো তাতে। এইসময় নাথ ব্যাংক লালবাতি জ্বাললে সব পুঁজি হারিয়ে কমল পথের ভিখিরির মতো নিঃস্ব হয়ে যান। বাড়ির বিশ্বস্ত পরিচারক আর যেটুকু জমা ছিল তাও নিয়ে একদিন উধাও হয়ে গেল — প্রকৃত অর্থেই কমল হয়ে গেলেন সর্বহারা।

সাত

ফরিদপুরের এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে সুকণ্ঠী ফিরোজা বেগম গান শিখতে যান কলকাতায়। ছিলেন অধুনা বিস্মৃত কিন্তু এককালের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক চিত্ত রায়ের ছাত্রী। তিনিই ফিরোজাকে আরো ভালো করে গান শেখার জন্যে কমল দাশগুপ্তের কাছে হাওলা করে দেন। কমল তখন অস্তাচলগামী সূর্য। তবু তাঁর সংগীতজীবনের সায়াহ্নে তাঁর সবটুকু সুর উজাড় করে দিলেন ফিরোজার জন্যে। এই ফিরোজাই নিঃস্ব-ধ্বস্ত কমলের হাত ধরলেন — অসমবয়সী এই মানুষটিকে চিরকালের জন্যে জড়িয়ে নিলেন নিজের জীবনের সঙ্গে। প্রেম দিয়ে, মমতা-সেবা দিয়ে চেষ্টা করলেন আবার এই সুরের গুরুকে জাগিয়ে তুলতে।

ফিরোজা-কমলের বিয়েকে তাঁদের স্বজন-বন্ধু-পরিবার কেউই সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। কলকাতায় এর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল। তবে সংগীতজগতের হৃদয়বান কেউ কেউ কমল দাশগুপ্তের দুর্ভাগ্যের কথা বিবেচনা করে এই বিয়েকে ও ফিরোজা বেগমের একধরনের আত্মত্যাগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন — তাঁদের মধ্যে সন্তোষ সেনগুপ্ত ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে করতে হয়। সন্তোষ সেনগুপ্ত লিখেছেন : 'তাঁর [কমল দাশগুপ্ত] এই চরম দুর্দিনে এগিয়ে এলেন একজন অসাধারণ সুন্দরী যুবতী মহিলা — তাঁকে বিবাহ করলেন — তাঁর সব ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন — নাম ফিরোজা বেগম। ... সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে — নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৈভব সব ত্যাগ করে শুধু প্রেমের জন্য সর্বত্যাগী হলেন। কমলবাবুর রুগ্‌ণতা তার দারিদ্র্য, তার অভিমান সবকিছুর তিনি সমান অংশীদার হলেন পরমানন্দে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রেমের যা কিছু উপাখ্যান পড়েছি — এর চেয়ে দীপ্যমান এর চেয়ে মধুর এর চেয়ে আত্মসমাহিত আর কিছুর সন্ধান পাইনি। এই অসামান্য নারীকে বার বার নমস্কার জানিয়েছি' (*আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন* : ৭৭-৭৮)।

এবারে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা শোনা যাক। তিনি বলেছেন :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ওইরকম রাজার মতো চেহারা, অত শৌখিন মানুষটি আধময়লা ধুতি পরে অনাহারে দিন কাটাতেন। কমলদাকে তখন চোখে দেখা যেত না। যেন এক বাজপড়া তালগাছ। বাংলা সংগীতমহলও সেইসময় এই মানুষটির দিকে ফিরে তাকায়নি। হয়তো তাঁকে পথে ঘুরে ঘুরেই মরতে হত, যদি ফিরোজা বেগম এসে তাঁকে সসম্মানে ঢাকায় না নিয়ে যেতেন। ফিরোজা বেগম তাঁর ছাত্রী ছিলেন। বয়সে ছিলেন কন্যাসম। ফিরোজা বেগম তাঁর থেকে অনেক ছোট হলেও, তাঁকে স্বামীর মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেননি। অসুস্থ অবহেলিত স্বামীকে নিয়ে তিনি চলে যান বাংলাদেশে। কাজি কামালউদ্দিন নামে তাঁর দ্বিতীয় জীবন শুরু হয়' (*পুরাতনী* : ৭৩-৭৪)।

অবশ্য বিয়ের পর তাঁরা কলকাতাতেই বাসা বেঁধেছিলেন — সুরের সাধনায় নিমগ্ন থাকার জন্যে স্থায়ীভাবে এখানেই বাস করার ইচ্ছে ছিল তাঁদের। কিন্তু সময় ও সমাজ অনুকূল ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও কমল দাশগুপ্ত তাঁর আগের অবস্থান আর ফিরে পাননি। অবশ্য এর জন্যে গানের জগৎ থেকে একধরনের বিচ্ছিন্নতা ও সৃজনশীল ক্ষমতার হ্রাসও ছিল অনেকটা দায়ী। একমাত্র সান্ত্বনা, যূথিকা রায়ের মতো ফিরোজা বেগমকেও তিনি তৈরি করেছিলেন। ফিরোজাও অনেক খ্যাতি ও পরিচিতি পেয়েছিলেন নজরুলের গান গেয়ে আর কমল দাশগুপ্তের সুরের পুরনো কাব্যগীতিগুলো তাঁরই তত্ত্বাবধানে রি-মেক করে। সংগীতজগতে কমল দাশগুপ্তের অবক্ষয় ও অনাদরের কথা তাঁর গুণগ্রাহী ও সংগীতখ্যাতির জন্যে তাঁর কাছে কিছু পরিমাণে হলেও ঋণী সন্তোষ সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় : 'আমি ১৯৬৫ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং-এর কার্যভার গ্রহণ করি। সে সময়ে কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগম আমার কাছে কয়েকবার এসেছিলেন — ওঁদের রেকর্ডিং-এর কোনো কাজে প্রয়োজন হতে পারে কিনা শোনবার জন্য। কমলবাবুর সুরে আধুনিক গান গাইতে সে সময়ে আর কোনো শিল্পীই রাজি হলেন না — যেহেতু কমলবাবুর যুগ পার হয়ে গেছে' (*আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন* : ৭৮)। তবু সহৃদয় সন্তোষ সেনগুপ্ত সেকালের এমন একজন অসাধারণ সংগীতগুণীকে ফিরিয়ে না দিয়ে নজরুলসংগীতের একটি এলপি রেকর্ড পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আট

কিন্তু নানা কারণে এঁদের 'কলকাতা বাস সুখকর বা সম্মানজনক' হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই ১৯৬৫ সালে সপরিবার ঢাকায় চলে যান। ঢাকায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসার এই সালের উল্লেখ মেলে কমল দাশগুপ্তের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মোহাম্মদ আসাফউদ্দৌলাহ্‌র এক লেখায় — যশোর সীমান্তে তিনিই তাঁকে 'অভ্যর্থনা' জানান (*প্রথম আলো* : ২৯ জুন ২০১২)। আবার নজরুল-গবেষক আসাদুল হক বলেছেন : 'অবশেষে ১৯৬৭ সালে তাঁরা কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকা চলে আসেন। এই সময়ে তাঁদের তিনটি সন্তান। সম্ভবত ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নেন' (*নজরুল-সংগীতের রূপকার* : ৫১)। কিন্তু একটা উটকো তথ্য দিয়ে অভীক চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন আরো আগে — ১৯৫৮ সালে কমল 'শ্বশুরবাড়ির' দেশে চলে আসেন (*শিল্প ও শিল্পী* : ৮৫)। কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসার সাল ১৯৬৫-ই হোক বা ১৯৬৭-ই হোক, ততদিনে কমল দাশগুপ্তের জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে — এটা লক্ষ করে আসাফউদ্দৌলাহ্ মন্তব্য করেছেন : 'তখন তাঁকে কিছুটা অসুস্থ দেখেছিলাম। কেন যেন মনে হয়েছিল, তিনি জীবনকে অতি দ্রুত পুড়িয়ে ফেলছিলেন' (*প্রথম আলো* : ২৯ জুন ২০১২)।

কলকাতা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ঢাকাও তাঁকে গ্রহণ করেনি। সেইসময়ের সরকারও তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল না। কোনো প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসেনি তাঁর মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্যে। আমাদের লজ্জা ও দায় এই যে, কমল দাশগুপ্তকে জীবিকার জন্যে শেষজীবনে ঢাকায় একটা মুদিখানার দোকান খুলতে হয়েছিল। জীবনের প্রায় অন্তিমলগ্নে ঢাকা বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত হন। কাজ করার তেমন কোনো সুযোগ ও পরিবেশ ছিল না। জানা যায় : 'মাত্র কয়েকটি স্টুডিও রেকর্ডে কিছু গানের যন্ত্র-সঙ্গীত ও বাংলা কাওয়ালী গানের রেকর্ড করাবার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও হাসপাতালে অব্যবস্থার মাঝে মৃত্যুবরণ করেন' (*নজরুল-সংগীতের রূপকার* : ৫২)।

সেইসময়ের ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসার 'অব্যবস্থা'টা কেমন ছিল, সে-সম্পর্কে আশীষ চক্রবর্তীর সঙ্গে কমল দাশগুপ্তের জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে এক আলাপচারিতায় ফিরোজা বেগম বিষণ্ন কণ্ঠে জানিয়েছেন : 'চুয়াত্তরের এক রাতে বেতার থেকে বৃষ্টিতে ভিজে ফিরলেন বাসায়। তিনদিন পর থেকে ভীষণ জ্বর। দেশবরেণ্য এক চিকিৎসকের পরামর্শে ভর্তি করা হলো পিজিতে। কিন্তু রোগনির্ণয়ে দেরি হওয়ায় অবস্থার আরো অবনতি হলো, একপর্যায়ে কথাই বন্ধ হয়ে গেল। স্বামীর সুচিকিৎসা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় ভেবে পাচ্ছিলেন না ফিরোজা বেগম। এমনও হয়েছে সংসারের কাজে হাসপাতাল থেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেরিয়েছেন, যে ওষুধটা খাওয়াতে হবে সেটার নাম কাগজে লিখে রেখে এসেছেন কমল দাশগুপ্তের পকেটে, ফিরে গিয়ে দেখেছেন ওষুধটা খাওয়ানো হয়নি। যে ইনজেকশনটা পুশ করার কথা, করা হয়নি। ইনজেকশন হাসপাতালে নেই। সেটা কেনার জন্য ফিরোজা বেগম নিজে ছুটেছেন ফার্মেসি থেকে ফার্মেসিতে। পাননি! স্বামীর জন্য কেবিনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে কথা মনে করলে তো আজো বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে ফিরোজা বেগমের কণ্ঠ — 'কেবিন দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। জানতে চাওয়া হয়েছিল কমল দাশগুপ্ত কে? তাঁর স্ট্যাটাস কী?' — এইভাবে অনাদরে-অবহেলায় ২০ জুলাই ১৯৭৪ কমল দাশগুপ্ত চলে গেলেন।

নয়

বন্ধু প্রণব রায় বহু আগে অভিমানী-মনের বিরহব্যথার কথা গেঁথেছিলেন একটি গানে, কমল দাশগুপ্ত তাতে বিষণ্ন আবহের সুর-যোজনা করেছিলেন, সেই গানটির মুখটুকু উল্লেখ করে জন্মশতবর্ষে স্মরণ করি নীলকণ্ঠ সুরসাধক কমল দাশগুপ্তকে :

যেথা গান থেমে যায় দীপ নেভে হায়
মিলনের নিশি ভোরে।
যদি মনে পড়ে সেথায় খুঁজিও মোরে ॥

গ্রন্থঋণ

সিতাংশুশেখর ঘোষ : *বিমানে বিমানে আলোকের গানে*। তৃ-স : কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫।

সন্তোষ সেনগুপ্ত : *আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন*। কলকাতা, মাঘ ১৩৯২।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় : *পুরাতনী*। কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০।

জগন্ময় মিত্র : *শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে*। প্রতিভাস-সংস্করণ : কলকাতা, এপ্রিল ২০১০।

আসাদুল হক : *নজরুল-সংগীতের রূপকার*। ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৯৭।

দেশ (সাপ্তাহিক, কলকাতা) : বিনোদন সংখ্যা ১৯৮৪।

প্রথম আলো (দৈনিক, ঢাকা) : ২৯ জুন ২০১২।

শিল্প ও শিল্পী (ত্রৈমাসিক, ঢাকা) : আশ্বিন ১৪১৯।

কালি ও কলম (মাসিক, ঢাকা) : ফাল্গুন ১৪১৮।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্র ণ ব রা য়

মনে রেখো মোর গান

'যখন রব' না আমি দিন হ'লে অবসান,
আমারে ভুলিয়া যেও, মনে রেখো মোর গান।
আমার মালার ফুলে
ধুলা যদি লাগে ভুলে,
গানের কুসুমগুলি হবে নাত' কভু ম্লান।
আমারে ভুলিয়া যেও, মনে রেখো মোর গান ॥
(মোর) জীবনের যত ভুল (তুমি) ভুলে যেও সেই দিন,
নিভে যাক নিশিভোরে যে-দীপ হ'ল মলিন।
গানে গানে পরিচয়
সুন্দরতর হয়,
সেই স্মৃতি হবে মোর বিদায় বেলার দান।
আমারে ভুলিয়া যেও, মনে রেখো মোর গান ॥'

— বহুকাল আগে এই আর্তি সায়গলের কণ্ঠে সুর হয়ে ভেসে একদিন মানুষকে বিষণ্ন-বিধুর অনুভূতির জগতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, এই কথামালা যিনি গেঁথেছিলেন, তাঁর নাম প্রণব রায় (১৯১১-১৯৭৫)। এই গানের বাণী যেন তাঁর জীবনকথারই প্রতিধ্বনি। এই গানের বাণী আক্ষরিক অর্থেই তাঁর জীবনের জন্যে সত্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর কথার ঐশ্বর্যে একদিন বাংলা গানের ভুবন আলোকিত হয়ে উঠেছিল, প্রেমের রোম্যান্টিক অনুভূতি আর বিরহের দীর্ঘশ্বাসে সুরের আকুতি ঝরে পড়েছিল মানুষের মনে। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর বাণী এক মোহময় আবেশ সৃষ্টি করেছিল। সেকালের এমন কোনো খ্যাতিমান শিল্পী নেই যিনি প্রণব রায়ের লেখা গান করেননি। সেসব গান এখনও মানুষকে স্মৃতিকাতর ও মোহাবিষ্ট করে রাখে, কিন্তু সেই গানের পেছনের মানুষটির নাম ক'জনই বা জানে! বাঙালি ভুলতে ভালোবাসে, তাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁকেও অনায়াসে ভুলতে পেরেছে। এ-বছর (২০১১) প্রণব রায়ের জন্মের শতবর্ষ — সে-কথাও বাঙালি মনে রাখেনি।

বিশ শতকের একেবারে গোড়া থেকে গ্রামোফোন যন্ত্রের কল্যাণে বাংলা গান নতুন প্রাণ পায় — দ্রুত বিকশিত হয়ে ওঠে — ছড়িয়ে পড়ে শহরে-মফস্বলে-গ্রামে-গঞ্জে। বিদেশি কোম্পানির পাশাপাশি দেশি কোম্পানিও সমানে পাল্লা দিতে থাকে। পরিবেশনা, সুরসৃষ্টি ও বাণীরচনায় নতুন নতুন প্রতিভা গ্রামোফোন কোম্পানিগুলোকে সমৃদ্ধ করে তোলে। একটি গান যৌথশিল্পের ফসল। এর পেছনে যেমন থাকে শিল্পীর গায়কি, তেমনি থাকে সুর-যোজনার পর্ব, যন্ত্রীদের সহযোগ এবং গীতরচনার পর্যায়। কিন্তু শ্রোতার কাছে শিল্পী ছাড়া আর সবাই অদৃশ্য। একসময়ে গ্রামোফোন রেকর্ড-লেবেলে শিল্পী ছাড়া গীতিকার বা সুরকারের নাম ছাপা হতো না। পরে সে রেওয়াজ গড়ে ওঠে। যতোদূর মনে হয় গীতরচয়িতা হিসেবে গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের নামই প্রথম ছাপা হয়। রেকর্ডসংগীতে গীতিকার ও সুরকারও ক্রমে স্বীকৃতি ও গুরুত্ব পেতে থাকেন।

গ্রামোফোনে গীতরচয়িতা হিসেবে নজরুলই ছিলেন প্রধান পুরুষ। বাংলা গানের কথা ও সুরে তিনি নতুন রূপ-রীতি-বৈচিত্র্য আনেন। তাঁর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ অনেকেই গান রচনায় এগিয়ে আসেন। তাঁর প্রেরণা ও প্রভাব গভীরভাবে এঁদের ওপরে পড়েছিল। নজরুলের বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই গান লিখেছেন, কিন্তু তুলসী লাহিড়ী ও হীরেন বসু ছাড়া আর কেউ বড়ো রকমের সাফল্য পাননি। তবে নজরুলের সমসময়ে তাঁর অনুজ-গীতিকারদের মধ্যে শৈলেন রায়, অজয় ভট্টাচার্য, বাণীকুমার, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য ও প্রণব রায়ের নাম করতে হয়, — যাঁদের লেখা গান মানুষের মনে দাগ কাটতে পেরেছিল। নজরুলের বাণী ও ভাবকে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে এঁদের কারো পক্ষেই গান লেখা সম্ভব ছিল না। এঁদের কেউই নজরুলের প্রভাব-বলয় থেকে মুক্ত হয়ে আলাদা মেজাজ-ভাব বা বাণীভঙ্গি তৈরি করতে পেরেছেন, এ-কথা বলা যাবে না। নজরুল-যুগের এই গান-রচয়িতারা তাই নজরুল-অনুসারী গীতিকবি হয়ে উঠেছেন। এঁদের মধ্যে আবার অজয় ভট্টাচার্য ও প্রণব রায় — এই দু'জনের নাম আলাদা করে বলতে হয়। বেশ পরে এঁদের সমানধর্মা আর-একজন এসেছিলেন — তিনি মোহিনী চৌধুরী। অজয় ভট্টাচার্য ও প্রণব রায় — এঁদের দু'জনেরই লেখালেখির শুরুটা হয়েছিল কবিতা দিয়েই — গানের পর্বটি পরের ঘটনা।

অল্প লিখেও প্রণব রায় কবি হিসেবে স্বীকৃতি ও খ্যাতি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলেন। তাঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন আধুনিক কবিদেরও বিশেষ মনোযোগ ও প্রশংসা পেয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত ত্রৈমাসিক *কবিতা* পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই (আশ্বিন ১৩৪২) প্রণবের কবিতা 'আলাপ' বেরিয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন, *কবিতার* এই সূচনা সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, হেমচন্দ্র বাগচী ও সমর সেনের মতো খ্যাতিমান আধুনিক কবিদের পাশাপাশি প্রণব রায়ের কবিতাও ছাপা হয়েছিল। রুচিবান, বোদ্ধা ও সতর্ক সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু কবিতা-নির্বাচনে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কিংবা জানা-চেনার বিষয়কে কখনই গ্রাহ্য করতেন না। তাই প্রণবের কবিতা নির্বাচনে বুদ্ধদেবের বিবেচনা যে বেঠিক ছিল না তার প্রমাণ মেলে কবিতার প্রথম সংখ্যায় তাঁর লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা এক চিঠিতে (৩ অক্টোবর ১৯৩৫) রবীন্দ্রনাথ ওই সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো কবিতা সম্পর্কেই আলাদা আলাদা মন্তব্য করেছেন — শেষে বলেছেন দুই নবীন কবির কথা : '... অজিতকুমার দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাঁদের কবিত্ব' (*দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১)। *কল্লোল* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রণবের দুটি কবিতা ('স্মরণ' : চৈত্র ১৩৩৫ ও 'তোমাকে' পৌষ ১৩৩৬), দুটি গল্প ('একটি মুহূর্ত' : আষাঢ় ১৩৩৬ ও 'গন্ধ' : অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) এবং *ধূপছায়া* পত্রিকায় প্রকাশিত 'সন্ধ্যাতারা' গল্পটি পাঠক ও সমালোচকের বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল।

দুই

প্রণব রায় ২৪ পরগনার বড়িশার ইতিহাসখ্যাত সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের সন্তান। তাঁর জন্ম ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৮ (৫ ডিসেম্বর ১৯১১) কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। দেবকুমার রায়চৌধুরী ও সুকৃতি দেবী তাঁর জনক-জননী। পিতা ব্রাহ্মণ পরিবারের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে পরিবারে বেশ প্রতিক্রিয়া ও সংকটের সৃষ্টি হয়। শরিক-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক কিছু শীতল ও শিথিল হয়ে পড়ে। এমন একটা পরিবেশেই প্রণব রায়ের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর স্বভাবে কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বিষয়-আশয় কিংবা বংশ-কৌলীন্যের প্রসঙ্গে তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন। তাই পৈতৃক সম্পত্তির দাবি যেমন অনায়াসে ত্যাগ করেন, তেমনি পদবির গৌরবের প্রতীক 'চৌধুরী'ও নাম থেকে ছেঁটে ফেলেন। আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কও তেমন গাঢ় ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একধরনের বিচ্ছিন্নতার মনোভাব তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

মেধাবী ছাত্র ছিলেন প্রণব রায়। ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল থেকে প্রবেশিকায় খুব ভালো ফল করেন। এরপর ভর্তি হন সিটি কলেজে, আবার কিছুকাল পরে কলেজ বদল করে ছাত্র হন বি.ই. কলেজে। জলপানি পাওয়া বিজ্ঞানের এই প্রতিভাবান ছাত্রটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। নজরুলের প্রেরণা ও প্রভাব এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির সান্নিধ্যে রাজনীতিতে হাতেখড়ি — এইভাবে স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রণব রায় এ-বিষয়ে বলেছেন : '... *ধূমকেতু* কাগজের পর কাজীদা *লাঙল* বলে একটি পত্রিকা বের করেছেন।... আমি *লাঙলের* খুব অনুরাগী ভক্ত পাঠক ও নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম।... সত্যি কথা বলতে কি এই *লাঙল* পত্রিকা থেকেই আমি সেই ছাত্রাবস্থাতেই, সেই কিশোর মনেই বিক্ষোভের বীজ আমার মনে বুনে যায়। সে বিক্ষোভটা আর কিছু নয়, তখন থেকেই আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম যে পরাধীনতা ব্যাপারটা কি। এবং আমার পরবর্তী বিদ্রোহী ঠিক বলব না, বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত তখন থেকেই' (*দেশ* : বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১; ৬৭)। ১৯৩১-এ সাপ্তাহিক *বিশ্বদূত* পত্রিকায় 'কমরেড' নামে একটি কবিতা লিখে রাজরোষে পড়েন, ফলে কারাবরণ করতে হয়। কারাভোগের মেয়াদ অল্পদিনের হলেও নানা কারণে আর কলেজে ফিরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখায় ছেদ পড়ার পর সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

সাহিত্য ও সংগীতের একটি আবহ পরিবারে বেশ ভালোমতোই ছিল। মা সুকৃতি দেবী ছিলেন জাত-পড়ুয়া। বইয়ের নেশায় মশগুল হয়ে থাকতেন। বাড়িতে গান-বাজনারও বেশ চল ছিল। এর প্রভাব প্রণবের ওপর পড়েছিল। প্রণবের বাজনার হাত ও গানের গলাও বেশ ভালো ছিল। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের তারিফ পেয়েছেন গান শুনিয়ে। পরিবারের এই আনন্দবাসর হঠাৎই ভেঙে যায় মায়ের মৃত্যুতে। মাত্র ন'বছর বয়সে মাকে হারিয়ে তাঁর জীবনটা হয়ে ওঠে শ্রীহীন ও ছন্দহারা। আশ্রয় জোটে পিসেমশাই ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর জীবনে এই মহানুভব আত্মীয়-অভিভাবকের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কোনো সহায়তা বা আনুকূল্য পাননি কখনো। এই পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা প্রণবের মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল। একটা বোহেমিয়ান ভাব তাঁকে দখল করে। বিয়ে হয় রমা দেবীর সঙ্গে। প্রণব-রমার দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছিল। প্রণব রায়ের মৃত্যু হয় ২২ শ্রাবণ ১৩৮২।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন

অল্প বয়সে প্রণব গানের চেয়ে সাহিত্যের দিকেই বেশি ঝুঁকেছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় হাতেলেখা পত্রিকা বের করে বেশ সাড়া জাগিয়েছিলেন। তারপর কলেজ বার্ষিকীতে লিখেও মনোযোগ কাড়েন অনেকের। ক্রমে লেখা প্রকাশের পরিসর বাড়তে থাকে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ এসব মাধ্যমে সেই বয়সে অনর্গল লিখে গেছেন এবং তা সেকালের *ভারতবর্ষ, বসুমতী, পুষ্পপাত্র, গল্পলহরী, আত্মশক্তি, নবযুগ, স্বদেশ, শিশির, বিশ্ববন্ধু, কল্লোল, ধূপছায়া, কবিতা* — এইসব নামী পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। গল্প-প্রবন্ধ লিখলেও আসলে তাঁর হাত ছিল কবিতারই।

কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। কল্লোলের আড্ডায় কয়েক বন্ধু মিলে প্রণবও জুটেছিলেন একসময়। কল্লোলের সেই আড্ডার স্মৃতিচর্চায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন : '*ধূপছায়া* বেরোয় এ সময়। আধুনিক সাহিত্যেরই পতাকাবাহী পত্রিকা। সম্পাদক ডাক্তার রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় স্কুলে আমার আর প্রেমেনের সহপাঠী ছিল। তাই আমাদের দলে টানল সহজেই। সেই টানে আমরা ও-দল থেকে নতুন কয়েকজন লেখককে *কল্লোলে* নিয়ে এলাম। পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় আগেই এসেছিল, এবার এল সত্যেন্দ্র দাস, প্রণব রায়, ফণীন্দ্র পাল আর সুনীল ধর। ভবের পদ্মপত্রে আরো ক'টি চঞ্চল জলবিন্দু। নবীনের দীপ্তার্করাগে ঝলমল' (*কল্লোল যুগ* : ১৬৫)। প্রণব ও তাঁর বন্ধুদের আগমনে কল্লোলের মজলিশ যে আরো জমে উঠেছিল — নতুন-পুরাতনেরা অল্প সময়েই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল সে-কথাও অচিন্ত্যকুমার উল্লেখ করেছেন : '*কল্লোলের* এ নব পর্যায়টি আরো মধুর হয়ে উঠল। দুয়ার অনুক্ষণ খোলা আছে, হে তরুণ, জরাহীন যৌবনের পূজারী, নবজীবনের বার্তাবহ, এখানে তোমাদের অনন্ত নিমন্ত্রণ। বর্ষে-বর্ষে যুগে-যুগে আসবে এমনি এই যৌবনের ঢেউ। ধরন-ধারণ-করণ-কারণ-না-জানা শাসন-বারণ-না-মানা নিঃসম্বলের দল। স্বপ্নের নিশান নিয়ে সত্যের চারণেরা! *কল্লোল* চিরযুবা বলেই চিরজীবী' (*কল্লোল যুগ* : ১৬৫)। প্রণব ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার সম্পর্ক *কল্লোলের* কারো কারো অনেককাল ছিন্ন হয়নি। অচিন্ত্যকুমার স্মরণ করেছেন সেই দিনগুলোর কথা : 'সত্যেন্দ্র দাস কোথায় সরে পড়ল, থেকে গেল আর চার-জন, পাঁচুগোপাল, প্রণব, ফণী আর সুনীল — 'বন্ধু চতুষ্টয়'। একটি সংযুক্ত প্রচেষ্টা ও একটি প্রীতিপ্রেরিত একপ্রাণতা। যেন বিরাট একটা বন্যার জল কোথায় গিয়ে নিভৃতে একটি স্তব্ধশীতল জলাশয় রচনা করেছে। *কল্লোল* উঠে গেলে আড্ডার খোঁজে চলে এসেছি এই বন্ধু-চতুষ্টয়ের আখড়া। পেয়েছি সেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হৃদয়ের উষ্ণতা, সেই নিবিড় ঐক্যবোধ। মনে হয়নি উঠে গেছে *কল্লোল* (*কল্লোল যুগ* : ১৬৫)। বহুকাল পরেও সেই 'হৃদয়ের উষ্ণতা' আর 'নিবিড় ঐক্যবোধ' যে মুছে যায়নি তা বেশ বোঝা যায় প্রণব রায়কে লেখা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি চিঠিতে (১৩ অক্টোবর ১৯৬৯) : 'বহুদিন পর সেই পরিচিত হস্তাক্ষর দেখলাম। এমন যার হস্তাক্ষর তাকে দেখবার জন্যে ঔৎসুক্য জাগছে।... সন্ধ্যার পর যেদিন মন চায় চলে এস। হয়তো দেখবে মনের টানে আমি সে সময় বাড়িতেই অপেক্ষমাণ।'

এই লেখালেখির সূত্র ধরেই প্রণব রায় জড়িয়ে পড়েন সাংবাদিকতায়, — নিজেও পত্রিকা প্রকাশে উদ্‌যোগী হন। জেল থেকে বেরুনোর পরপরই *রোমাঞ্চ* নামে একটি গোয়েন্দা পত্রিকা বের করেন কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধুর সহযোগে। কিন্তু এই শখের পত্রিকা বেশিদিন চলেনি। এরপর প্রণব রায় নিজের সম্পাদনায় বের করেন *নাগরিক* পত্রিকা। প্রণব রায় জানাচ্ছেন : '... সেটা বোধ হয় '৩৬ সাল হবে 'নাগরিক' বলে একটা সাপ্তাহিক কাগজ আমি বের করি।... সেই কাগজে আমরা কোন বাঁধন না মেনে মনের সাধ মিটিয়ে লিখতাম। তাতে politics থাকতো, থাকতো Corporation Topics, গল্প-উপন্যাসও থাকতো, সিনেমা স্টেজের আলোচনাও থাকতো। *নাগরিক* পত্রিকাটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে আমি কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি যে আমার এক আনা দামের নাগরিক পাঁচ সিকে দামে বিক্রি হচ্ছে।... যাই হোক রাজরোষে কাগজটা আমাদের বন্ধ করেই দিতে হল' (*দেশ*, বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১; ৬৬)। *নাগরিক* নজরুলের উদার আনুকূল্য পেয়েছিল — পাশাপাশি সহায়তা ছিল সেকালের আরো কোনো কোনো নামী লেখকেরও। এ-সম্পর্কে প্রণব রায় বলেছেন : 'এই কাগজের জন্য কাজীদার কাছ থেকে সময়ে অসময়ে যখনই লেখা দাবী করেছি বসে বসে সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখে দিয়েছেন। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়ে *নাগরিকে* ছেপেছি। শুধু কাজীসাহেব নয়, প্রেমেনদাও আমাদের অনেক ভাল ভাল কবিতা দিতেন। নৃপেনদা অর্থাৎ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক ভাল ভাল রচনা আমরা পেয়েছি' (*দেশ*, বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১; ৬৬)। আসলে *নাগরিক* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ নয়, ১৯৩৪-এ। নজরুল এই পত্রিকার সঙ্গে অনুজ পরিচালকদের অনুরোধে জড়িয়েও পড়েছিলেন। শুধু নিজে লেখা দিয়ে নয়, লেখা সংগ্রহের কিছু ভারও গ্রহণ করেছিলেন। *নাগরিক* পত্রিকার ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যার জন্যে নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন ১৯৩৫ সালে। রবীন্দ্রনাথ বয়সের কারণে লেখা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিতে না পারলেও নজরুলকে ১৫ ভাদ্র ১৩৪২ একটি আন্তরিকতাপূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন। এই চিঠি পেয়ে নজরুল ওই *নাগরিকেরই* ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় 'তীর্থপথিক' নামে একটি জবাবি-কবিতা লেখেন। এ তো গেলো পত্রিকা-সম্পাদনার বিষয়, পাশাপাশি প্রণব *বসুমতী* পত্রিকাতেও বেশ কিছুকাল সাংবাদিকতার কাজ করেন। *নরনারী* নামে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে প্রকাশিত একটি পত্রিকার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। এই কাগজে তিনি প্রায় নিয়মিতই ছদ্মনামে লিখতেন।

চার

কবি-গাল্পিক-প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক-সাময়িকপত্র সম্পাদক — এইসব পরিচয় ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রণব রায়ের গীত-রচয়িতার পরিচয়টিই স্থায়ী হয়েছে — তাঁকে এনে দিয়েছে খ্যাতি ও পরিচিতি, সম্মান ও সমাদর। গ্রামোফোন ও চলচ্চিত্রের জগতে এ-বিষয়ে নজরুলের পরে এক অজয় ভট্টাচার্য ছাড়া আর কারো সঙ্গে প্রণব রায়ের তুলনা করা যায় না। কী করে প্রণব গানের জগতে এলেন — গান লিখতে শুরু করলেন, সে-কথা তিনি এক স্মৃতিচারণায় বলেছেন — তা থেকে জানা যায় সেকালের এক বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সুরস্রষ্টা ছিলেন উমাপদ ভট্টাচার্য। তিনি যুক্ত ছিলেন চণ্ডীচরণ সাহার হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে। এই উমাপদ ভট্টাচার্যের উৎসাহেই প্রণবের গান লেখার শুরু। প্রণব বলছেন : 'তিনি আমাকে মাঝে মাঝেই বলতেন যে, দু-চারটে গান লিখে দে ত'। এমনি খেয়ালের বশে আমি দু-চারটে গান তাঁকে লিখে দিয়েছিলাম। তিনি সুরও করেছিলেন। কিন্তু রেকর্ড করা আর হয়ে ওঠেনি তখনও (*দেশ*, বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১; ৬৫)। উমাপদর আন্তরিকতা সত্ত্বেও হিন্দুস্থান রেকর্ড-কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় প্রণবের গান রেকর্ড হলো না বটে, তবে কিছুকাল পরেই সে সুযোগ এলো নজরুলের সৌজন্যে। এই উমাপদ ভট্টাচার্যই কলেজ-পড়ুয়া প্রণবকে নজরুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অল্পদিনেই তিনি নজরুলের গুণমুগ্ধ হয়ে উঠলেন, নজরুলও তেমনি তাঁকে অপার স্নেহ-প্রীতিতে আপন করে নিলেন। নজরুলের পানবাগান লেনের বাসায় তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। প্রণবের গানের গলাও বেশ ছিল — সেইসঙ্গে সুর-তাল-লয়ের জ্ঞানও। নজরুল তখন গ্রামোফোন কোম্পানির চাহিদা মেটাতে দেদার বাংলা গজল লিখে চলেছেন। সেইসব গজলের সুর শিখে নিয়ে তিনি তাঁর গাইয়ে বন্ধুদের গলায় তুলে দিতেন। সেই বন্ধুদের একজন সন্তোষ সেনগুপ্ত। বহুকাল পরেও তিনি ভোলেননি এ-কথা, স্মরণ করেছেন পুরনো দিনের কথা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলতে গিয়ে : 'আমার হোষ্টেলে প্রণব রায় নামে একজন সুদর্শন যুবক আসতেন আমার কাছে মাঝে মাঝে — পরবর্তীকালে গীতকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আমাকে তিনি নজরুল ইসলামের গান শোনাতেন এবং তাঁর কাছেই প্রথম এ গান শিখি। আমাদের দুজনার মাঝে একটা গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তিনি নজরুল ইসলামের কাছ থেকে একটি করে গান শিখে আসতেন এবং সবার আগে আমাকে শেখাতেন' (*আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন* : ৯)। প্রণব রায়ের সৌজন্যে সন্তোষ সেনগুপ্ত নজরুলের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে তিনি নজরুলের অনেক গানই গেয়েছেন। বন্ধু প্রণব রায়ের লেখা গানও রেকর্ড করেছেন। মাঝখানে প্রণব জেলে যাওয়ায় নজরুলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে ছেদ পড়ে। জেল থেকে বেরিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানির চিৎপুরে বিষ্ণুভবনের রিহার্সেল রুমে আবার দেখা হয়। প্রণব তখন 'বেকার', কলেজের পাট চুকে গেছে জেলে যাওয়ার কারণে, আবার চাকরি-বাকরিও কিছু জোটাতে পারেননি। নজরুল এই সাক্ষাতের সময় প্রণবকে 'খানকতক' গান লিখে দিতে বললেন। একটু হকচকিয়ে গেলেন এই নির্দেশমূলক প্রস্তাবে। প্রণব স্মৃতি হাতড়ে জানিয়েছেন : 'আমি বললাম — 'গান আমি কি লিখব! গান ত' আমি গাই, গান ত' আমি লিখিনি কখনো।' তা শুনে বললেন — 'তুই দেখ না, লেখ না। গান লেখাটা কি হাতি-ঘোড়া আছে? তুই কবিতা লিখতে পারিস ভাল, আর গান লিখতে পারবি না নিজে গাইয়ে হয়ে?' তাঁর কথামত একদিন খান আষ্টেক গান লিখে কাজীদার হাতে দিয়ে আমি আবার চলে গেলাম। তারপর মাস ২/৩ আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আবার মাস ২/৩ বাদে যখন আবার রিহার্সাল রুমে গেছি, কাজী তখন খুবই ক্রুদ্ধ আমার ওপর। 'গানগুলো যে দিয়ে চলে গেলি, আর খবর নিলি না। তোর সব গান রেকর্ড হয়ে গিয়েছে, আর তোর টাকা পাওনা রয়েছে।' টাকা পাওনা রয়েছে শুনে আমি অবাক, পুলকিতও বটে। Payment পাওয়া গেল; সালটা হচ্ছে ১৯৩৪-এর শেষ। গানপিছু পাঁচ টাকা হিসেবে পাঁচ আষ্টে চল্লিশ টাকা। তাইতেই মনে হল প্রায় একটা রাজত্ব আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। কমল [দাশগুপ্ত] বললে, 'তুমি নিয়মিত এখানে এসে কাজ করো।' সেই আমার গান লেখা শুরু হয়ে গেল' (*দেশ*, বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১; ৬৬)। সেই 'শুরু'টা শেষতক এসে থেমেছিল ১৯৭৫-এ, তাঁর মৃত্যুতে।

গীতিকার হিসেবে প্রণব রায়ের অভিষেক ছিল স্মরণীয়। কে. মল্লিকের উদ্‌যোগে বিহারের কয়লাখনির ঝরিয়া থেকে কলকাতায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসেছিলেন কমলা সিং গান শিখতে — গান গাইতে। নজরুলের সুবাদে হিজ মাস্টার্স ভয়েসে গান রেকর্ড করার সুযোগ পান। 'প্রিয় যেন প্রেম ভুল না' ও 'নিঠুর নয়ন-বাণ কে হান' — এই গান দুটি নিয়ে তাঁর প্রথম রেকর্ডটি বের হয় সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ। গানে সুর-যোজনা করেন তুলসী লাহিড়ী। রেকর্ড-লেবেলে কমলার নামের সঙ্গে 'ঝরিয়া' জুড়ে দেওয়া হয়। প্রণব নজরুলকে যে আটটি গান দিয়ে এসেছিলেন, সেখান থেকে বেছে এই কমলার কণ্ঠেই প্রণবের লেখা গানের প্রথম রেকর্ড প্রকাশ পায়। ১৯৩৪-এর পূজায় — 'ও বিদেশী বন্ধু' ও 'যেথায় দূরে গাঙের চরে'। অসামান্য জনপ্রিয়তা পায় গান দুটি — প্রণবও সেইসঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ডের গানের ভুবনে আবির্ভাবেই প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পান। গ্রামোফোন রেকর্ডের ইতিহাসে এমন ঘটনা কমই ঘটেছে। এইচএমভি থেকে যূথিকা রায়ের প্রথম রেকর্ড বের হয় ১৯৩৪-এর শেষে, সেই গানও লিখেছিলেন প্রণব রায় — 'আমি ভোরের যূথিকা' ও 'সাঁঝের তারকা আমি'। কিশোরী-শিল্পী যূথিকার এই গান ইতিহাস সৃষ্টি করলো — এই গান দিয়েই শুরু হলো আধুনিক বাংলা গানের যুগ। জগন্ময় মিত্রের প্রথম প্রকাশিত রেকর্ডের গানের গীতিকারও প্রণব রায় — 'প্রিয় হতে প্রিয়তর' ও 'তোমার মতন কত না নয়ন' এই গান দুটি এইচএমভি স্টুডিওতে ধারণ করা হয় ২৫ জুলাই ১৯৩৯। যদিও প্রথম রেকর্ড বের হওয়ার কথা ছিল নজরুলের লেখা 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে' ও অজয় ভট্টাচার্যের লেখা 'সন্ধ্যা যখন নামে' গান দুটি নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অজয় ভট্টাচার্যের গানটি বাতিল হয়ে নজরুলেরই আরেকটি গান 'গুনগুনিয়ে ভ্রমর এল' নিয়ে এটি দ্বিতীয় রেকর্ড হিসেবে প্রকাশ পায়। প্রণব রায়ের লেখা এই তিন শিল্পীর গানেই সুর দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় সুহৃদ কমল দাশগুপ্ত। এরপর গীতরচয়িতা হিসেবে প্রণব রায়কে আর ফিরে তাকাতে হয়নি — খ্যাতি ও সমাদর তাঁকে নিয়ে গেছে প্রতিষ্ঠার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

পাঁচ

সাংবাদিকতা বা অন্য কোনো পেশায় প্রণব রায় থিতু হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত গান লেখা ও চলচ্চিত্রের কাজ জীবিকার উপায় হয়ে ওঠে। গ্রামোফোন কোম্পানির জন্যে এবং পরে চলচ্চিত্রের জন্যে ১৯৩৪ থেকে মৃত্যুকাল অর্থাৎ ১৯৭৫ পর্যন্ত গান লিখে গেছেন। তাঁর গানের কোনো সংকলন প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর ৩২ বছর পরে কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১০১টি গানের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শ্রেষ্ঠ প্রণব স্বরলিপি (জানুয়ারি ২০০৭) প্রকাশ পায়। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন — 'তাঁর লেখা গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার' (*নবকল্লোল* : ১৩২)। এই সংখ্যা একটু বেশি বলেই মনে হয়। কিছু স্বতন্ত্র গুণের জন্যে তাঁর গানের কথা শ্রোতাকে সহজেই আকৃষ্ট করতো — মনে দাগ কাটতে সক্ষম হতো। এ-বিষয়ে তাঁর মৃত্যুর পর এক অস্বাক্ষরিত স্মরণ-নিবন্ধে চিত্রপরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন : 'প্রণব রায়ের গান রচনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর বক্তব্যের সরলতা। যে কোন সিচুয়েশনের জন্য গান লেখায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার' (*নবকল্লোল* : ১৩২)। 'বাংলাদেশে কোন খ্যাতনামা শিল্পীই বোধহয় নেই, যিনি প্রণব রায়ের গান গাননি। এমন কোন সুরশিল্পী নেই যিনি সুর দেননি' (*নবকল্লোল* : ১৩১) — এ-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুন্দনলাল সায়গল, শচীন দেববর্মন, কমলা ঝরিয়া, কানন দেবী, সুধীরলাল চক্রবর্তী, জগন্ময় মিত্র, সত্য চৌধুরী, রবীন মজুমদার, যূথিকা রায়, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, সুপ্রভা সরকার, বেচু দত্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মুহম্মদ রফি, তপন কুমার (তালাত মাহমুদ), আশা ভোঁসলে এবং আরো অনেকে যেমন প্রণবের কথায় গেয়েছেন, তেমনি তাঁর লেখা গানে সুর-যোজনা করেছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, দুর্গা সেন, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, সুধীরলাল চক্রবর্তী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অনুপম ঘটক, অনিল বাগচী, নচিকেতা ঘোষের মতো খ্যাতিমান সুরস্রষ্টারা। তবে বলতেই হয়, কমল দাশগুপ্তই প্রণব রায়ের গানের শ্রেষ্ঠ সুরকার, তাঁর গানকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে কমলের অবদানই সবচেয়ে বেশি স্মরণীয়। আর যাঁদের গায়কি প্রণবের গানের কথা কালজয়ী করেছে তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় সায়গল, কমলা ঝরিয়া, সুধীরলাল, জগন্ময় ও যূথিকা রায়ের।

ছয়

নজরুলের কাছে প্রণব রায়ের ঋণ অপরিসীম — কি মনন-মানসে বিপ্লবীচেতনা সঞ্চরণে, কি গানের জগতে আগমন ও প্রতিষ্ঠায়। কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে প্রণব রায়ের লেখা গানের প্রথম রেকর্ড যখন বের হয় ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে, তখন ওই মাসের এইচএমভির রেকর্ড-পরিচিতি পুস্তিকায় নজরুল এক অস্বাক্ষরিত রচনায় গান ও গীতিকার সম্পর্কে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে-মন্তব্য করেন তা প্রণব রায়ের এক অসামান্য স্বীকৃতি ও সমাদর বলে বিবেচনা করা যায়। প্রণবও সারাজীবন নজরুলের এই বিরল গুণগ্রাহিতার কথা স্মরণে রেখেছিলেন — 'সযত্নে সঞ্চয় করে' রেখেছিলেন ওই পুস্তিকাটি। নজরুল লিখেছিলেন : 'আমরা এবার এক তরুণ সঙ্গীত রচয়িতাকে পেয়েছি যিনি এসেছেন নব নক্ষত্র উদয়ের বিস্ময় নিয়ে, তিনি প্রণব রায়। এঁর লেখা গান যে-কোন শ্রেষ্ঠ গীতরচয়িতার পাশে সসম্মানে সমান আসন দাবী করতে পারে। এঁর গানের এক একটি কথা যেন এক একটি টাটকা তোলা ফুল। গন্ধে রূপে রসে ভরপুর...'। অভিভূত প্রণব কৃতজ্ঞ-কণ্ঠে জীবনসায়াহ্নে এসে স্মরণ করেছেন : 'আমি কাজীসাহেবের এই মন্তব্যের কিয়দংশ উল্লেখ করলাম এইজন্য যে তিনি শুধু গুণগ্রাহীই ছিলেন না, তিনি আমার মতো একজন নবীনতম কবিকে কত স্নেহ, কত প্রশ্রয় দিতেন, কত উৎসাহ দিয়ে তিনি আমাকে আরও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন' (*দেশ* : বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১; ৬৯)।

নজরুলের শংসাবাণীর মর্যাদা রেখেছিলেন প্রণব। কমলা ঝরিয়া দিয়ে তাঁর গ্রামোফোন-রেকর্ড ভুবনে প্রবেশ। দ্বিতীয় রেকর্ডটির শিল্পী ছিলেন সেকালের আরেক জনপ্রিয় গায়িকা মানিকমালা। এরপর প্রণব রায়ের লেখা গানের রেকর্ড নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের কণ্ঠে নিয়মিত রেকর্ড হতে থাকে। সেসব গানের কলি, তা ফিল্ম বা নন-ফিল্ম যাই হোক না কেন, একসময় মানুষের মুখে মুখে ফিরতো। কুন্দনলাল সায়গলের কণ্ঠে 'এখনই উঠিবে চাঁদ', 'নাই বা ঘুমালে প্রিয়' কিংবা 'যখন রব' না আমি দিন হ'লে অবসান' — মাত্র এই তিনটি গান অমর হয়ে আছে। অকালপ্রয়াত সুধীরলাল চক্রবর্তী প্রণব রায়ের লেখা বেশ কয়েকটি গান রেকর্ড করেছিলেন, — এর মধ্যে 'মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে' — এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট কালজয়ী গানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে। যূথিকা রায় তো প্রণবের গান গেয়েই আধুনিক গানের সূচনা করলেন — 'আমি ভোরের যূথিকা' আর 'সাঁঝের তারকা আমি'। মনে পড়বে যূথিকার এই গানগুলির কথাও — 'চরণ ফেলিও ধীরে', 'সে কোন বনের পাখী', 'বন্ধ ক'রো না গান', 'প্রদীপ জাগিয়া রহো', 'এমনি বরষা ছিল সেদিন', 'যদি যমুনার জলে ফুল হয়ে ভেসে যাই', 'গত জনমের যত কথা' এবং সেইসঙ্গে আরো কিছু গান। জগন্ময় মিত্রের কথা অন্য প্রসঙ্গে আলাদাভাবে বলতে হবে। এখানে শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে হয় জগন্ময়ের কণ্ঠে প্রণব রায়ের এই গানগুলোর কথা — 'জাগো জাগো প্রিয়া', 'আমার দেশে ফুরিয়ে গেছে ফাগুন', 'তুমি খেলাছলে কবে', 'স্বপ্নে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমায় কে পরাল মালা' 'আমি ভুলে গেছি তব নাম', 'তুমি পথ ভুলে কবে', 'তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন'। তুলনাহীন সমাদর ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল কানন দেবীর কণ্ঠের গান — 'আমি বনফুল গো ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে'। 'শেষ উত্তর' ছায়াছবিতে সংযোজিত এই গানটির একটি বিশেষ ইতিহাস আছে। কানন দেবী শিল্পী বিমান মুখোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন : 'শেষ উত্তর ছবিটা তোলা শেষ হয়ে গেল। তখন বিশ্বযুদ্ধের সময়। সিনেমায় কাঁচা ফিল্ম আমদানী করে আনতে হয় তাই র-ফিল্মের খুব অভাব।... [প্রমথেশ] বড়ুয়া সাহেবের বাড়িতে ছবিটার একটা প্রাক-উদ্বোধন শো হল। ছবিটার একটা জায়গা দেখিয়ে কমলবাবু বড়ুয়া সাহেবকে বললেন, এই জায়গাটার সিচুয়েশনে আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, এইখানে একটা গান থাকলে ভাল হত। বড়ুয়া সাহেব বুঝলেন যে কমলবাবুর কথাটা ফেলবার মত নয়।... প্রণব রায়ের লেখা একটা গান তৈরি হল। বড়ুয়া সাহেব কমলবাবুকে বললেন এ গানটা আপনি লাগাবার ব্যবস্থা করুন। এদিকে টাইটেল কার্ডে সব গানের গীতিকার হিসেবে শৈলেন রায়ের নাম। সেখানে তো প্রণব রায়ের নাম আর ঢোকানো যাবে না। তা হোক্, বড়ুয়া সাহেব সিনারিও পাল্টালেন। ছবির ডেট পিছিয়ে দিতেও বড়ুয়া সাহেবের আপত্তি নেই। যুদ্ধের কাজের তৎপরতার মত নতুন গান, দৃশ্য তোলা হয়ে গেল, ছবিতে জোড়া হল। শুধু ওই গানটার গীতিকার প্রণব রায়ের নাম আর ছবিতে দেওয়া গেল না। তবে রেকর্ডে অবশ্য যথাযথভাবেই ওঁর নাম ছাপা হ'ল। কানন দেবীর গাওয়া 'আমি বনফুল গো — গীতিকার প্রণব রায়'। কমলবাবুর কথায় এই গানটা যে ছবিটা কতো দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা এই ষাট বছর পরে এখনও গানটার জনপ্রিয়তা থেকে বোঝা যায়' (*বিমানে বিমানে আলোকের গানে* : ৫২-৫৩)। নায়ক-গায়ক রবীন মজুমদারের 'তুমি এসেছিলে', 'চাঁদ হাসে মোর গগনে', 'চাঁদের আলোর দেশে গো' — এ-ও উল্লেখ করার মতন গান। নায়ক অসিতবরণও গান গেয়েছেন প্রণব রায়ের কথায় — বিশেষ করে *প্রতিশ্রুতি* (১৯৪১) ছবিতে গাওয়া তাঁর 'রাজার মেয়ে কাহার লাগি গাঁথছ মনিহার', 'রজনীতে তুমি আসিবে', 'আমার ভুবনে এল বসন্ত' — এইসব গান একদিন শ্রোতাদের অন্তর জয় করেছিল। সত্য চৌধুরীর গাওয়া — 'ভালো যদি লেগে থাকে', 'যেথা গান থেমে যায়', 'দিয়ে যাবো ফাল্গুন রাতে', 'কত যে ব্যথা ভুলালে', 'পথ ছেড়ে দাও প্রিয়া', 'রহিয়া রহিয়া কে ডাকে আমায়', 'ঝরে গেছে ফুল আঁধারে' — এই গানগুলোর আবেদনও কি এখনো শেষ হয়ে গেছে? ধরা যাক না, গৌরীকেদার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভট্টাচার্যের গানের কথা — তাঁর কণ্ঠের গানগুলোও তো প্রণব রায়ই লিখেছিলেন — যেমন, 'সেই মধুরাতে আধখানা চাঁদ', 'কত গানের কুসুম ফুটে ওঠে গো', 'আমি আর প্রেম জেগে আছি'। 'যাই তবে চলে যাই', 'তুমি যদি এলে' কিংবা 'সুরের আকাশে' — বেচু দত্তের বিষাদমাখা সুরেলা কণ্ঠে প্রণবের এই গানগুলোও শ্রোতার অন্তরে সহজেই ঠাঁই করে নিয়েছিল।

গানের পাশাপাশি প্রণব গ্রামোফোন কোম্পানির জন্যে কয়েকটি গীতিনাট্যও রচনা করেন। এর মধ্যে এইচএমভি থেকে প্রকাশিত 'শ্রীরাধার মানভঞ্জন' — কীর্তনাঙ্গের এই গীতিনাট্যটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় এই গীতিনাট্যটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং সেইসঙ্গে আরো কয়েকজন নামি শিল্পী। মেগাফোন রেকর্ডে তাঁর রচিত কৌতুকনাট্য 'আত্মহত্যা'ও খুব সমাদর পেয়েছিল। পরিচালনা ও মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন সুপ্রভা মুখার্জি। অন্যান্য শিল্পী ছিলেন ইলা ব্যানার্জি, চারুপ্রকাশ ঘোষ, নবেন্দুসুন্দর ব্যানার্জি। একটি ভূমিকায় নাট্যকার প্রণব রায় নিজেও অংশ নিয়েছিলেন।

বাংলা গানে কাহিনিগীতির জনকও প্রণব রায়। তাঁর 'সাতটি বছর আগে' ও 'সাতটি বছর পরে' এবং 'চিঠি' জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে ও সুবল দাশগুপ্তের সুরে অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। জগন্ময় মিত্র এই কাহিনিগীতি গেয়ে বাংলা গানের ধারাকেই অনেকটা বদ্‌লে দিয়েছিলেন। প্রণব কালজয়ী এই কাহিনিগীতির বাণিজ্যিক সাফল্যের কথাও বলেছেন এইভাবে : 'আজো এই রেকর্ড বিক্রয় থেকে আমি যে রয়্যালটি পাই তা সামান্য নয়' (*দেশ* : বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১; ৬৮)। এই সঙ্গে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'খোকন সোনা চাঁদের কণা' গানটির কথাও উল্লেখ করতে হয়। প্রণব রায়ের কথায় যূথিকা রায়ের 'পাহাড় দেশের বন্ধু' ও 'রূপ-কাহিনীর দেশে' এই গান দুটি দিয়েই এইচএমভির অভিনব 'গীতি-চিত্রমালা' সিরিজের সূচনা হয়। পরের প্রজন্মের শিল্পীদের জন্যেও প্রণব রায় অসাধারণ সব গান লিখেছেন। দু'হাতে লিখেছেন চলচ্চিত্রের গান। সেই তালিকাও কম দীর্ঘ নয়।

প্রণব রায়ের লেখা গানের রেকর্ড নিয়ে মজার কাণ্ডও কম হয়নি। সে সাক্ষ্য দিয়েছেন জগন্ময় মিত্র ও সন্তোষ সেনগুপ্ত। 'সাতটি বছর আগে' ও 'সাতটি বছর পরে' — এই রেকর্ডটি সম্পর্কে শ্রোতাদের মন্তব্য-বক্তব্য কেমন ছিল তা জানিয়ে জগন্ময় বলেছেন : 'ক্রমশ বাংলার ঘরে ঘরে গানটি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল — আর সেই সঙ্গে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা ছোটো গল্পও। কালে এই জনপ্রিয়তা অভিশাপ হয়ে দেখা দিল আমার জীবনে। কেউ বলছেন, 'কি গানই গেয়েছে ভদ্রলোক।' কেউ বলছেন, 'আহা ভদ্রলোকের বউ মারা গেছে কিনা সেই দুঃখে এই গান গাওয়া, দরদ তো থাকবেই।' কেউ কেউ আবার মন গুনে কটূক্তি করতেও ছাড়লেন না, নষ্ট চরিত্রের দোষ দিয়ে।... চিঠিপত্রও পেতে লাগলাম প্রচুর। কেউ কেউ সমবেদনা জানিয়ে লিখলেন। কেউ বা নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইলেন জীবনসঙ্গিনী হবার আকাঙ্ক্ষায়' (*শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে* : ৪৭)।

অন্যদিকে প্রণব রায়ের গান গেয়ে সন্তোষ সেনগুপ্তের কী দশা হয়েছিল, তার পরিচয় মেলে তাঁর স্মৃতিচারণায়। এর আগে নরেশ্বর ভট্টাচার্যের লেখা 'আজো পড়ে গো মনে দুটি কাজল আঁখি — মোরে হেরিত শুধু লাজে লুকায়ে থাকি' গান রেকর্ড করায় তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। গানের কথার জন্যে তাঁকে 'ভীষণ বিব্রত' হতে হয়েছিল। 'ডেপো ছোকরা' উপাধিপ্রাপ্তির পাশাপাশি শুভাকাঙ্ক্ষীরা বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তাই এর পর থেকে গানের কথার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক-সচেতন হয়ে গান রেকর্ড করতেন। কিন্তু বিপত্তি আবারও ঘটলো। সেই কথাটি শোনা যাক সন্তোষ সেনগুপ্তের নিজেরই মুখে : 'এত সব সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কয়েক বছর পরে প্রণব রায় রচিত ও শৈলেশ দত্তগুপ্ত সুরারোপিত একটি গানের রেকর্ড বার হ'ল — গানটি হ'ল 'জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা — মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল'। রেকর্ডটি বার হবার পর জনসাধারণের উচ্ছ্বাস ও সহানুভূতি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আবার আমাকে আত্মগোপন করতে হয়, কারণ এইরূপ রটনা হয়েছিল যে আমার বিবাহ এবং তারপর আমার স্ত্রীর অকালমৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে আমি ঐ গান গেয়েছি' (*আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন* : ১৪)। সুর ও গায়কি এবং সেইসঙ্গে কথার আবেদন যে কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল জনমনে তা এইসব বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায়।

সাত

প্রণব রায়ের মৃত্যুর পর এক স্মরণ-নিবন্ধে তাঁর গানের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, 'রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও তাঁর রচনায় কোথাও রবীন্দ্রনাথের ছাপ পড়েনি' (*নবকল্লোল* : ১৩২)। এ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ও বাহুল্য কথা। প্রণব রবীন্দ্রযুগের নন, নজরুলযুগের গীতিকবি। নজরুলের প্রভাব তাঁর গানে অত্যন্ত স্পষ্ট ও গভীর। নজরুলের কিছু গান তাঁর নামে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রচারিত। আবার প্রণব রায়ের কোনো কোনো গানও নজরুলের গান হিসেবে পরিচিত হয়ে গেছে। তাঁর স্বরলিপি-পুস্তকের সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : 'মুশকিল হল তাঁর [প্রণব রায়] বহু গান হয়ত অত্যধিক নজরুলপ্রেমের আতিশয্যে বা উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে নজরুল-গীতি রূপে আখ্যায়িত হল। কেউ কেউ বললেন যে এরূপ গানগুলি নাকি বাস্তবে নজরুলের, প্রণব রায় চুরি করেছেন। কিন্তু একথার সপক্ষে কোন প্রমাণ তাঁরা হাজির করতে অপারগ, কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই প্রণব রায়ের কপালে জুটেছে অপবাদ...' (*শ্রেষ্ঠ প্রণব স্বরলিপি*)। নজরুল-গবেষক আবদুস্ সাত্তার তথ্য-প্রমাণ দিয়ে প্রণব রায়ের যেসব গান নজরুলের নামে প্রচারিত তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এই তালিকা থেকে জানা যায় নিচের এই গানগুলি নজরুলের নয়, প্রণব রায়ের : ১. 'তোমার আকাশে এসেছিনু হায় আমি কলঙ্কী চাঁদ', ২. 'আমি যদি কভু দূরে চলে যাই', ৩. 'শ্যামল সুন্দর প্রিয়তম', ৪. 'সিন্ধুর কল্লোল ছন্দে ত্রিংশ কোটি সন্তান বন্দে', ৫. 'ফিরিয়া ডেকো না মহুয়া বনের পাখী', ৬. 'চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়', ৭. 'কতদিন দেখিনি তোমায়', ৮. 'মন নিয়ে প্রিয় যেয়ো না চলে', ৯. 'কবে প্রিয় এসেছিলে চাঁদ হয়ে', ১০. 'এসেছিল মধুযামিনী', ১১. 'জীবনে যারে তুমি দাও নি মালা', ১২. 'তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন আমারে', ১৩. 'মেঘে আর বিজুরীতে মিশায়ে' (*নজরুল-সঙ্গীত অভিধান* : পরিশিষ্টের 'সংযোজন')। প্রণব রায়ের গান নজরুলসংগীত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কিংবা ভ্রম-জাগার একটা বড়ো কারণ বোধহয় অনুজ গীতিকবিদের ওপরে নজরুলের রচনাশৈলী, বাণীভঙ্গি ও শব্দচয়নের সাদৃশ্যগত প্রভাব। নজরুলের সমসময়ে তাঁর প্রভাব এড়ানো সহজ ছিল না।

আট

মূলত গান লেখার সুবাদেই প্রণব রায় চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িত হন। পরে এই সম্পর্কের বিস্তার ঘটে ছায়াছবির কাহিনি-চিত্রনাট্য-সংলাপ রচনা এবং পরিচালনা ও প্রয়োজনার মাধ্যমে। রেকর্ডে তাঁর গান প্রকাশের দু'বছর পর ১৯৩৬-এ প্রথম ছায়াছবির গান লেখেন 'পণ্ডিত মশাই' ছবিতে। গানের এ-ধারা মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। প্রণব প্রায় দু'শোর কাছাকাছি ছায়াছবিতে গান লিখেছেন — এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *পরিচয়* (১৯৪১), *গরমিল* (১৯৪২), *শেষ উত্তর* (১৯৪২), *কাশীনাথ* (১৯৪৩), *বিরাজ বৌ* (১৯৪৬), *মন্দির* (১৯৪৭),

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পথের দাবী (১৯৪৭), *অনুরাধা* (১৯৪৯), *জীবনসৈকত* (১৯৫০), *বৈকুণ্ঠের উইল*, *মাইকেল মধুসূদন* (১৯৫০), *ঢুলী* (১৯৫৪), *মরণের পরে* (১৯৫৪), *বিধিলিপি* (১৯৫৫), *মহানিশা* (১৯৫৬), *শিল্পী* (১৯৫৬), *সাগরিকা* (১৯৫৬), *সাহেব বিবি গোলাম* (১৯৫৬), *চন্দ্রনাথ* (১৯৫৭), *নীলাচলে মহাপ্রভু* (১৯৫৭), *হারজিৎ* (১৯৫৭), *বসন্তবাহার* (১৯৫৭), *পৃথিবী আমারে চায়* (১৯৫৭), *সাধক বামাক্ষ্যাপা* (১৯৫৮), *ছবি* (১৯৫৯), *বিষকন্যা* (১৯৬১), *দ্বীপের নাম টিয়ারিং* (১৯৬৩), *কাঞ্চনরঙ্গ* (১৯৬৪), *দীপ নেভে নাই* (১৯৬৪), *জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার* (১৯৬৬), *এন্টনী ফিরিঙ্গী* (১৯৬৭), *গৃহদাহ* (১৯৬৭), *গড় নাসিমপুর* (১৯৬৮), *আরোগ্যনিকেতন* (১৯৬৯), *কমললতা* (১৯৬৯), *পরিণীতা* (১৯৬৯), *কলঙ্কিত নায়ক* (১৯৭০), *মেঘ কালো* (১৯৭০), *ধন্যি মেয়ে* (১৯৭১), *ফরিয়াদ* (১৯৭১), *ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিসট্যান্ট* (১৯৭১), *নায়িকার ভূমিকায়* (১৯৭২), *আমি সিরাজের বেগম* (১৯৭৩), *কবি* (১৯৭৫)। প্রণব-রচিত এইসব ছবির গান বহুকাল মানুষকে আন্দোলিত করবে।

গল্প লেখার হাত ছিল আগে থেকেই। চলচ্চিত্রজগতে প্রবেশের পর গল্প-উপন্যাস লেখার একটা তাগিদ আসে এবং দীর্ঘ ব্যবধানে আবার গদ্যরচনায় হাত দেন। তাঁর কাহিনি নিয়ে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *সাত নম্বর বাড়ী* (১৯৪৬), *মন্দির* (১৯৪৭), *নিরুদ্দেশ* (১৯৪৯), *রাঙামাটি* (১৯৪৯), *জবানবন্দী* (১৯৫২), *প্রার্থনা* (১৯৫২), *মানরক্ষা* (১৯৫৬), *হারজিৎ* (১৯৫৭), *কে তুমি* (১৯৬৪), *ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট* (১৯৭১), *বহুরূপী* (১৯৭২)। একসময়ে নীতিন বসুর আহ্বানে প্রণব রায়কে বোম্বে যেতে হয় কিছুকালের জন্যে। সেইসময়ে কাহিনি ও চিত্রনাট্য রচনা করেন হিন্দি ছবি *বিচার* ও *বাত এক রাত কি*। তাঁর বাংলা ছবির বেশকিছু কাহিনিই রচিত হয়েছিল নিউ থিয়েটার্সের জন্যে — এদের জন্যে গান তো লিখেছেনই।

প্রণব প্রায় তিরিশটির মতো বাংলা ছবির চিত্রনাট্যও রচনা করেন। এই কুশলী চিত্রনাট্যকার *ফারার* নামে একটি হিন্দি ছবির চিত্রনাট্যও লিখেছিলেন। নীরেন লাহিড়ী, নীতিন বসু প্রমুখের সহকারী হিসেবে ছবি পরিচালনার শিক্ষানবিশি পর্ব শেষ হওয়ার পর সাহস করে নিজেই পরিচালনায় উদ্‌যোগী হন। ১৯৪৯ সালেই তিনটি ছবি পরিচালনা করেন : *বামুনের মেয়ে*, *অনুরাধা* ও *রাঙামাটি*। প্রথম দুটি ছবির কাহিনি শরৎচন্দ্রের। এরপর ১৯৫২ সালে তাঁর পরিচালনায় নির্মিত হয় *প্রার্থনা*

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছবিটি। প্রথম ছবিটি শুধু 'সব্যসাচী' নামে পরিচালনা করেন, অন্যগুলো স্বনামেই। পরিচালিত ছবি রুচিশীল ও শিল্পসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসাসফল হয়নি। কিন্তু পরিচালক হিসেবে তিনি যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী ছিলেন সে-সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর ছবির নায়িকা কানন দেবী 'পরিচালক প্রণব রায়' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে। তেমন অর্থ-বিত্ত না থাকলেও শুধু সৃজনপ্রয়াসী মননের কারণেই বন্ধু কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে *প্রার্থনা* (১৯৫২) নামে একটি ছবিও প্রযোজনা করেন। অবশ্য সেই ছবি তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি, তবে সুরকার ও গীতিকার দুই বন্ধুর এই প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রণব রায়ের কথা শেষ করবো তাঁর প্রয়াণের পর অগ্রজ লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্তব্য দিয়ে : 'প্রণব রায়ের পরিচয় শুধু গীতিকার নয়, তাঁর মুখ্য পরিচয় সে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যের মেজ সেজ নয়, ছিল সে বড়দের একজন।... তাই শোক নয়, তাঁর মত একটি মানুষ আমাদের যুগকে অলঙ্কৃত করেছে, এই মধুর স্মৃতি এখন আমরা বহন করছি।... প্রণব রায়ের সম্মানে পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণের কথা উঠেছিল।... সেটা সে পায় নি, সে একটা মস্ত গৌরব নিয়ে গেছে। প্রণব রায়ের স্থান যেখানে থাকবার, সেখানে ঠিকই থাকবে।'

গ্রন্থঋণ

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ*। সপ্তম প্রকাশ : কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯৫।

২. সন্তোষ সেনগুপ্ত : *আমার সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক জীবন*। কলকাতা, মাঘ ১৩৯২।

৩. *শ্রেষ্ঠ প্রণব স্বরলিপি* : শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত। কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭।

৪. সিতাংশু শেখর ঘোষ : *বিমানে বিমানে আলোকের গানে*। তৃ-স : কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫।

৫. জগন্ময় মিত্র : *শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে*। প্রতিভাস সংস্করণ : কলকাতা, এপ্রিল ২০১০।

৬. আবদুস্ সাত্তার : *নজরুল-সঙ্গীত অভিধান*। ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০০।

৭. জীবেন্দ্র সিংহরায় : *কল্লোলের কাল*। প্রথম দে'জ সংস্করণ : কলকাতা, পৌষ ১৩৯৪।

৮. *কবিতা* : ত্রৈমাসিক, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৪২।

৯. *দেশ* : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১।

১০. *দেশ* : বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১।

১১. *নবকল্লোল* : মাসিক, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৭৫।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

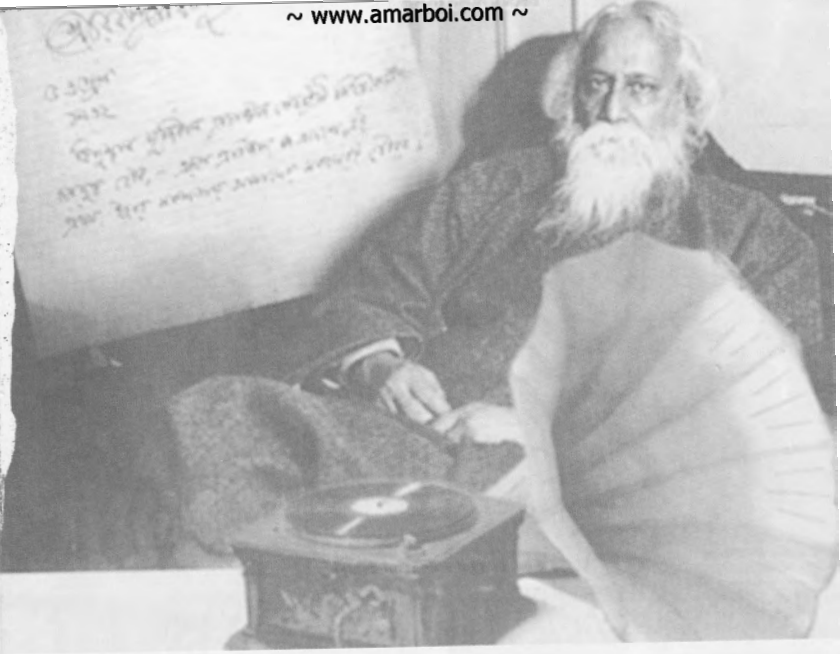

হিন্দুস্থান রেকর্ড
কোম্পানিকে
রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা

কাজী নজরুল ইসলাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা চণ্ডীচরণ সাহা
হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির প্রবেশদ্বার
মেগাফোন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ
মেগাফোন কোম্পানির বাড়ি
মেগাফোনের দ্বিতীয় পুরুষ কমল ঘোষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেডের রেকর্ডিং স্টুডিওতে বামদিক থেকে দাঁড়িয়ে – ধীরেন দাস, নজরুল ইসলাম, আঙ্গুরবালা, তুলসী লাহিড়ী ও রাসবিহারী শীল এবং বসে বামদিক থেকে – ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য ও জর্জ কুপার

হেমেন্দ্র বসু

ফ্রেডরিক উইলিয়ম গেইস্‌বার্গ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

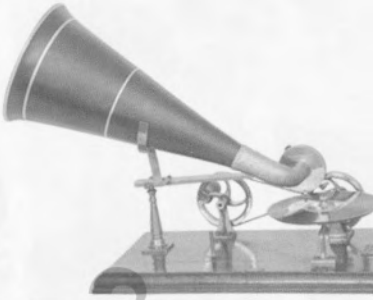

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পিয়ারা সাহেব লালচাঁদ বড়াল

রচিত রাইচাঁদ বড়াল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আঙ্গুরবালা গওহরজান
ইন্দুবালা কমলা ঝরিয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

ধীরেন্দ্রনাথ দ

গ্রামোফোন কোম্পানির বিষ্ণুভবনে শিল্পী-সমাবেশ : ডানদিক থেকে (দাঁড়ানো) : রঞ্জিত রায়, অজ্ঞাত, কমল দাশগুপ্ত, ধীরেন দাস, অজ্ঞাত, হাবুল চক্রবর্তী, পরিতোষ শীল। ডানদিক থেকে (চেয়ারে বসা) : কমলা ঝরিয়া, সরযূবালা দেবী, আশ্চর্যময়ী দেবী, নিভাননী দেবী ও মিস্ লাইট

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

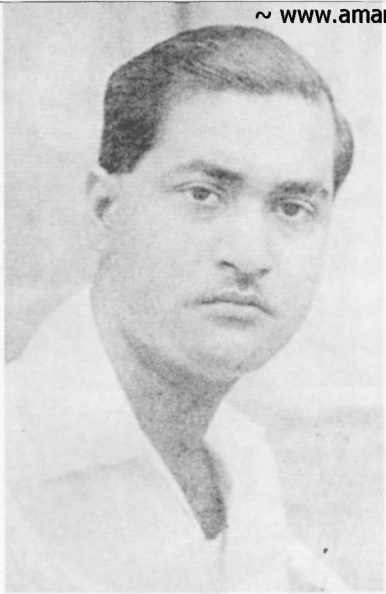

কমল দাশগুপ্ত ফিরোজা বেগম

কমল দাশগুপ্তের অগ্রজ প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত কমল দাশগুপ্তের অনুজ সুবল দাশগুপ্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবদুল করিম খাঁ

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ

ভীমসেন যোশী

হীরাবাঈ কেরকর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ

আলাউদ্দিন খাঁ

আলী আকবর

ওস্তাদ রবিশঙ্কর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমজাদ আলী খাঁ

বিলায়েৎ খাঁ

রশীদ খান

জয় চক্রবর্তী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গিরিজা দেবী

বেগম আখতার

বিসমিল্লাহ খান

কিশোরী আমনকর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

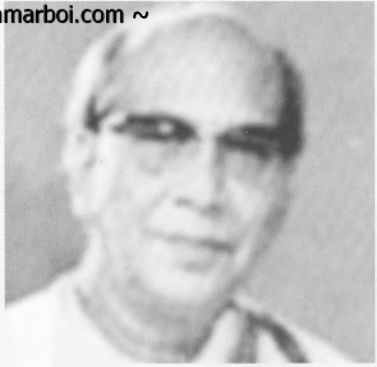

[illegible] মণ্ডল [illegible] জগদীশ মিত্র

[illegible] দত্তগুপ্ত [illegible] খোপার[illegible]

ধনঞ্জয় [illegible] সুধীরলাল চক্রবর্তী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আব্বাসউদ্দীন আহমদ শচী[illegible]দেববর্মন
মান্না দে শ্যাম[illegible]
তিমিরবরণ- রাজেশ্বরী দত্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

[illegible] [illegible]ায়
[illegible] [illegible]ত্র
নীলিমা সেন সন্ধ্যা মুখার্জি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

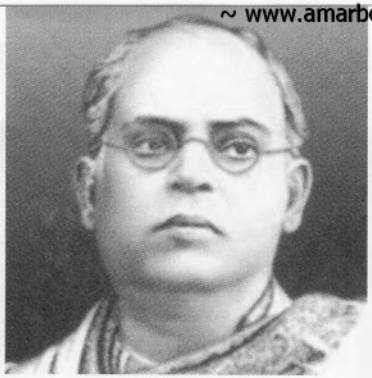

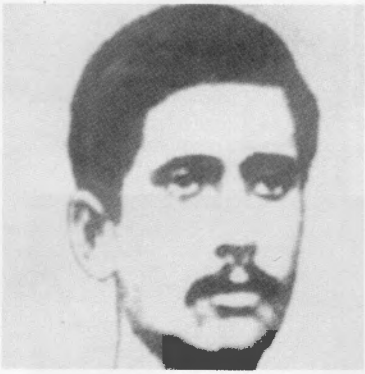

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অতুলপ্রসাদ সেন
রজনীকান্ত সেন রামপ্রসাদ সেন
দিলীপকুমার রায় জসীমউদ্দীন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এএমআই সুচিত্রা মিত্রকে ১৯৮০ সনে সম্মানসূচক গোল্ডেন ডিস্ক উপহার দেয়

কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইএমআই ১৯৮০ সনে সম্মানসূচক গোল্ডেন ডিস্ক উপহার দেয়

কানন দেবী ও [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যৌবনে শচীন দেব
নববধূ মীরা দেবীর সঙ্গে শচীনকর্তা
আত্মমগ্ন শচীন দেব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্যাথি-এইচ. বোসেজ রেকর্ডে
রবীন্দ্রনাথের গান

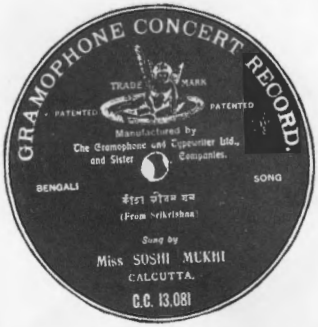

গেইস্‌বার্গ ধারণকৃত শশীমুখীর গাওয়া
প্রথম বাংলা গান

হিন্দুস্থান রেকর্ড প্রকাশিত শচীনকর্তার
প্রথম রেকর্ড

আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া
'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি'র রেকর্ড

মেগাফোনের রেকর্ড-কভারে কমলা
ঝরিয়াসহ অন্যান্য শিল্পীর ছবি

শচীন দেববর্মনের হিন্দি গানের
রেকর্ড-লেবেল ও কভার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেগাফোনের প্রথম রেকর্ড

হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ড

পাইওনিয়ার রেকর্ড

কলম্বিয়া রেকর্ড

হিজ মাস্টার্স ভয়েস[illegible]
কে. মল্লিকের ছবি

মেগাফোন রেকর্ডের লেবেল
চল চল চল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড

নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড

যূথিকা রায়ের সঙ্গে আবুল আহসান চৌধুরী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

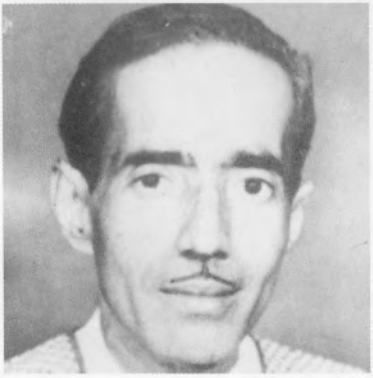

[illegible] অজয় ভট্টাচার্য
[illegible] প্রণব রায়
মোহনা চৌধুরী সলিল চৌধুরী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

[illegible] রফি
[illegible] দাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও